Uttaradhikar by Somoresh Majumder

[Part.1]

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com

উত্তরাধিকার
www.MurchOna.com
U TARADI
1950
সমরেশ মজুমদার
ALCUTTA
1957
মূর্চ্ছনা

মূর্ছনা

www.MurchOna.com

Archives of eBooks, Music & Videos

বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত

suman_ahm@yahoo.com

যেহেতু এই উপন্যাসের পটভূমিকা জলপাইগুড়ি শহর এবং ডুয়ার্সের চা-বাগান, তাই দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশের সময় কেউ কেউ এর চরিত্র ও ঘটনার মধ্যে পরিচিত চেহারা খুঁজে পেয়েছেন। যদিও দুর্ঘটনারা দল বেঁধে আসে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা দুর্ঘটনাই। আমি একটি বিশেষ সময় নিয়ে উপন্যাস লিখতে চেয়েছি, ফটোগ্রাফারের এলেম আমার নেই।
আঘাত কি আমি জানি, তাই সেটা কাউকে দিতে একদম ইচ্ছে করে না।

সমরেশ মজুমদার

উত্তরাধিকার

॥ ১ ॥

শেষ বিকেলটা অন্ধকারে ভরে আসছিল। যেন কাছাকাছি কোথাও বৃষ্টি হয়ে গেছে, বাতাসে একটা ঠান্ডা আমেজ টের পাওয়া যাচ্ছিল। অবশ্য ক'দিন থেকেই আকাশের চেহারাটা দেখবার মত ছিল। চাপ-চাপ কুয়াশার দঙ্গল বাদশাহী মেজাজে গড়িয়ে যাচ্ছিল সবুজ গালচের মত বিছানো চা-গাছের ওপর দিয়ে খুঁটিমারীর জঙ্গলের দিকে। বিচ্ছিরি, মন খারাপ করে দেওয়া দুপুরগুলো গোটানো সুতোর মত টেনে টেনে নিয়ে আসছিল স্যাঁতসেঁতে বিকেল—ঘষা সেলেটের মত হয়েছিল সারাদিনের আকাশ। বৃষ্টির আশঙ্কায় প্রত্যেকটা দিন যেন সূচের ডগায় বসে থাকত এই পাহাড়ী জায়গাটায়, কেবল বৃষ্টিটাই যা হচ্ছিল না।

কিন্তু কাছাকাছি কোথাও বৃষ্টি হয়েছে। হয়তো ভুটানের পাহাড়ে বৃষ্টি নেমেছে। ঠান্ডা হাওয়া বইছে। পুরো হাতওয়ালা হলুদ পুলওভার পরে অনি দেখল দিনটা ফুরিয়ে যাচ্ছে। বাড়ির সামনে পাতাবাহারের গাছগুলোর ওপর নেতিয়ে পড়া হলুদ রোদটা কোথায় হারিয়ে গেল টুক করে। আরো দূরে, আঙরাভাসা নদী জড়িয়ে বিরাট খুঁটিমারীর জঙ্গলের মাথায় লাল বলের মত যে সূর্যটা হঠাৎ উঁকি দিয়েছিল একবার, যাকে সকাল থেকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে রাখতে চেয়েছিল ও, কেমন করে ব্যাডমিন্টনের কর্কের মত ঝুলে পড়ল ওপাশে, একরাশ ছায়া ছড়িয়ে দিল চারধারে। অনির খুব কান্না পাচ্ছিল।

খালি পায়ে বাড়ির পেছনে চলে এল অনি। ঘাসগুলো কেমন ঠান্ডা, নেতানো। পায়ের তলায় সিরসির করে। চটি না পরে বেরুলে মা রাগ করবেন, কিন্তু অনি জানে এখন ওদের কাউকে পাওয়া যাবে না। এই বিরাট কোয়ার্টারটার ঠিক মধ্যিখানের ঘরে এখন সবাই বসে গোছগাছ করছে। এদিকে নজর দেবার সময় নেই কারো।

এই বাড়িটার চারপাশে শুধু গাছপালা। দাদু এখানে এসেছিলেন প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর আগে। সব কটা গাছের আলাদা আলাদা গল্প আছে, মন ভালো থাকলে দাদু সেগুলো বলেন। এই যে বিরাট ঝাঁকড়া কাঁঠালগাছ ওদের উঠোনের ওপর সারাদিন ছায়া ফেলে রাখে, যার গোড়া অবধি রসালো মিষ্টি কাঁঠাল থোকা থোকা হয়ে ঝুলে থাকে, সেটা বড় ঠাকুমা লাগিয়েছিলেন। প্রায় চল্লিশ বছর বয়স হয়ে গেছে গাছটার। প্রথমদিকে নাকি মাটির নিচে কাঁঠাল হতো, পেকে গেলে ওপরের মাটি ফেটে যেত—গন্ধে চারদিক ম-ম করতো তখন। রাত্তিরবেলায় শেয়াল আসতো দল বেঁধে সেই কাঁঠাল খেতে। বড় ঠাকুমা শুয়ে শুয়ে চিৎকার করতেন তখন। শেষ পর্যন্ত দাদু কাঁঠাল গাছের ওপরে একটা টিনের ছোট ড্রাম বেঁধে দিয়েছিলেন। সেই ড্রামের মধ্যে একটা ঘন্টা দড়িতে বাঁধা থাকতো। দড়িটা টিনের ছাদের নিচ দিয়ে ঘরে ঢুকিয়ে খাটের সঙ্গে বাঁধা ছিল। ভালো থাকলে দাদু হেসে বলেন, 'রাতদুপুরে ঘুম ভেঙে গেলে দেখতাম তোমার ঠাকুমা শুয়ে সেই দড়ি টানছেন আর বাইরে প্রচন্ড শব্দ করে ড্রামটা বাজছে। শেয়ালের সাধ্য কি এর পরে আসে!'

উঠোনের শেষে গোয়ালঘরে যাবার খিড়কি দরজার গায়ে যে তালগাছটা, যার ফল কোনদিন পাকে না, ছোট ঠাকুমা লাগিয়েছিলেন। মেজপিসিকে তিনদিনের রেখে বড় ঠাকুমা মারা যান। ছোট ঠাকুমা বড় ঠাকুমার বোন। এই তালগাছটা কোন কর্মের নয়। পিসীমা বলেন, 'ব্যাটাছেলে গাছ। বাবা কাটতে দেন না ছোটমা লাগিয়েছিল বলে, ছায়া-ফায়া সব বাজে কথা। ছোট মাকে তো বাবা খুব ভালবাসতেন।' গাছটাকে অনেকবার কেটে ফেলার কথা হয়েছিল। বাবুই পাখিরা সারা গাছে বাসা করে আছে। সারাদিন রঙিন পাখির কিচিরমিচির, দেখতেও ভাল লাগে। তা ছাড়া ছায়া হয় উঠোনে—এই সব বলে দাদু কাটতে দেননি। তাই পিসীমা বলেন, ছায়া-ফায়া সব বাজে কথা। সত্যি বাবুই পাখি বাসা করে বটে। এক-একদিন সকালে সারারাত ঝড়ের পরে অনি দেখেছে মাটিতে পড়া বাসাগুলো হাতে নিয়ে, কি নরম।

www.MurchOna.com

অথচ পাখিগুলোর ভ্রূক্ষেপ নেই, আবার বাসা করতে লেগে গেছে। ঝাড়িকাকু একদিন ওকে বলেছিল, 'কত্তামশাই-এর দুই বউ, কাঁঠালগাছ আর তালগাছ।' বেশ মজা লেগেছিল অনির।

খিড়কি দরজা দিয়ে বেরুতেই ও কালী গাই-এর হাম্বা ডাক শুনতে পেল। এমন মানুষের মত ডাকে গরুটা, বুকের মধ্যে কেমন করে ওঠে। কালী দাঁড়িয়ে আছে গোয়ালঘরের সামনে। ওর ছেলেমেয়েরা কোথায়? বেশী গরু বাড়তে দেন না মা। চারটের বেশী হয়ে গেলে লাইন থেকে পাতরাস আসে, হাটে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেয়। সে টাকা মায়ের কাছে জমা থাকে—গরুগুলো সব মায়ের। কালীকে বিক্রি করা হবে না কখনো। দুধ দিক বা না দিক, ও এখন বাড়ীর লোক হয়ে গিয়েছে। অনি দেখল কালী বড় বড় চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ওর চোখ দুটো আজ এত গম্ভীর কেন? বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল অনির। ও কি কিছু বুঝতে পেরেছে? গরুরা কি টের পায়? হাত বাড়ালো অনি, সঙ্গে সঙ্গে মুখটা ওপরে তুলে ধরল কালী। গলার কম্বলে হাত বোলালো অনি অনেকক্ষণ। নাক দিয়ে শব্দ করছে কালী। রোজ যেরকম আদর খাবার মুখ করে ও, সে রকমটা ঠিক না। যেন ও সত্যিই বুঝতে পারছে অনি চলে যাবে এখান থেকে। আস্তে আস্তে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আবার হাঁটতে লাগল অনি। বড় বড় মাথাসমান আকন্দ গাছগুলো গোয়ালঘরের চারপাশে বেড়া দিয়ে লাগানো হয়েছে। অনি সেগুলো পেরিয়ে আসতে আসতে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, কালী ঘুরে দাঁড়িয়ে ওকে একদৃষ্টে দেখছে। অনি দৌড় লাগালো।

গোয়ালঘরের পেছন দিকে কোন বাড়িঘর নেই। বড় বড় জঙ্গলে গাছের সঙ্গে আম কুল ছড়িয়ে আছে। এখন আলো প্রায় নেই বললেই চলে। দৌড়ে আসতে আসতে অনি সেই ডাহুকটার গলা শুনতে পেল। রোজকার মত কেমন নিঃসঙ্গ গলায় ঝাঁকড়া কুলগাছটার তলায় বসে একটানা ডেকে যাচ্ছে। ডাহুকটার গলার কাছটা সাদা থালার মত। অনেকদিন দেখেছে অনি। ঝাড়িকাকু বলে ডাহুকের মাংস খেতে নাকি খুব ভাল। গুলতি দিয়ে মারার চেষ্টা করেও পারেনি ঝাড়িকাকু। ভীষণ চালাক ডাহুকটা। এখন প্রায় সন্ধ্যে হওয়া সময়টায় ডাহুকটার গলার শব্দে কেমন বিষণ্ন লাগছিল চারপাশ। অনি আঙরাভাসা নদীর গায়ে রাখা কাপড়-কাচার পাথরটার ওপরে এসে দাঁড়াল। চকচকে ঢেউগুলো যেন ওদের স্কুলে নতুন আসা গম্ভীর-দিদিমণির মত দ্রুত হেঁটে যাচ্ছে কোনদিকে না তাকিয়ে। ঝুঁকে পড়ে নিজের ছায়া দেখল ও আঙরাভাসার কালো জলে। মাকে লুকিয়ে ওরা প্রায়ই এই নদীতে স্নান করে। ছোট ছোট নুড়ি-বিছানো হাঁটুজলের নদী। এর কোথায় কি পাথর আছে বা না আছে অনি জানে। সেই হলদে রঙের বড় বড় পাথরগুলোর নিচে লাল লাল চিংড়িগুলো গুঁড়ি মেরে পড়ে থাকে, হাত বাড়ালেই হল, রোজকার মত অনি আর ধরতে পারবে না। যাবার বাকি দিনগুলো কেমন দ্রুত, মুখের ভিতর নরম চকোলেটের মত দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে। অনির ভীষণ খারাপ লাগছে, ভীষণ।

এখন এখানে কেউ নেই। আঙরাভাসার দুধারে বড় বড় আমগাছগুলোতে ফিরে আসা পাখিরা জোরালো গলায় চেঁচামেচি করে নিচ্ছে শেষবার। অদ্ভুত একটা আঁষটে গন্ধ উঠছে নদীর গা থেকে। চওড়ায় পনেরো ফুট, তীব্র স্রোতের এই নদী চলে গেছে নিচে চা-ফ্যাক্টরীর ভিতর দিয়ে। ফ্যাক্টরীর বিরাট হুইলটা চলছে এর স্রোতে। বলতে গেলে স্বর্গছেঁড়ার হৃদ্‌স্পন্দনের মত এই নদীর ঢেউগুলো। অথচ ওরা পায়ের তলায় নড়বড়ে পাথর রেখে কতবার পার হয়ে যায়। ওপাশের লাইনের মদেসিয়া মেয়ের দল যখন নদী পেরিয়ে এপারে আসে তখন ওদের হাঁটু অবধি নামা কালো কাপড়ের ঘেরটা পদ্মপাতার মত স্রোতে ভাসে। কাপড়টাকে ওরা বলে আঙরা। নদীর নাম তাই আঙরাভাসা। এতো স্রোত আর জল কম তাই বড় মাছেরা এদিকে আসে না। তবু একটা জলজ আঁষটে গন্ধ বেরোয় নদীর গা থেকে। চোখ বন্ধ করলে জলের শব্দ খঞ্জনীর মত বেজে যায়।

পুলওভার গুটিয়ে উবু হয়ে চট করে কাপড়কাচা পাথরটা তুলে ধরল অনি। হালকা চ্যাপ্টা পাথর। সামান্য ঘোলা জল সরে গেলে অনি দেখল একটা বিরাট দাড়াওয়ালা কালো কাঁকড়া, গোল গোল চোখ তুলে জলের তলায় বসে ওকে দেখল সেটা। তারপর নাচের মত পা ফেলে ফেলে সরে যেতে লাগল সেটা নদীর ভিতরে। একগাদা চুনো মাছের বাচ্চা খলবলিয়ে চলে গেল। ছোট সাদা পাথরের ফাঁক দিয়ে লম্বা শুঁড়ওয়ালা একটা লাল চিংড়িকে দেখতে পেল অনি। হঠাৎ মাথার ওপর থেকে পাথরের ছাদটা উঠে যেতে বেচারা বুঝতে পারছিল না কি করবে। বাঁ হাতে পাথরটাকে দাঁড় করিয়ে রেখে ডান হাতে খপ

www.MurchOna.com

করে ধরে ফেলল ও মাছটাকে। পাথরটাকে নামিয়ে দিয়ে আবার উঠে বসল তার ওপর। হাতের মুঠোয় চিংড়িটা ছট্‌ফট করছে। পেটের তলায় অজস্র পায়ের মত শুঁড়গুলো নাচাচ্ছে এখন। নাকের কাছে নিয়ে এল অনি, চমৎকার জলের গন্ধ। কি ভীষণ কষ্ট হচ্ছে বুকের মধ্যে, এই চিংড়িটাকে আর কোনদিন সে দেখতে পাবে না। হাতের মুঠোটাকে জলের মধ্যে রাখল অনি। আঙুলের ফাঁক গলে জল ঢুকছে। চিংড়িটা মোচড় দিচ্ছে খুব। হাত ওপরে তুলতেই জল বেরিয়ে যেতেই চিংড়িটা লাফ দিল হঠাৎ। আর সেই সময় গলার শব্দ পেল ও। চোখ তুলে তাকাতেই অনি দেখল ওপারে জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে টুকরি কাঁধে দুটো মদেসিয়া মেয়ে ঘাটে আসছে। ফ্যাক্টরীর বোধ হয় ছুটি হল। মেয়ে দুটো মা-মেয়েও হতে পারে। তপুপিসীর মত ছোটটার বয়স। টুকরিটা পাড়ে রেখে ওরা চট করে ঠান্ডা জলে নেমে পড়ল। জল ছিটিয়ে মুখ ভেজাল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে অনিকে দেখল। ছোট মেয়েটা বড়কে আঙুল দিয়ে অনিকে দেখালো, 'বুড়ো বাবাকে লাতি।'

বড়জন বিরাট খোঁপাসমেত মাথাটা ঘুরিয়ে অনিকে দেখে হাসল, 'কর-লে, ও ছোউয়ার গোঁফ নাই হলেক।' অনি বুঝল, ওর গোঁফ হয়নি এখনও, বাচ্চা ছেলে। বড়টা ছোটকে কিছু করে নিতে বলছে। কথাটা শুনে ছোটটা পেছন ফিরে কাপড় আঙরা গুটিয়ে জলের মধ্যে প্রায় হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল। এই প্রাকৃতিক শব্দ, যার সঙ্গে এই নির্জন আঙরাভাসা নদীর কোন সম্পর্ক নেই, কানে যেতেই অনি ঘুরে দাঁড়াল আর তারপর কোনদিকে না তাকিয়ে অন্ধকার নেমে যাওয়া মাঠের মধ্যে দিয়ে প্রাণপণে ছুটতে লাগল বাড়ির দিকে। পেছনে হঠাৎ মেয়ে দুটো হেসে উঠল গলা খুলে, 'সরমাতিস রে—এ ছোউয়া—হি-হি-হি।' ওদের গলার শব্দই কিনা বোঝা গেল না, দৌড়োতে দৌড়োতে অনি শুনল সেই ডেকে যাওয়া নিঃসঙ্গ পাহাড়টা হঠাৎ চুপ মেরে গেল, একদম চুপ।

উঠোনে ঢুকে অনি দেখল হ্যারিকেন জ্বালানো হয়ে গেছে। স্বর্গছেঁড়া চা-বাগানে এখনও ইলেকট্রিক আসেনি। শুধু ফ্যাক্টরীতে ডায়ানামো চালিয়ে বাতি জ্বালানো হয়। মহীতোষ বাড়ির পেছনে সম্প্রতি একটা ছোট টিনের চালাঘর করেছেন। বড় শৌখিন মানুষ মহীতোষ, কলকাতা থেকে ডায়নামো আনার ব্যবস্থা করেছেন। এখন যে কোন দিনই সেটা এসে যেতে পারে। অয়ারিং হয়নি, এমনি তার ঝুলিয়ে ঘরে ঘরে বাতি জ্বালাবার ব্যবস্থা পাকা। এই রাত্তিরবেলায় তালগাছের মাথায় জমে থাকা অন্ধকার, কাঁঠাল গাছের ডালে ডালে যে অদ্ভুত রহস্যের ভূতটা দলা পাকিয়ে বসে থাকে—অনির ভীষণ ইচ্ছে করে ইলেকট্রিক জ্বললে সেগুলোকে কেমন দেখবে। মহীতোষ ডায়নামো বসালে এটাই হবে এই তল্লাটের প্রথম ইলেকট্রিক-জ্বলা বাড়ি। স্বর্গছেঁড়া কেন, আশপাশের কোন চা-বাগানের বাড়িতেই এখনো ইলেকট্রিক আসেনি। কিন্তু মুশকিল হল, কবে আসবে ডায়নামোটা? ওরা চলে যাবার পর এলে অনির কি লাভ হবে! বাবা কেন কলকাতায় তাগাদা দিয়ে চিঠি লিখছে না! এই তো কিছুদিন আগে ওদের বাড়িতে প্রথম রেডিও এল, ওদের বাড়ি মানে স্বর্গছেঁড়ায় প্রথম রেডিও এল। মহীতোষ নিজে ছুটিতে গিয়েছিলেন কলকাতায় বেড়াতে। ফেরার সময় বড়সড় রেডিও সেটটা কিনে নিয়ে এলেন। শুধু রেডিও সেট নয়, সঙ্গে একটা আলাদা স্পিকার। বাইরের ঘরে রেডিও বাজতো, সেই রেডিও শুনতে ভিড় করে আসতেন বাবুরা। মহীতোষ ওর সঙ্গে একটা তার জুড়ে স্পিকারটাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন পঞ্চাশ গজ দূরে—আসাম রোডের কাছে। বড় কৃষ্ণচূড়া গাছের ডালে বেঁধে স্পিকারটা ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। আর রাস্তা জুড়ে বসে যত মদেসিয়া কুলিকামিন ভিড় করে শুনতো, 'অল ইন্ডিয়া রেডিও, কলকাতা।'

রেডিও আসার পর বাড়িটার চেহারাই যেন বদলে গেল। সরিৎশেখর সকাল বিকেল রেডিওর পাশে বসে থাকেন একগাদা বুড়ো নিয়ে, খবর শুনবেন। ছোট কাকু আধুনিক গান শুনবে চুপিচুপি, কেউ না থাকলে। রাত্তিরবেলা নাটক হলে স্পিকারটা ভিতরবাড়িতে চালান করে দিয়ে মহীতোষ উচ্চগ্রামে রেডিও বাজিয়ে দেন। সেদিন সন্ধ্যের মধ্যে রান্না শেষ করার তাড়া দেখা দেয় মা-পিসীদের মধ্যে। আটটা বাজলেই সব হাত পা গুটিয়ে বাবু হয়ে ভিতরের বারান্দায় সতরঞ্জি পেতে বসেন নাটক শুনতে। তখন কথা বলা নিষেধ—অনি নাটক শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে এক একদিন। এখন অবশ্য শুধু এ বাড়ি নয়—নাটক শুনতে আশেপাশের সব কোয়ার্টারের মেয়েরা সন্ধ্যের মধ্যে চলে আসে অনিদের বাড়ি। একটা সতরঞ্জিতে আর কুলোয় না এখন। সঙ্গের বাচ্চাদের একজোট করে মা বললেন, 'অনি, যাও, এদের সঙ্গে খেলা কর।' বিচ্ছিরি লাগে তখন। বরং বাইরের ঘুটঘুট্টি অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে নাটক শুনতে শুনতে, রেডিও ফাটিয়ে একটা গলা যখন চিৎকার করে কাঁদে—'আমার সাজানো

www.MurchOna.com

বাগান শুকিয়ে গেল' তখন বুকের মধ্যে কেমন করে ওঠে। মাকে আঁচলে চোখ মুছতে দেখে নিজেরই কান্না পেয়ে যায়।

এখন বাইরের ঘরে রেডিও বাজছে না। সরিৎশেখর বা মহীতোষ ফেরেননি এখনও। তুলসীগাছের নীচে প্রদীপ জ্বালা হয়ে গিয়েছে। ভিতরের বারান্দায় উঠতেই মা বললেন, 'হ্যাঁরে—কোথায় ছিলি এতক্ষণ?' অনি কোন কথা বলল না। দৌড়ে আসার জন্য ওর ফরসা মুখ লাল-লাল দেখাচ্ছিল। রান্নাঘরে যেতে যেতে মা আবার বললেন, 'খিদে পেয়েছে?' অনি ঘাড় নাড়লো, তারপর বাইরে চলে এল। বাইরের ঘরে বিরাট হ্যারিকেন জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। সামনে পাতাবাহারের গাছের পাশে যে ক্লাবঘর, তার দরজা খুলে ঝাঁটফাট দিয়ে ঝাড়িকাকু হ্যাজাক জ্বালাচ্ছে উবু হয়ে বসে। ওপাশে অন্ধকারে ডুবে থাকা আসাম রোড দিয়ে হুস হুস করে একটার পর একটা গাড়ি পালিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। অনি দেখল আজ জেনারেটর জ্বলেনি। হ্যাজাকটা জ্বেলে তারের আংটায় ঝুলিয়ে দিল ঝাড়িকাকু। সঙ্গে সঙ্গে চত্বরটা দিনের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। হ্যাজাকের তলায় ঝাড়িকাকুকে কেমন বেঁটে লাগছে। হাঁটু অবধি ঢোলা হাফ প্যান্ট আর ফতুয়া গায়ে দিয়ে মুখ উঁচু করে ঝাড়িকাকু হ্যাজাকটা দেখছে।

ঠিক সেই সময় অনি সাইকেলের ঘন্টিগুলো শুনতে পেল। চা-বাগানের ভিতর দিয়ে সাদা নুড়ি বিছানো যে রাস্তাটা ফ্যাক্টরীর মুখে গিয়ে পড়েছে, সাইকেলগুলো সেই রাস্তা দিয়ে আসছিল। অন্ধকার হয়ে যাওয়া চরাচরে এখন সবে জ্বলে ওঠা তারার আলো একটা আবছা ফিকে ভাব এনেছে, যার জন্য এতদূরে ওদের বারান্দায় দাঁড়িয়েও অনি চা-গাছগুলোর মধ্যে মধ্যে বসানো শেডট্রিগুলোকে বুঝতে পারল। দশ-বারোটা সাইকেল পর পর আসছে ঘন্টি বাজাতে বাজাতে। মাঝে মাঝে টর্চ জ্বেলে রাস্তা দেখে নিচ্ছে ওরা। প্রায় দেড় মাইল লম্বা এই রাস্তার দুধারে ঘন চা-গাছ আর শেড্‌ট্রি। সন্ধ্যের পর একা বড় একটা কেউ যায় না।

ছ'টার ভোঁ বেজে গেলে বাবুরা দল বেঁধে সাইকেলে চেপে বাড়ি ফেরেন। এখন একটু একটু হাওয়া দিচ্ছে। সামনে মাঠে একা দাঁড়িয়ে থাকা লম্বাটে কাঁঠালিচাঁপা গাছে একদল ঝিঁঝি করাত চালানোর মত শব্দ করে যাচ্ছে। সাইকেলের ঘন্টিগুলো আরো জোর হল। তারপর একসময় ওরা মোড় ঘুরে চা-বাগানের গেট পেরোতেই অনি ওদের দেখতে পেল। পর পর সাজানো কোয়ার্টারের সামনে পড়ে থাকা বিরাট মাঠের মধ্যে ঢুকে সাইকেলগুলো এবার আলাদা হয়ে যাচ্ছে। এক-একটা টর্চের আলো ধারালো তলোয়ারের মত লম্বা হয়ে এক-একটা কোয়ার্টারের দিকে চলে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত বাবাকে দেখতে পেলো অনি। আবছা আবছা বাবার জামা প্যান্ট দেখা যাচ্ছে। সাইকেলের গতি কমিয়ে টর্চের আলো নিবিয়ে দিলেন মহীতোষ। তারপর বাড়ির সামনে লম্বা বেঞ্চিতে সাইকেলটাকে খাড়া করে বারান্দায় উঠে এলেন। বছর বত্রিশের যুবক মহীতোষ প্যান্ট পরেন, ফুলপ্যান্ট। এই চা-বাগানের কেউ তা পরে না। হাঁটু অবধি মোজা গার্টারে বাঁধা, খাকি হাফপ্যান্ট আর হাফহাতা বুশশার্ট—এই হল এখানকার বাবুদের পোশাক। পাতিবাবু মশাবাবু—যাঁদের কাজ রোদ্দুরে ঘুরে ঘুরে, তাঁরা অবশ্য মাথায় একটা সোলার হ্যাট ঝুলোন।—কিন্তু মহীতোষ এই বয়সে হাফপ্যান্ট পরতে রাজী নন। ফুলপ্যান্টের পায়ের কাছটা ক্লিপ দিয়ে গুটিয়ে রাখেন সাইকেল চড়ার সময়। সারামুখে নিটোল করে দাড়িগোঁফ কামানো মহীতোষের মাথার চুল নিগ্রোদের মতন কোঁকড়া। হাসতে গেলে গজ-দাঁত দেখা যায়। বারান্দায় উঠে মহীতোষ ছেলেকে দেখে বললেন, 'আজ রাত্রে নদী বন্ধ হবে, বুঝলি।' বলে অনির মাথায় হাত বুলিয়ে ভিতরে চলে গেলেন।

হাঁ করে তাকিয়ে থাকল অনি। নদী বন্ধ হবে মানে আঙরাভাসা আজ বন্ধ করে দেওয়া হবে। এর আগে গত বছর, তখন অনি অনেক ছোট ছিল, আঙরাভাসাকে বন্ধ করা হয়েছিল। সেটা হয়েছিল শেষরাতে। অনিরা সবাই ঘুমিয়ে ছিল। শুধু পরদিন সকালে ঝাড়িকাকু এক ড্রাম ভর্তি চিংড়ি আর কাঁকড়া এনে দেখিয়ে যখন বলল যে নদী বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলে ওগুলো ধরা গেছে তখন এক দৌড়ে আঙরাভাসার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে ভীষণ আফসোস হয়েছিল অনির। খটখট করছে নদী, কোথাও এক ফোঁটা জল নেই। ভিজে শ্যাওলা আর নুড়ি পাথরের ওপর কয়েকটা কুকুর কি শুঁকছিল। পায়ে পায়ে নদীর ঠিক মধ্যিখানে দাঁড়িয়েছিল অনি। চারদিকে শুকনো পাথর, ছবিতে দেখা কঙ্কালের মত লাগছিল নদীটাকে। এমন সময় পায়ের তলায় কি সুড়সুড় করতে অনি দেখল একটা ছোট্ট লাল কাঁকড়া গর্ত

www.MurchOna.com

থেকে মুখ বের করছে। অনিকে দেখেই সেটা সুড়ৎ করে ভিতরে ঢুকে গেল। এখানে ওখানে কিছু চুনো মাছ, গেঁড়ি শুকিয়ে পড়ে আছে। অনির খুব আফসোস হচ্ছিল তখন, যদি সে দেখতে পেত হঠাৎ জল শেষ হয়ে যাওয়াটা। মাছগুলো তখন কি করছিল? তারপর আবার রাত্তির হলে জল ছাড়া হয়েছিল নদীতে। সেটাও অনি দেখতে পায়নি। পরদিন সকালে গিয়ে দেখলে ঠিক আগের মত যে-কে সেই। কুলকুল করে স্রোত বইছে। শুধু কাপড়কাচার পাথরের নীচে কোন মাছ ছিল না এই যা। বছরে একবার এই রকম হয়। শ্মশানের কালীবাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে আসা আঙরাভাসা নদীটাকে শূয়োরকাটা মাঠের পাশে দু'ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। এক ভাগ গেছে নিচে ধানের জমির গা দিয়ে দু নম্বর কুলি লাইনের পাড় ঘেঁষে ডুডুয়া নদীতে। আর অন্য বাঁকটার মুখে সিমেন্টের বাঁধ মত করে তার তলা দিয়ে জল আনা হয়েছে ফ্যাক্টরীতে। স্রোতটা এদিকেই বেশী। ফ্যাক্টরীর সেই বিরাট হুইলটায় যখন আবর্জনা জমে জমে পাহাড় হয়ে যায় তখন বাঁধের মুখটা বন্ধ করে দেওয়া হয়। জল তখন ওপাশে চলে যায়—এদিকটা খটখটে। ফ্যাক্টরীতে তখন হুইল পরিষ্কার করবার কাজ চলে। আজ আবার নদী বন্ধ হবে। কখন? উত্তেজনায় পায়ের তলা সিরসির করে উঠল অনির। আজ দেখতেই হবে। অনি ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে আর একটা টর্চের আলো দেখতে পেল। মহীতোষ বাড়িতে এসে রেডিও চালিয়ে দিয়েছেন। কি একটা আসর হচ্ছে এখন। অনি দেখল একটা টর্চের আলো লাফাতে লাফাতে এগিয়ে আসছে। এই আলোটাকে অনি চেনে। অন্ধকারে নেমে পড়ল অনি। পায়ের তলায় ভিজে থাকা শিশির আর ঠান্ডা বাতাসে ওর শীত করছিল। এগিয়ে আসা টর্চের দিকে ও দৌড়োতে লাগল। ক্রমশ অনি অন্ধকার ফুঁড়ে এগিয়ে আসা একটি বিরাট লম্বাচওড়া শরীর দেখতে পেল। হাঁটুর নিচ অবধি ধুতি, ঢোলা পাঞ্জাবি, হাতে লাঠি—সরিৎশেখর আসছেন। পেছনে ওঁর ব্যাগ হাতে বকু সর্দার। সরিৎশেখর হাঁটতে হাঁটতে দাঁড়িয়ে পড়লেন হঠাৎ। তারপর পাঁচ ব্যাটারীর টর্চ জ্বেলে সোজা করে ধরলেন সামনে। লম্বা আঁকশির মত আলোটা ছুটন্ত অনিকে টেনে নিয়ে আসছিল। যেন এক লাফে দূরত্বটা অতিক্রম করে অনি দাদুর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে টর্চ নিবিয়ে অনিকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে সরিৎশেখর বললেন, 'কি হয়েছে, দাদু?'

ফিসফিস গলায় বুকে মুখ রেখে অনি বলল, 'আজ আমি নদী বন্ধ হওয়া দেখব।'

পঁয়তাল্লিশ বছর চাকরি করার পর আর ছ'দিন বাদে সরিৎশেখর অবসর নেবেন। এই তো আজ বিকেলে হে সাহেবের সঙ্গে ওঁর বাংলোয় বসে কথা হচ্ছিল। একটা ফাইল সই করাতে নিয়ে গিয়েছিলেন সরিৎশেখর। কাজকর্ম মিটে গেলে হে সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'রিটায়ার করে কি করবে ঠিক করেছো বড়বাবু? সরিৎশেখর হেসেছিলেন, 'দেখি।' সঙ্গে সঙ্গে ওঁর মনে পড়ে গিয়েছিল বছর পাঁচেক আগেকার কথা। এই চেয়ারে বসে ম্যাকফার্সন সাহেবকে সেদিন এই প্রশ্ন করেছিলেন সরিৎশেখর। প্রায় বাইশ বছর একসঙ্গে কাজ করেছিলেন ওঁরা। ম্যাকফার্সনের ছেলে ডেসমন্ডকে জন্মাতে দেখেছেন উনি। বিলিতী কোম্পানীর এই চা-বাগানে চিরকাল স্কচ সাহেবরাই ম্যানেজারি করেছে। ম্যাকফার্সনের মত এত বেশী দিন কেউ স্বর্গছেঁড়ায় থাকেননি। সরিৎশেখরের দেখা ম্যানেজারদের মধ্যে ম্যাকফার্সন সব চেয়ে মাই-ডিয়ার লোক। এই তো সেদিন অনি জন্মাতে মিসেস ম্যাকফার্সন একগাদা প্রেজেন্টেশন নিয়ে ওঁর নাতির মুখ দেখে এলেন। চা-বাগানের ম্যানেজারদের যেসব নিয়মকানুন মানতে হয় সেগুলো প্রায়ই মানতেন না মিসেস ম্যাকফার্সন। বাবুদের সঙ্গে ওঁর বেশী মেলামেশা বারণ। কেউ তা করলেই তেলিপাড়া ক্লাবে কথা উঠবে। তারপর সেটা চলে যাবে কলকাতার সদর দপ্তরে। নির্দিষ্ট ম্যানেজারের নামের পাশে লাল ঢেঁড়া পড়বে। সরিৎশেখরের প্রশ্ন শুনে ম্যাকফার্সন চটপট বলেছিলেন, 'রিটায়ার মানে একদম বিশ্রাম। কোনও কাজকর্ম করবো না। ডেসমন্ড অস্ট্রেলিয়া থেকে লিখেছে একটা মাঝারি ফার্ম করেছে ক্যাটলের—ওটাই দুজনে দেখাশোনা করব।' ছেলেকে এই ছোটবেলায় শালীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সাহেব অস্ট্রেলিয়ায়। মিসেস ম্যাকফার্সন বলেছিলেন, 'চিঠি লিখবো কিন্তু আমি—তুমি উত্তর দেবে বাবু। আই ওয়ান্ট এভরি ডিটেল।' তা যাবার দু দিন আগেও বউমাকে কি সব সেলাই শিখিয়ে গিয়েছেন মিসেস ম্যাকফার্সন। আর গিয়ে অবধি প্রত্যেক মাসে একটা করে চিঠি লেখেন উনি। সব কিছু লিখতে হয় সরিৎশেখরকে। এমন কি সাহেবের বাংলোর গেটের পাশে যে বাতাবি-লেবুগাছটা—সেটার কথাও। ওদিকে মেমসাহেব এখন একা। ছেলের বিয়ে দিয়েছেন। সাহেব মাছ ধরতে গিয়ে নদীতে ডুবে মারা গেছেন। এইসব ব্যাপার। বছর

www.MurchOna.com

কুড়ি আগে তোলা মেমসাহেবের যুবতী অবস্থার একটা ছবি আছে সরিৎশেখরের কাছে। ডুডুয়া থেকে একটা বিরাট কালবোস মাছ ধরে উপহার দিয়েছিলেন তিনি সাহেবকে। মেমসাহেব সেই মাছটা দু হাতে সামনে ধরে ছবি তুলিয়ে সরিৎশেখরকে প্রেজেন্ট করেছিলেন। কি সুন্দর দেখতে ছিলেন মেমসাহেব—পায়ের পাতা অবধি গাউন পরতেন তখন। সেই মাছ ধরতে গিয়েই সাহেব মারা গেলেন।

আজ বিকেলে হে সাহেব আফসোস করলেন, 'তুমি চলে গেলে আমি কি করে চালাবো জানি না। কোম্পানী আর এক্সটেন্ড করতে চাইছে না—তোমার বয়স কত হল বাবু?'

'বাষট্টি।' উত্তর দিয়েছিলেন সরিৎশেখর।

'জানি, তোমারও ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে, কি করা যাবে বল! ওয়েল, তোমার জলপাইগুড়ির বাড়ি বানাতে যা যা দরকার তুমি বাগান থেকে নিয়ে যেও।' হে সাহেব বলছেন।

ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে? হ্যাঁ, তা হচ্ছে বইকি। এমন তো হয়নি যখন বড় বউ চলে গেল। ছোট বউ যাবার সময় খুব কষ্ট হয়েছিল এখন মনে পড়ে। শোক জীবনে কম পাননি তো। বড় মেয়ে বিধবা হল তেরো বছর বয়সে। এই তিন মাস আগে মেজ মেয়ে মরে গেল দুম করে বাচ্চাকাচ্চা রেখে। বড়ছেলে পরিতোষ বখাটে হয়ে কোথায় চলে গেছে—ওকে শুধরোতে পারলেন না উনি। কিন্তু এই সব দুঃখ পাওয়া কেমন সহ্যের মধ্যে ছিল। অন্য কাউকে টের পেতে দেননি। এমনিতেই সকলে বলে লোকটা পাষাণ। দয়ামায়া নেই একবিন্দু। ঠিক বুঝতে পারেন না নিজেকে উনি। কিন্তু চলে যাবার সময় যত এগিয়ে আসছে বুকের ভিতরটা তত ভার বোধ হচ্ছে কেন?

পঁয়তাল্লিশ বছর আগে উনি যখন স্বর্গছেঁড়া চা-বাগানে ছোটবাবুর চাকরি নিয়ে এসেছিলেন তখন আসাম রোডে সন্ধ্যে হলেই বাঘ ডাকতো। সাকুল্যে দুজন বাবু ছিল এই চা-বাগানে। চা-বাগান বললে ভুল বলা হবে, তখন তো সবে চা-গাছ লাগানো হচ্ছে। তিনকড়ি মন্ডল কুলি চালান নিয়ে আসছে রাঁচি থেকে। স্বর্গছেঁড়ার তিন রাস্তার মোড়ে চা-বিড়ি সিগারেটের কোনও দোকান ছিল না তখন। আর আজ বেশ রমরমে চারধার। তিল তিল করে জায়গাটা শহুরে শহুরে হয়ে গেল। চা-বাগানে বাবুদের সংখ্যা বেড়েছে, তাই ছুটির ভোঁ বাজলেই কেউ আর সিটে থাকতে চায় না। আজ ভীষণ বিরক্ত হয়েছেন নতুন ছোকরাটার ওপর। গ্র্যাজুয়েট ছেলে। হে সাহেব ইন্টারভিউ নিয়ে চাকরি দিয়েছেন। এমনিতে রোজ সবার পর বেরোন সরিৎশেখর। আজকে দেখেন অফিসারের ঘরে আলো জ্বলছে। কে আছে—কৌতূহল হল দেখার। নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে সরিৎশেখর উঁকি দিলেন। নতুন ছোকরা মনোজ হালদার মাথা ঝুঁকিয়ে ডিক্সনারী দেখছে। ওঁকে দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল ছেলেটি।

'কি ব্যাপার? এখনো বাড়ি যাওনি?' সরিৎশেখর জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তো-তো করেছিল মনোজ, 'এই, মানে চিঠিটা শেষ করে—।' হাত বাড়িয়ে বাংলায় লেখা একটা চিঠি তুলে ধরেছিলেন উনি। চিঠিটা পড়ে মাথার ভিতর দপদপ করতে লাগল। আজ দুপুরে উনি ছোকরাকে বলেছিলেন, ফায়ারউড সাপ্লাই দেয় যে কন্ট্রাক্টর, তাকে চিঠি লিখে সাবধান করে দিতে যে ওর লোকজন ঠিকমত সাপ্লাই দিচ্ছে না। মনোজ বাংলায় লিখেছে সেটা।

'বাংলায় কেন?' কোন রকমে বললেন তিনি।

'এই, ইংরেজিতে ট্রানস্লেশন করে নিচ্ছিলাম।' হাসলো মনোজ।

রাগে গা গরম হয়ে গেল সরিৎশেখরের। কি অবস্থা! একটা চিঠি লিখতে এদের কলম ভেঙে যায়, আবার গ্র্যাজুয়েট বলে ঢুকেছে। তিন মিনিটের কাজ তিন ঘন্টায় হয় না। এই হল ইয়ং ম্যান! অথচ তিনি তো মাত্র ফার্স্ট ক্লাস অবধি পড়া বিদ্যা নিয়ে এসেছিলেন। বাবা মারা যেতে পরীক্ষার ফি যোগাড় করতে পারেননি। আজ অবধি তাঁর ইংরেজীর ভুল কোনও সাহেব ম্যানেজার ধরতে পারেননি। মাত্র আট টাকা মাইনেতে ঢুকেছিলেন তিনি। এরা তো ঢুকেই আড়াইশ' টাকা হাতে পায়।

'আলোটা নিবিয়ে বাড়ি চলে যাও'। বলে বেরিয়ে এসেছিলেন তিনি। ইচ্ছে হচ্ছিল সোজা বাংলোয় গিয়ে সাহেবকে বলে সাসপেন্ড করেন ওকে। কিন্তু অনেক কষ্টে সামলে নিয়েছিলেন নিজেকে। আর তো ক'টা দিন আছেন এখানে, মিছিমিছি এই ছেলেটার ভবিষ্যৎ নষ্ট করার দায়ভোগ করবেন কেন? অবশ্য ভবিষ্যৎ যা নষ্ট হবার তা তো হয়েই গেছে ওর। শুধু লোকে বলবে, বুড়োটা যাবার আগে চাকরি খেয়ে গেল। বড় বড় ঝোলা সাদা গোঁফে হাত রাখলেন উনি। কোনও কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার ঘটলেই উনি আশু মুখুজ্যের মত ঠোঁটের দু পাশে ঝোলা গোঁফে অজান্তেই হাত বোলান।

www.MurchOna.com

অফিস থেকে বেরিয়ে আঙরাভাসার ওপর পাতা ছোট্ট পুল পেরিয়ে ফ্যাক্টরীর সামনে এলেন উনি, পেছনে বকু সর্দার। বকু প্রায় তিরিশ বছর আছে ওঁর সঙ্গে। বকুর ছেলে এবার বিনাগুড়ির মিশনারী স্কুল থেকে পরীক্ষা দেবে। কি নেশা হয়েছিল সরিৎশেখরের, জোর করে বকুর ছেলে মাংরাকে স্কুলে ভরতি করিয়ে দিয়েছিলেন। মিশনারীরা নাম রেখেছে জুলিয়েন। মদেসিয়া ছেলের সাহেব নাম বকু সর্দার কিন্তু আপত্তি করেনি। অবশ্য স্বর্গছেঁড়ায় এলে সবাই ওকে মাংরা বলেই ডাকে। তা এই ছেলে পাস করলে বাবুদের চাকরিতে নেবার জন্য বকু ওঁকে সম্প্রতি ধরেছে। ব্যাপারটা অন্য কুলিসর্দাররা কেমন চোখে দেখছে তা জানেন না সরিৎশেখর। এখন অবধি এই বাগানে কোনও লেবার-ট্রাবল' হয়নি কখনো—কিন্তু বকু যেভাবে ছেলের ব্যাপারে কথা বলছে—। ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকালেন উনি। মাথায় সাদা কাপড় পাগড়ীর মত বাঁধা, হাঁটুর ওপর গুটিয়ে পরা খাটো ধুতি, খালি গায়ে বকু একটা লাঠির ডগায় সরিৎশেখরের ব্যাগটা ঝুলিয়ে কাঁধে নিয়ে হাঁটছে। সাহেবের কানে বকুর ছেলের কথা পৌঁছেছে। ইঙ্গিতে আকারে বোঝা যায়, জুলিয়েনের চাকরি প্রায় হয়ে গেছে বললেই হয়। কেমন অস্বস্তি হতে লাগল তাঁর। ভাগ্যিস উনি ক'দিন পরেই রিটায়ার করে যাচ্ছেন। মহীতোষরা বুঝবে পরে। বাগানের বাবুদের পোস্টে স্থানীয় ছেলে থাকলে বাইরে থেকে লোক নেওয়া চলবে না। মোটামুটি এই প্রস্তাব এতদিনে কার্যকর করেছেন সরিৎশেখর। এতে সুবিধা হল, নতুন যারা ঢোকে তাদের জন্মাতে দেখেছেন উনি, ফলে কোনও দিন মাথা তুলে কেউ প্রতিবাদ করার সাহস পায়নি। এই প্রস্তাবটাকেই আঁকড়ে ধরেছে অন্যান্য চা-বাগানের কুলিরা। তারাও তাদের ছেলেমেয়েদের আগে সুযোগ দেবার দাবি জানাচ্ছে। লাঠি দিয়ে সামনের পাথরের নুড়ি সরিয়ে সরিৎশেখর হাসলেন, স্বাধীনতা এসে যাচ্ছে। ওঁর রিটায়ার করার দিন পনেরই আগস্ট।

ফ্যাক্টরীর সামনে আসতেই নতুন চায়ের গন্ধ পেলেন উনি। নিজে পঁয়তাল্লিশ বছর এখানে কাজ করে গেলেন কিন্তু চায়ের অভ্যেস কখনো হল না তাঁর। তবে এই ফ্যাক্টরীর সামনে দিয়ে যেতে তাঁর খুব ভাল লাগে। নতুন পাতার রস নিংড়ে যখন চা বাক্সবন্দী হবার চেহারা নিয়ে ফ্যাক্টরীতে স্তূপ হয়ে থাকে তখন হেঁটে যেতে যেতে নাক ভারি হয়ে ওঠে মিষ্টি গন্ধে। প্রচন্ড একটা টানা আওয়াজ আসছে ফ্যাক্টরী থেকে। আঙরাভাসার জলে ফ্যাক্টরীর হুইলটা ঘুরছে। ডায়নামো ফিট করে ইলেকট্রিক আলো জেলে দেওয়ায় জায়গাটা কেমন ম্যাড়মেড়ে দেখাচ্ছে। ফ্যাক্টরীর সামনে ডিস্‌পেনসারী। হলুদ রঙ করা একতলা বাড়ির সামনে আলো জ্বলছে। ডিসপেনসারীর খোলা দরজা দিয়ে ডাক্তার ঘোষালকে দেখতে পেলেন উনি। একটা বাচ্চা ছেলের হাতে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিচ্ছেন। মাথা-ভরতি পাকা চুল এই লোকটির ডাক্তারী ডিগ্রী থাকুক বা না থাকুক, ওঁর দিনরাত খেটে যাবার ক্ষমতাকে শ্রদ্ধা করেন সরিৎশেখর।

'বাড়ি যাবে নাকি হে ডাক্তার?' গলাখাঁকারি দিলেন উনি।

চকিতে মুখটা ঘুরিয়ে ডাক্তার ঘোষাল বাইরের দিকে তাকালেন, তারপর দুটো হাত জোড় করে কপালে ঠেকালেন, 'নমস্কার, স্যার।'

'কি হে, উঠবে?'

'এই হয়ে এল, আপনি এগোন, আমি আসছি।' ডাক্তার হাসলেন।

পা বাড়ালেন সরিৎশেখর, কিন্তু এগোনো হলো না তাঁর। ডিসপেনসারীর পাশের অন্ধকারে ঘাপটি মেরে কোথায় বসেছিল, ছিলা-ছাড়া তীরের মত ছিটকে এসে পড়ল সরিৎশেখরের পায়ে। এসে দুহাতে পায়ের পাতা জড়িয়ে ধরে ডুকরে উঠল, 'তুই কিনো চলি যাবি রে এ-এ।'

হাঁ হাঁ করে উঠলেন সরিৎশেখর, কিন্তু ছাড়াতে পারলেন না। দু হাতে শক্ত করে ওঁর হাঁটু জড়িয়ে ধরেছে, মাথাটা ঠুকছে এক-একবার। লাঠিতে ভর রেখে নিজেকে সামলালেন একবার। তারপর অসহায় চোখে পেছনে দাঁড়ানো বকুর দিকে তাকালেন। হলদে দাঁত বের করে বকু হাসল। তারপর মাথা দোলালো।

'এই ওঠ, ওঠ বলছি!' হেঁকে ওঠেন সরিৎশেখর।

'তু কাঁহা যাহাতিস্ রে-এ-এ।' মুখ তুললো কামিনটা। একমুখ ভাঙাচোরা রেখা, মাথায় কাঁচাপাকা প্রায় নুড়ি হয়ে আসা চুল, খালি গায়ে কোন রকমে জড়ানো শাড়ি কুচকুচে কালো কামিনটার তেঁতুলের খোসার মত আঙুল সরিৎশেখরের পায়ে চেপে বসেছিল। শেষ পর্যন্ত বকু সর্দার এগিয়ে এসে মেয়েটাকে ছাড়িয়ে নিল। সরিৎশেখর দেখলেন, কোনরকমে উঠে দাঁড়ালো ও, দাঁড়িয়ে টলতে লাগল।

www.MurchOna.com

চিনতে পারলেন এবার, তিন নম্বর কুলি লাইনের এককালের সাড়া-জাগানো কামিন সেরা। হাঁড়িয়া টেনেছে খুব। মদেসিয়া মেয়ের নাম সেরা বিশ্বাস করতে পারেননি উনি তিরিশ বছর আগে। হপ্তা নিতে এসেছিল এক শনিবার। টিপসই নিয়ে টাকা দিচ্ছিল ক্যাশিয়ার ব্রজেনবাবু অফিসের বারান্দায় বসে। আগের শনিবার পেমেন্টের একটা গোলমাল হয়েছিল বলে সরিৎশেখর সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মাথায় ফুলগোঁজা আঁটোসাটো শরীরের লম্বা এই মেয়েটাকে চোখে পড়েছিল ভিড়ের মধ্যে। ডুরে শাড়ি, লাল ব্লাউজ, আর শাড়ির ওপর হাঁটু অবধি নামা আঙরা জড়ানো শরীরটা নিয়ে রঙচঙ করছিল মেয়েটা। অন্য সবাই যখন সরিৎশেখরকে দেখে চুপচাপ টাকা নিয়ে যাচ্ছিল, তখন এই মেয়েটা চোখ ঘুরিয়ে তিন-চারবার দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়েছিল ওঁর দিকে তাকিয়ে। ব্রজেনবাবু যখন নাম ডাকলেন তখন বুঝতে পারেননি সরিৎশেখর প্রথমটায়। মেয়েটা যখন নিতম্ব দুলিয়ে শালিক পাখির মত হেঁটে এল, তখন সরিৎশেখর ব্রজেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কি নাম বললেন?'

সঙ্গে সঙ্গে কপট শব্দ করেছিল গলায় মেয়েটা, হাত নেড়ে ব্রজেনবাবুকে নাম বলতে নিষেধ করেছিল। তারপর আচমকা হেসে উঠে বলেছিল, 'সেরা—সেরা ওঁরাও। ফাস্টো কেলাস।'

এখন কি বলবেন এই মাতালপ্রায় বুড়ী হয়ে যাওয়া সেরাকে। দুটো পায়ে শরীরের ভর ঠিক রাখতে পারছে না। টলতে টলতে বাঁ হাত ঘুরিয়ে সেরা কি বলতে চেষ্টা করল আর একবার। তারপর হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে যেন এই প্রথম বকু সর্দারকে দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট বেঁকিয়ে মুখ-ভরতি থুতু মাটিতে ছিটকে ছিটকে ফেলল সেরা। সরিৎশেখর বুঝলেন, ও এখন হঠাৎ রেগে গেছে। বোধ হয় এখন সরিৎশেখর ওর মাথায় নেই। রেগে যাওয়ায় সেরার জরাজীর্ণ মুখ-চোখ আরো কদাকার দেখাচ্ছে। কিন্তু হঠাৎ সেই দৃশ্যটা চোখের মধ্যে চমকে উঠল তাঁর। বকু সর্দারের বউ একসময় নালিশ করেছিল, সেরা নাকি বকু সর্দারকে নষ্ট করছে। তখনও বকু সর্দার হয়নি। অফিসে পিয়নের চাকরি করে বলে অন্য কুলিদের থেকে মর্যাদা বেশী এই যা। সেরা সম্পর্কে তখন অনেক গল্প জেনে গেছেন। দু'একজন অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজারের বাংলোয় রাতে ওকে দেখা গেছে। যারা একটু লাজুক তারা সন্ধ্যের পর অন্ধকারে রাস্তায় দাঁড়ানো সেরাকে জিপে তুলে নিয়ে খুঁটিমারী ফরেস্টে ঘন্টাখানেক কাটিয়ে আসে। এই সব। কিন্তু মাংরার মা যখন ওঁর কাছে কেঁদে পড়ল বাড়িতে এসে তখন ছোট বউ বলেছিল, 'দূর করে দাও না মেয়েছেলেটাকে। বিশ্বাস নেই কিছু—।'

কি বিশ্বাস নেই সেটা আর জিজ্ঞাসা করেননি তিনি। চা-পাতি তুলতে গিয়ে সারাদিন সেরা গাছের তলায় পা ছড়িয়ে বসে পাতিবাবুর সঙ্গে গল্প করে এ খবর ছোট বউ-এর কানে এসেছিল। ইঙ্গিতটা যে একবার তাঁর দিকে সেটা বুঝতে অসুবিধা হয়নি। বকুকে ধমক দিয়েছিলেন সেদিনই—কিন্তু চুপচাপ মাথা গুঁজে দাঁড়িয়ে ছিল মাংরার বাবা। শেষ পর্যন্ত ব্রজেনবাবুকে এক শনিবার বলে রেখেছিলেন, সেরা টাকা নিতে এলে যেন ওঁর সঙ্গে দেখা করে।

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় তাঁর অফিস-ঘরে বসে তিনি অবাক হয়ে সেরাকে দেখলেন। কথাটা শুনেই নাকের পাটার পেতলের ফুলটা নেচে উঠল সেরার। কোমরে দু হাত রেখে মুখভরতি থুতু ছড়িয়েছিল অফিস-ঘরের মেঝেতে। চিৎকার করে বলেছিল, বকুর প্রতি ওর কোন লোভ নেই। কি জন্যে থাকবে—ওটা তো মেড়ুয়া—না আছে টাকাপয়সা, না তাগদ। তা ছাড়া কত বড় বড় রইস আদমী ওর চারপাশে ঘুরঘুর করছে, বকুর মত তেলাপোকার দিকে নজর দেবার সময় কোথায়? এই এখন, সেরার কোমরে হাত রেখে দাঁড়ানো দড়ি-পাকানো চেহারাটা দেখে চট করে সেই ছবিটা মনে পড়ে গেল ওঁর। মেয়েদের এক-একটা ভঙ্গী আছে সময় যাকে কেড়ে নিতে পারে না। বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে এবং সম্পূর্ণ নিজের অজান্তে সেগুলো তাদের শরীরে ফিরে আসে আচমকা। প্রত্যেক মেয়ের মধ্যে অভিমান এত দীর্ঘ সময় ধরে একই ভাবে গোপনে গোপনে কি আশ্চর্য সততায় বেঁচে থাকে যা কোনও পুরুষমানুষ লালন করতে পারে না। কবে কোন যৌবনে বকুর প্রতি ওর অভিমান ঘৃণা বা অহংকারে মিলে-মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল, এখন এতদিন পরে নেশার চূড়ান্ত মুহূর্তে সেগুলো ফিরে পেল সেরা—পেয়ে বোধ হয় আজ সারারাত বুঁদ হয়ে থাকবে। ভরবিকেলে আচমকা ঘুম ভেঙে গেলে মনে হয় না এই সবে সকাল হয়েছে!

www.MurchOna.com

নিজের মনে হেসে আবার হাঁটতে লাগলেন সরিৎশেখর। পেছনে বকু সর্দার। সেরা তখনও টলছে। ওরা যে চলে যাচ্ছে সেদিকে তার খেয়াল নেই। সাদা নুড়ি বিছানো বাগানের পথ দিয়ে হাঁটতে লাগল। ফ্যাক্টরীর আলো ফুরিয়ে যেতেই টর্চ জ্বাললেন তিনি। পাঁচ ব্যাটারির জোরালো আলো। ঘুটঘুটে অন্ধকার চমকে চমকে সামনের পথটা পরিষ্কার করে দিচ্ছে। দু পাশে ছোট শুকনো নালার ধারে থরে থরে চা-গাছ। রাস্তাটার বাঁকে দাঁড়িয়ে পেছনে তাকালেন উনি। দূরে ঝিম হয়ে থাকা ফ্যাক্টরীর হলদে-মেরে-যাওয়া আলোয় ডিসপেনসারি বাড়িটা আনাড়ী হাতের তোলা ছবির মত মনে হচ্ছে। আর তার সামনে একটা রোগাটে শাড়ি জড়ানো শরীর একই জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টলছে। সরিৎশেখর লক্ষ্য করলেন, বকু পেছন ফিরে দেখল না। মাথা নীচু করে পেছন পেছন আসছে তাঁর। দু পাশের চা-গাছের মধ্যে দিয়ে চলে যাওয়া অন্ধকার রাস্তায় টর্চ জ্বেলে যেতে যেতে সরিৎশেখর হঠাৎ এক অদ্ভুত ঘ্রাণ পেলেন। ছোট বউ কবে চলে গেছে। তখন তো তাঁর মধ্যযৌবন। এই এতদিন ধরে তিনি কি ভীষণ একা। আর আশ্চর্য, কথাটা এমন করে কই কখনো মনে পড়েনি তাঁর। এই স্বর্গছেঁড়া চা-বাগানে তার শিকড়গুলো কত গভীরে নেমে গেছে—নিজের কথা মনে পড়ার সুযোগই দেয়নি। এখন ছেলেরা বড় হয়ে গিয়েছে। দুটো সরল কথা বলার মত সম্পর্ক নেই আর। বড় মেয়ে বিধবা হয়ে তাঁর কাছেই আছে। ওঁর দেখাশুনো সে-ই করে। কিন্তু তাকেও তো সহজ হয়ে কিছু বলতে পারেন না তিনি। এই বয়সে নিজের চারদিকে এত রকমের দেওয়াল নিজেই খাড়া করে রেখেছেন দিন দিন—আজ বড় কষ্ট হল সরিৎশেখরের। ভারি পা টেনে টেনে চা-বাগানের রাস্তা ছেড়ে কোয়ার্টারের সামনের মাঠে এলেন উনি। টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে হঠাৎ চেয়ে দেখলেন, একটা ছোট্ট শরীর সারা গায়ে তাঁর টর্চের আলো মেখে দুর্গাঠাকুরের পায়ে ছুঁড়ে দেওয়া অঞ্জলির মত ছুটে আসছে। হঠাৎ আলো নিবিয়ে ফেললেন এবার। এই ঘন অন্ধকারে দাঁড়িয়ে তাঁর শরীরে লক্ষ কদম ফুটে উঠল। হিমমাখা বাতাসে হঠাৎ তাঁর শীত বোধ হল যেন। দু হাত বাড়িয়ে নিজের বিশাল দেহ নরম শরীরটাকে প্রায় লুফে নিয়ে কি গাঢ় মমতায় তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছে দাদু?'

এখন তাঁর চারপাশে কোনও দেওয়াল নেই। আকাশ হাতের কাছে, বুকের ওপরে।

ক্লাবঘরে মাঝে মাঝে শোরগোল উঠছে। পটাপট তাস ফেলার শব্দ, এর ওর ভুল বুঝিয়ে দেবার চেষ্টায় কান পাতা দায় ওখানে। হ্যাজাকের পূর্ণ আলো দরজা জানলা দিয়ে ঠিকরে পড়েছে বাইরের অন্ধকারে। মহীতোষ ওখানে আছেন। তাস-পাগল লোক। ব্রীজ টুর্নামেন্টে আশেপাশের চা-বাগান থেকে অনেক ট্রফি জিতে এনেছেন মালবাবুকে পার্টনার করে। সরিৎশেখরের যৌবনকালে কোন ক্লাবঘর ছিল না স্বর্গছেঁড়ায়। মহীতোষরা খালি পড়ে থাকা খড়ের ছাদ দেওয়া ঘরটাকে ক্লাবঘর বানিয়ে নিয়েছেন মেরামত করে। অবশ্য স্বর্গছেঁড়া বাজারে এখন বিরাট ক্লাবঘর হয়েছে। টিম্বার মার্চেন্টস আর কন্ট্রাক্টররা এসে জাঁকিয়ে বসেছে বা-বাগানের পাশে স্বর্গছেঁড়া বাজারে। ওটা খাসমহলের এলাকা। মাঝে মাঝে মহীতোষরা ঐ ক্লাবে তাস খেলতে যান। শুধু ব্রীজ নয়, পয়সা বাজি রেখে রামি, এমন কি কালীপূজার রাত্রে তিনতাস খেলাও হয়ে থাকে ওখানে। সরিৎশেখর ব্যাপারটা একদম পছন্দ করেন না। ফলে মাঝে মাঝে ইচ্ছে হলেও রামি বা তিনতাস নিজেদের ক্লাবে খেলেন না মহীতোষরা।

অনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে ক্লাবঘরের দিকে একবার তাকাল। বাবার গলা শোনা যাচ্ছে, মালবাবুকে কল ভুল দেবার জন্য বকছেন। এখন যদি অনিকে দেখতে পান, চিৎকার করে উঠবেন, কি চাই এখানে—যাও! অথচ মহীতোষকে বলার দরকার ছিল। সরিৎশেখর অনুমতি দিয়েছেন শুনে মা বলেছেন, 'বেশ যাও, বাবাকে বলে যেও।' আনন্দে লাফিয়ে উঠতে ইচ্ছে করেছিল কিন্তু বাবাকে বলার ব্যাপারটা ভাল লাগেনি অনির। ক্লাবঘরে যাওয়া নিষেধ ওর। ও আবার ভিতরের ঘরে ফিরে এল। এটা সরিৎশেখরের ঘর। একপাশে খাটে বিছানা সাজানো। লম্বা ইজিচেয়ারে উনি বসে আছেন। বিরাট পেটমোটা হ্যারিকেনটা একটা স্ট্যান্ডের ওপর জ্বলছে। সামনে রাখা টিপয়ের ওপর একটা দাবার বোর্ড। কালো গুটি খুব পছন্দ সরিৎশেখরের। বাঁ হাতের তালুতে মুখ রেখে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন বোর্ডের দিকে। হঠাৎ দেখলে মনে হবে খেলা চলতে চলতে ওঁর প্রতিদ্বন্দ্বী একটু উঠে গেছে। কিন্তু অনি জানে এটা দাদুর অভ্যেস। এই একা একা দাবা খেলা। ছোটবাবু মারা যাবার পর থেকে দাদু একাই দাবা খেলেন। আগে অফিস থেকে ফিরে হাতমুখ ধুয়ে ছোটবাবু চলে আসতেন এখানে। জলখাবার খেতেন দাদুর সঙ্গে। তারপর দাবা খেলার বোর্ড পাতা হতো। প্রায় দাদুর বয়সী মানুষ, মাথা জুড়ে টাক, সন্ধ্যের পর আর

www.MurchOna.com

বাঁধানো দাঁত পরতেন না বলে মুখটা বিশ্রী দেখাত। দাদুর সঙ্গে অনেক দিন এই চা-বাগানে কাটিয়েছিলেন উনি। বলতে গেলে দাদুর বন্ধু বলতে উনিই ছিলেন। খেলতে খেলতে কাশি হতো ওঁর, আর চট করে উঠে আসা কফ গিলে ফেলে দাদুর দিকে অপরাধীর ভঙ্গীতে তাকাতেন ছোটবাবু। সঙ্গে সঙ্গে বোর্ড থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে মাথা নাড়তেন সরিৎশেখর, 'নিজেই নিজের মৃত্যু ডাকছো হে, আমার কি, শুধু সন্ধ্যের পর এই খেলাটা বন্ধ হবে এই যা।' যেদিন ছোটবাবু মারা গেলেন অনির মনে পড়েছিল ঐ কফ গেলার কথাটা। নিশ্চয়ই কফগুলো জমে জমে ছোটবাবুর পেটটা ভরতি হয়ে গিয়েছিল। সেদিন চা-বাগানের লোকজন ছোটবাবুর বাড়িতে ভেঙে পড়েছিল। অনেকদিনের মানুষ। কিন্তু সরিৎশেখর যাননি। অনিদের বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন ছোটবাবুকে কাঁধে করে মহীতোষরা। মা ঘোমটা টেনে এসে বলেছিলেন, উনি তো নেই। তারপর সন্ধ্যে পেরিয়ে গেলে ছোটবাবুকে নিয়ে ওরা অনেকক্ষণ চলে যাবার পর চোরের মত বাড়ি ফিরেছিলেন সরিৎশেখর। এক হাতে অনিকে জড়িয়ে ধরে দাবার বোর্ড পাততে পাততে সেই সবে রাত হওয়া হ্যারিকেনের আলোয় ফিস ফিস করে বলেছিলেন, 'ব্যাটা চলে গেল। বুঝলে।'

'তুমি এলে না কেন?' অনি জিজ্ঞাসা করেছিল।

'মাথা খারাপ! যদি ডাক দেয়, বলে চলো, বিশ্বাস আছে কিছু!' গুটি সাজাতে সাজাতে বললেন সরিৎশেখর। আর হঠাৎ সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে উঠেছিল অনির। ঝাড়িকাকু বলেছিল, মানুষ মরে গেলে ভূত হয়।

এখন সরিৎশেখর একা একমনে দাবা খেলছেন। সম্প্রতি দাঁত বাঁধিয়েছেন তিনি। বাঁদিকের টেবিলে একটা পেয়ালার জলে ডুবে ওঁর খোলা দাঁত হাসছে। তোবড়ানো গাল দেখতে দেখতে অনির মনে হল ছোটবাবুর সঙ্গে দাদুর মুখের এখন কি ভীষণ মিল! হঠাৎ কি হল, অনি দৌড়ে ভিতরে চলে এল। আর ঠিক তখন দূরে ফ্যাক্টরীতে আটটার ভোঁ বেজে উঠল। ঝাড়িকাকু খবর এনেছিল আটটায় নদী বন্ধ হবে।

রান্নাঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে মা বললেন, 'অনি হাওয়া দিচ্ছে খুব, চটি পরে গলায় মাফলার জড়িয়ে যাও।'

তর সইছিল না অনির। একটু একটু ঠান্ডা বাতাস বইছে বটে তার জন্যে মাফলার পরার দরকার হয় না। মায়ের সবতাতেই বাড়াবাড়ি। অবশ্য ওর টনসিলের ধাত আছে একটু, ডাক্তারবাবু ঠান্ডা কিছু খেতে নিষেধ করেছেন। তাই বলে এই হাওয়ায় আর কি হবে! এপাশের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ও মায়ের দিকে তাকাল। বারান্দার সিলিং থেকে ঝোলানো শিকে রাখা হ্যারিকেনের আলোয় মাকে কেমন দেখাচ্ছে। লাল শাড়ি পরেছে মা। কাপড়টা যেন সব আলো শুষে নিচ্ছে এখন। মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে অনির বুকের ভিতর কেমন করে উঠল। আস্তে আস্তে ও ভিতরের ঘরে ঢুকে আলনা থেকে মাফলারটা টেনে গলায় জড়িয়ে নিল।

ঝাড়িকাকু একটা খালুই হাতে উঠোনে দাঁড়িয়ে ছিল। শীত-ফিত বেশী লাগে না ওর। পূজোর পর থেকে একটা আলোয়ান ফতুয়ার ওপর জড়িয়ে নেয়। এখন যে-কে সেই। 'তাড়াতাড়ি চল।' ঝাড়িকাকু ডাকল।

উঠোনে নেমে এল অনি। পিসীমার গলা পেল ও। নিজের ছোট ঘরে বসে এতক্ষণ পূজো করছিলেন, এইবা 'গুরুদেব দয়া কর দীনজনে' বলে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর অনিকে দেখতে পেয়ে বলে উঠলেন, 'তাড়াতাড়ি চলে আসিস বাবা, যা পচা শরীর তোর। ঝাড়িটারও খেয়েদেয়ে কাজ নেই, ছেলেটাকে নাচাল।'

ঝাড়িকাকু কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই অনি নেমে গেছে উঠোনে। ঝাড়িকাকু কি বিড়বিড় করে টর্চের আলো জ্বালালো। ছোট্ট টর্চ। প্রায় বিগড়োয়। ফ্যাকাশে আলো পড়ছে মাটিতে। আকাশ মেঘলা বলেই অন্ধকার বেশী লাগছে। এমন কি সামনের গোয়ালঘর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। ওরা হাঁটতে লাগল। একটু ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে। অনি ঝাড়িকাকুর পিছনে যেতে যেতে হঠাৎ হাত বাড়িয়ে ওর ফতুয়ার কোণটা চেপে ধরল। এরকম অন্ধকারে এর আগে কোনদিন হাঁটেনি ও।

গোয়ালঘরের পেছনে লম্বা গাছগুলোর তলা দিয়ে যেতে যেতে ওরা চিৎকার শুনতে পেল। দ্রুত পা চালাচ্ছিল ঝাড়িকাকু। প্রায় ছুটতে ছুটতে ওরা আঙরাভাসার পাড়ে এসে দাঁড়াল। আর দাঁড়াতেই একটা

www.MurchOna.com

অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল অনির। পুরো নদীটা জুড়ে যতদূর দেখা যায়, সেই ধোপার ঘাট পর্যন্ত, অজস্র হ্যারিকেন আর টর্চের আলো জোনাকির মত নাচছে। আচমকা দেখলে মনে হয় যেন দেওয়ালির রাতটাকে কে উপুড় করে দিয়েছে নদীতে। সমস্ত কুলি লাইন ভেঙ্গে পড়েছে এখানে। আঙরাভাসার দিকে তাকিয়ে কেমন বিশ্রী লাগল অনির। জল এখন পায়ের তলায়। কাপড়কাচা পাথরটা ভেজা নুড়ির ওপর পড়ে আছে। জল মাঝখানে। তাও কমে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। লাফ দিয়ে নেমে পড়ল ঝাড়িকাকু। একটি বিরাট লম্বা বানমাছ ঠিক সামনেটায় খলবল করছিল। একটা মদেসিয়া মেয়ে মাছটার দিকে এগোবার আগেই ঝাড়িকাকু বাঁ হাতে সেটাকে তুলে খালুইতে ঢুকিয়ে নিল। মেয়েটা চিৎকার করে গাল দিয়ে উঠল। হাত বাড়িয়ে ওকে ডাকল ঝাড়িকাকু। অনি ভেজা নুড়ির ওপর সাবধানে হেঁটে এল। পায়ের কাছে একটা পাথরঠোকা মাছ জল না পেয়ে লাফাচ্ছে। দুই-তিনবারের চেষ্টায় ওটাকে ধরে অনি ঝাড়িকাকুর খালুইতে ফেলে দিল।

'তোর তো রবারের চটি, জল লাগলে কিছু হবে না, তুই টর্চটা ধর। যেখানে ফেলতে বলবো সোজা করে আলো ফেলবি।' হাত বাড়িয়ে টর্চটা দিল ঝাড়িকাকু। জল এখন নেমে গেছে পুরোপুরি। শ্যাওলা আর ভাঙা ডালপালা নদীর বুকে ছড়িয়ে আছে এখন। মাঝে মাঝে কাদা জমেছে। স্রোতের সময় কাদা দেখা যায় না। অজস্র পোকামাকড় উড়ছে এখন। এরা সব কোথায় ছিল কে জানে। তিনটি মেয়ে দল বেঁধে হাতে কুপি জ্বেলে মাছ খুঁজছে। অনি দেখল ওরা খুব হি হি করে হাসছে। আলো পড়ে ওদের কালো শরীর চকচক করছে। ঝাড়িকাকুকে ক্ষেপাচ্ছে ওরা। একটা গর্তের মুখে টর্চ ফেলতে বলল ঝাড়িকাকু। নদীর কিনারে চ্যাপ্টা পাথরের গা ঘেঁষে গর্তের মুখে। আলো ফেলে অনি দেখল তিন-চারটে মোটা মোটা পা গর্তের মুখে বেরিয়ে আছে। পকেট থেকে একটা শক্ত সুতো বের করে তার ডগায় একটু শ্যাওলা বাঁধলো ঝাড়িকাকু। তারপর টানটান করে সুতো ধরে শ্যাওলাটাকে গর্তের মুখে নাচিয়ে নাচিয়ে ভিতরে ঢোকাবার চেষ্টা করতে লাগল। অনি দেখল চট করে পাগুলো ভিতরে ঢুকে গেল। গর্তের মধ্যে জমা জলে একটু বুদ্বুদ উঠল। আলোটা নিবিয়ে দিল অনি। যাঃ, চলে গেল! কিন্তু ঝাড়িকাকু চাপা গলায় বলল, 'আঃ, নেবালি কেন?' আবার আলো জ্বালালো অনি। চাপা নিঃশ্বাসের শব্দ কানে যেতে অনি দেখল মেয়ে তিনটে পেছনে এসে দাঁড়িয়ে কৌতূহলী চোখে ব্যাপারটা দেখছে। ঝাড়িকাকুও ওদের দেখেছে, কিন্তু এখন তার মনোযোগ গর্তের দিকে। গর্তের মুখটাতে শ্যাওলাটাকে নাচাচ্ছে একমনে। হাত টনটন করতে লাগল অনির। মুখ ঘুরিয়ে ও নদীর চারপাশে তাকাল। আজ রাতে আর নদীতে কোন মাছ পড়ে থাকবে না। লণ্ঠন কুপি আর টর্চের আলোয় নদীটা পরিষ্কার। হঠাৎ তিনটে মেয়ে একসঙ্গে হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠতেই অনি চট করে মুখ ফেরাল। ঝাড়িকাকু একগাল হেসে হাতটা মাথার ওপরে তুলে ধরেছে। আর সুতোর শেষে মাটি থেকে ওপরে একটা বিরাট কাঁকড়া খলবল করে ঝুলছে। শেষ পর্যন্ত সেটা সুতো ছেড়ে পাথরের নুড়ির ওপর পড়তেই ঝাড়িকাকু খালুইটা ওর ওপর চেপে ধরল। তারপর অতি সন্তর্পণে খালুই-এর তলা দিয়ে বেরিয়ে আসা মোটা দাড়া দুটো ধরে কাঁকড়াটাকে বের করে আনল। টর্চের আলোয় কুচকুচে কালো কাঁকড়াটাকে মুগ্ধদৃষ্টিতে দেখল অনি। অত বড় কাঁকড়া এর আগে কখনো দেখেনি সে। দুটো গোল গোল চোখ ঘুরিয়ে অনিকে দেখছে ওটা। খালুই-এর ভিতরে টপ করে ফেলে দিল ঝাড়িকাকু। কাঁকড়াটাকে ফেলে দিয়ে সেই হাতে পাশে দাঁড়ানো তিনটে মেয়ের একটার চিবুকে টোকা দিয়ে দিল। টর্চের আলোটা সম্মোহিতের মত ঘুরিয়েছিল অনি। ফ্যাকাশে আলোটা মেয়েটির মুখে পড়তেই ও দেখল কেমন থতমত হয়ে গেল মেয়েটি। সঙ্গীরা খিলখিল করে হেসে উঠতেই ও লাজুক লাজুক মুখ করে মাথা নামাল।

আধ ঘন্টার মধ্যেই খালুই ভরতি হয়ে গেল। বান, কাঁকড়া, পাথরঠোকা, চিংড়ি আর পেটমোটা পুঁটি এরকম কত মাছ। ঝাড়িকাকু বলল, 'তুই এখানে দাঁড়া, আমি মাছগুলো বাড়িতে রেখে আসি।' হঠাৎ অনির কেমন ভয়-ভয় করতে লাগল। এই অন্ধকারে যদিও নদীতে প্রচুর মদেসিয়া আলো জ্বেলে ঘুরছে, তবুও ওর শরীর সিরসির করতে লাগল। আবছা আলো-অন্ধকারে মানুষগুলোর মুখ স্পষ্ট করে চেনা যাচ্ছে না, কেমন রহস্যময় দেখাচ্ছে চারপাশ। ওরা ওদের ঘাটে কাপড়কাচা পাথরটার ওপর ফিরে এল। অনির পায়ের গোড়ালি অবধি কাদা মাখা, রবারের চটি চপচপ করছে। ঝাড়িকাকুর ফতুয়া ধরে ও

www.MurchOna.com

পাড়ের দিকে তাকাল। ফুলগাছ ডুমুরগাছ আর বুনো ফুলের গাছগুলোর মধ্যে চুপচাপ যে অন্ধকার জমে আছে সেদিকে চেয়ে ওর বুকের মধ্যে তিরতির করে উঠল। হঠাৎ একটা লম্বা মূর্তি সেই অন্ধকারে চলে গেল, পেছন পেছন আর একজন শাড়ি-পরা। মুখ দেখতে পেল না ও। মূর্তি দুটো অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। কারা ওরা? এটা তো ওদের দিকের পাড়। মদেসিয়ারা এখন নিশ্চয়ই এদিকে আসবে না। ফিসফিস করে ও বলল—'ঝাড়িকাকু!' মুখ ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকাল ঝাড়িকাকু। কাঁচাপাকা সাত দিন না-কামানো দাড়ি, হাফ প্যান্ট আর ফতুয়া পরা বেঁটে-খাটো এই মানুষটাকে অনির এমন খুব আপন মনে হচ্ছিল। এক হাতে ওকে জড়িয়ে ধরে কাছে টেনে ঝাড়িকাকু বলল, 'কি হয়েছে?'

'ওরা কারা?' ফিসফিস করে বলল অনি। ভাল করে অন্ধকারে চোখ বুলিয়েও কিছু ঠাওর করতে পারল না ঝাড়িকাকু। অনির হাত থেকে টর্চ নিয়ে অন্ধকারে আলো ফেলল ও। ফ্যাকাশে আলো বেশি দূরে গেল না।

'কি দেখেছিস?' ঝাড়িকাকু জিজ্ঞাসা করল।

'একজন তারপর আর একজন। কারোর মাথা নেই।' অনি প্রায় কেঁদে ফেলে আর কি।

'ও কিছু না', ঝাড়িকাকু মাথা নাড়ল, 'রামনাম বল। ওঁরা হলে চলে যাবেন। মাছ বড় ভালবাসেন তো।' বলতে বলতে খালুইসুদ্ধ হাত জোড়া করে নমস্কার করল। অনি মনে মনে রাম রাম বলতে শুরু করে দিল এবার। এখানে এই নদীতে এত লোক, তবু সাহস হচ্ছে না কেন?

ঠাণ্ডা বাতাস যা এতক্ষণ বইছিলো এলোমেলো, হঠাৎ গাছের পাতা নাচিয়ে দিল এবার। না ঘুমুতে পারা পাখিগুলো নির্জন নদীতীরে হঠাৎ আসা একদল মানুষের চিৎকারে কিচিরমিচির করছিল এতক্ষণ, ডালপালা নড়ে উঠতেই ডানা ঝাপটাতে লাগল। হিমবাতাস নদীর মধ্যে নেমে একটা সোঁ সোঁ শব্দ তুলে চিরুনির মত গাছপালার ফাঁক গলে কোথায় উধাও হয়ে যাচ্ছিল। পুলওভার থাকা সত্ত্বেও অনির শীতবোধ হল।

ঝাড়িকাকু বলল, 'ডাক্তারবাবুর ছেলে হরিশ বড় মাছ খেতে ভালবাসত।' ঝাড়িকাকুর মুখের দিকে তাকাল অনি। অন্ধকার কালির মত লেপ্টে আছে। ভাল করে বোঝা যাচ্ছে না। ডাক্তারবাবুকে অনি ভাল করেই চেনে। ডাক্তারবাবু আর দিদিমা, ওদের বাড়িতে কোন ছেলেমেয়ে নেই। তাহলে কার কথা বলছে ঝাড়িকাকু! কে হরিশ! এই নামের কাউকে চেনে না তো ও!

'হরিশ কে? আমি দেখিনি তো!' অনি বলল।

'তুই দেখবি কি করে?' হাসলো ঝাড়িকাকু, 'তুই তো এই সেদিন হলি। তোর বাবার চেয়ে বছর তিনের ছোট ছিল হরিশ। সেই যেবার ডুডুয়া নদীতে যখন খুব জল বেড়ে গেল, রাস্তার ওপর জল উঠে বাস বন্ধ হল, সেবার এই কুলগাছের মাথা থেকে ধুপ করে পড়ে গেল ছোঁড়াটা। খুব ডানপিটে ছিল তো। আমি তখন এই ঘাটে বসে বাসন মাজছি। কাজ শেষ করে বাসন মাজতে তিনটে চারটে বেজে যেত। ভরদুপুরবেলা বাসন মাজছি বসে, হঠাৎ হরিশ এল। গাছটায় কুল হতো তখন, পাতা দেখা যেত না। তা হরিশ তলার ডালের কুলগুলো শেষ করে দিয়েছিল পাকার আগেই। হরিশ লাফ দিয়ে তরতর করে মগডালে চলে গিয়ে হাত বাড়িয়ে কুল ছিঁড়ে অর্ধেক খেয়ে আমাকে ঢিল মারছিল। ডাক্তারবাবুর ছেলে, আমি কি বলব বল! ঐ মগডালে বসে বসে ও আমাকে বলল, ডুডুয়াতে জল কমে গেলে বানমাছ মারতে গেলে কেমন হয়? বানমাছ ধরার বঁড়শি আমার কাছে ছিল হরিশ জানতো। কর্তাবাবু কত রকমের সুতো আর বঁড়শি শহর থেকে পোস্ট অফিস দিয়ে আনাতেন। আমি দুটো বঁড়শি চেয়ে নিয়েছিলাম। মুশকিল হতো বানমাছ বড়দি রান্না করতে চাইতো না কিছুতেই। ধরলে খাব কি করে? হরিশের মা রান্না করে ভাল। বড়দি বলতো, ঢাকার মেয়ে তো, তাই পারে। আমি একদিন খেয়েছিলাম, বড় ঝাল! তা আমি বললাম, 'বড়দি যদি যেতে দেয় যাবো।' কথাটা বলে ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে অন্ধকারে দাঁড়ানো কুলগাছটার দিকে তাকাল ঝাড়িকাকু।

পিসীমাকে বড়দি বলে ঝাড়িকাকু। বাবা ছোট কাকারাও বড়দি বলে। এই সেদিন আগে পর্যন্ত শুনে শুনে অনিও বলত বড়দিপিসী। তখন কি ছোট ঠাকুমা ছিল না? না সেই কমুড়ো নিয়ে দেশের বাড়িতে গিয়েছিল বলে মরে গিয়েছিল? মা তখন ছিল না এটা বুঝতে পারছে অনি। পিসীমা বলেন, চব্বিশ বছর বয়সে বাবার বিয়ে হয়েছিল। বাবা যখন কুল খেতো তখন নিশ্চয়ই ছোট ছিল। অনি বলল, 'তারপর?'

www.MurchOna.com

কথা বলার সময় ঝাড়িকাকুর একটা পিতলে বাঁধানো দাঁত দেখতে পাওয়া যায়। রোজ ছাই দিয়ে দাঁত মাজে বলে চকচক করে। ঝাড়িকাকু বলল, 'বাসন মাজতে মাজতে হঠাৎ শুনতে পেলাম বুকফাটা চিৎকার। চমকে উঠে দাঁড়িয়ে দেখি হরিশ পড়ে যাচ্ছে। অত উঁচু ডাল ভেঙে পড়ে যাচ্ছে হরিশ, আমি চেয়ে দেখলাম। পড়ে দিয়ে কেমন দলা পাকিয়ে গেল ও। আমি চিৎকার করে সবাইকে ডেকে আনলাম। ডাক্তারবাবু দুপুরে খেতে এসেছিলেন। চিৎকার শুনে ছুটে এলেন। সাহেবের গাড়ি করে জলপাইগুড়ি নিয়ে গেলে যদি বাঁচানো যায়, পাগলের মত সবাই ছুটলো ওকে নিয়ে। ডুডুয়ার জল বেড়েছে সকাল থেকে, রাস্তার ওপরে জল, এত জল আগে কখনো হয়নি। সন্ধ্যেবেলা মড়া নিয়ে ফিরে এল ওরা, যেতে পারেনি। তা হরিশ্ চলে যাবার তিন দিন পরই ঘটে গেল ব্যাপারটা। তখন কর্তাবাবু লোক দিয়ে এই ঘাটে খড়ের ছাউনি করে দিয়েছিলেন। বৃষ্টিবাদলায় ভিজতে হবে না বলে। সেদিন রাত্তিরে খাওয়াদাওয়া হয়ে গেলে বাসনগুলো নিয়ে এসেছিলাম মেজে ফেলতে। চাঁদের রাত হলে রাত্রেই বাসন মাজতাম। রাত হয়ে গেলে নদীতে কেউ আসে না। কিন্তু আমার ভয়টয় করতো না। বাসন মাজা হয়ে গেলে উঠে দাঁড়িয়েছি, হঠাৎ শুনি মাথার উপর খড়ের চালে মচমচ শব্দ হচ্ছে। এ ঘাটের ওপর তো কোন গাছপালা নেই, ব্যাপারটা কি দেখবার জন্য মুখ বাড়িয়েছি তো আমার শরীর ঠাণ্ডা। হরিশ বাঁশের চালায় পা ঝুলিয়ে বসে হাসছে। আমায় দেখে বলল, 'কি মাছের কাঁটা ফেললি রে নদীতে, কালবোস? আমায় দিবি?' কেমন খোনা খোনা শব্দ। কিন্তু একদম হরিশ। আমি একছুটে বাড়ি এসে বড়দিকে বললাম। বাসনটাসন সব রইল নদীর পাড়ে। বড়দি তক্ষুনি এক প্লেট ভাজা মাছ আমাকে দিয়ে বলল ঘাটে রেখে আসতে। আমি রাম রাম বলতে বলতে মাছ নিয়ে আবার এসে এখানে রেখে দৌড়ে ফিরে গেলাম। বাসন নেবার কথা মনে নেই। আর চালার দিকেও তাকাইনি। পরদিন সকালে দেখি বাসনগুলো তেমনই আছে, প্লেটটাও, শুধু মাছগুলো নেই। তারপর থেকে যদ্দিন ডাক্তারবাবু পিণ্ডি দেননি ততদিন ওর মা ওর জন্যে একপ্লেট মাছ নদীর ধারে রেখে যেত। আমি অবশ্য আর সন্ধ্যের পর এখানে আসিনি।' অনিকে জড়িয়ে ধরে টর্চ জ্বেলে হাঁটতে লাগল ঝাড়িকাকু, 'নে চল।'

এতক্ষণ হাওয়া দিচ্ছিল, এখন টুপ টুপ করে কয়েক ফোঁটা পড়ল। 'তাড়াতাড়ি পা চালা।' ঝাড়িকাকু বেশ দ্রুত হাঁটছিল। দু পাশে অন্ধকার রেখে ফ্যাকাশে আলোর বৃত্তে পা ফেলে ওরা এগিয়ে আসছিল। এখন চারপাশে শুধু বাতাসের শব্দ ছাড়া কিছু নেই। অবশ্য ঝাড়িকাকুর হাতের খালুইতে বড় কাঁকড়াটা ভীষণ শব্দ করছে। ওরা ঘোয়ালঘরের পাশ দিয়ে আসতে হঠাৎ কালীগাই-এর গম্ভীর গলার ডাক শুনতে পেল। যেন পরিচিত কেউ যাচ্ছে বুঝতে পেরেছে ও। জিভ দিয়ে একটা শব্দ করে সাড়া দিল ঝাড়িকাকু। অনির মনে হচ্ছিল, এখন যে কোন মুহূর্তেই হরিশ ওদের সামনে এসে হাত বাড়িয়ে মাছ চাইতে পারে। আর ঠিক তখনি অন্ধকারে একটা আকন্দ গাছের পাশে দুটো মূর্তিকে নড়ে উঠতে দেখে অনি দু হাতে ঝাড়িকাকুকে জড়িয়ে ধরল। ঝাড়িকাকুও দেখতে পেয়েছিল ওদের। খানিকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থেকে মাথা দোলাল একবার। তারপর অনির হাত ধরে সোজা হেঁটে খিড়কিদরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে বলল, 'তোর যা ভয়, ও তো প্রিয়।' চমকে গেল অনি। প্রিয়? মানে কাকু? কাকু এত রাত্রে ঐ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কি করছে? সঙ্গে শাড়ি-পরা মেয়েটা কে? চট করে নদীর পাড়ে দেখা দুটো মূর্তির কথা মনে পড়ে গেল ওর। অন্ধকারে মনে হয়েছিল যাদের মাথা নেই। তা হলে কাকু আর একটা মেয়ে নদীর পাড়ে গিয়েছিল মাছ ধরা দেখতে? মেয়েটা কে জানতে খুব ইচ্ছে হচ্ছিল অনির।

উঠোনে ওদের দেখেই মা আর পিসীমা একসঙ্গে বকাঝকা শুরু করলেন। পিসীমা বকছিলেন ঝাড়িকাকুকে, কেন এতক্ষণ ও অনিকে নিয়ে নদীতে ছিল, আর মা অনিকে। অনি যখন টিউবওয়েলের জলে পা ধুচ্ছে ঠিক তখন নদীর মধ্যে প্রচণ্ড শোরগোল হচ্ছে শুনতে পেল। কারা ভয় পেয়ে উত্তেজনায় চিৎকার করছে। একবার ফিরে তাকিয়ে ঝাড়িকাকু আবার ছুটে গেল অন্ধকারে টর্চ জ্বেলে। কি হয়েছে জানতে ওরা উঠোনে এসে দাঁড়াল। উঠোনের এখানটায় অন্ধকার তেমন নেই। শিকে টাঙানো হ্যারিকেনের আলো অনেকটা জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। ঝাড়িকাকু চলে যেতে ওরা দেখল তিন-চারটে লণ্ঠন গোয়ালঘরের পিছন দিকে ছুটে ডাক্তারবাবুর কোয়ার্টারের দিকে চলে গেল।

এমন সময় প্রিয়তোষ খিড়কিদরজা খুলে ভিতরে এল। পিসীমা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছে রে?'

www.MurchOna.com

'কি জানি।' প্রিয়তোষ হাঁটতে হাঁটতে বলল।

'তুই কোথায় ছিলি?' পিসীমা আবার জিজ্ঞাসা করলেন।

চটপট পা চালিয়ে কাকু ততক্ষণে ভিতরে চলে গিয়েছে। অনি দেখল থমথমে মুখ পিসীমা মায়ের দিকে তাকালেন। মা চোখোচোখি হতেই মুখ নামিয়ে নিলেন। পিসীমা মনে মনে বিড়বিড় করে বললেন, 'বড় বেড়ে যাচ্ছে, বাবা শুনলে রক্ষে রাখবে না।'

একটু বাদেই ঝাড়িকাকু ফিরে এল হাঁপাতে হাঁপাতে। ওর কাছে শোনা গেল ব্যাপারটা। মাছ ধরার নেশায় সবাই নেমে পড়েছে নদীতে। তা ঐ লাইনের বংশী, বয়স হয়েছে বলে চোখে ভাল করে দেখে না, পা দিয়ে দিয়ে কাদা সরিয়ে পাঁকাল মাছ খুঁজছিল। কয়েকটা মাছ ধরে নেশাটা বেশ জমে গিয়েছিল ওর। হাঁড়িয়া খেয়েছে আজ সন্ধ্যে থেকে। হঠাৎ একটা লম্বা মোটা জিনিসকে চলতে দেখে মাছ ভেবে কোমরে হাত দিতেই ঘুরে দাঁড়িয়ে সেটা ছোবল মেরেছে হাতে। নেশার ঘোরে ওর কোমর ছাড়েনি বংশী। সাপটা দু'তিনটে ছোবল মারার পর খেয়াল হতেই চিৎকার করে কেঁদে উঠেছে। ততক্ষণে সাপটা অন্ধকারে লুকিয়ে পড়েছে ছাড়া পেয়ে। এখন কেউ বলছে সাপটা নিশ্চয়ই জলঢোঁড়া, বিষফিষ নেই। কেই বলছে, ছোবল মেরেছে যখন তখন নিশ্চয়ই গোখরো। বংশী বলছে, সাপটার রঙ ছিল কুচকুচে কালো। তা নেশার চোখ বলে কথাটা কেউ ধরছে না। হাতে দু'তিনটে দড়ি বাঁধা হয়ে গেছে। হাঁটতে পারছে না বংশী। ডাক্তারবাবুকে আনতে লোক গেছে কোয়ার্টারে।

ব্যাপারটা শুনে পিসীমা বললেন, 'জয়গুরু।' বলে অনির চিবুকে হাতে দিয়ে চুমু খেয়ে নিলেন, 'তখন বলেছিলাম নদীতে নিয়ে যাস না ঝাড়ি, যদি এই ছেলের কিছু হতো—তুমি কালই সোয়া পাঁচ আনার পূজো দিয়ে দিও মাধুরী।'

এমন সময় জুতোর আওয়াজ উঠল ভিতরের ঘরে। ঝাড়িকাকু সুড়ুৎ করে রান্নাঘরে চলে গেল। মা হাত বাড়িয়ে মাথার ঘোমটা টেনে দিলেন। সরিৎশেখর এসে বারান্দায় দাঁড়ালেন। বাড়িতে বিদ্যাসাগরী চটি পরেন, আওয়াজ হয়। অনিকে বললেন, 'হ্যাঁ রে, ভবানী মাস্টার এসেছিল একটু আগে, কাল তোর স্কুলে পরীক্ষা?'

পিসীমা বললেন, 'ও তো আর ওই স্কুলে পড়ছে না, পরীক্ষা দিয়ে কি হবে!'

সরিৎশেখর বললেন, 'তা হোক, কাল পরীক্ষা দিতে যাবে ও।' বলে আর দাঁড়ালেন না।

এই সময় কান্নার রোল উঠল নদীর ধারে। অনিকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে পিসীমা বললেন, 'কালই পাঁচসিকের পূজো দিও মাধুরী।'

শেষ পর্যন্ত রাত্তিবেলায় বৃষ্টি নামল।

খানিক আগেই ওদের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গিয়েছে। দাদুর সঙ্গে বসে খাওয়া অনির অভ্যেস। খেতে খেতে দাদু বলেছিলেন, 'আজ ঢালবে, তোমরা তাড়াতাড়ি কাজকর্ম চুকিয়ে নাও।' দাদুর খাওয়ার সময় হাতপাখা নিয়ে পিসীমা সামনে বসে থাকেন। গরমকালে তো বটেই, শীতকালেও এ রকমটা দেখেছে অনি। হাতপাখা ছাড়া দাদুর খাওয়ার সময় পিসীমার বসা মানায় না। কাজ-করা উঁচু চওড়া পিঁড়িতে বসে সরিৎশেখর খান, পাসেই ছোট মাপের পিঁড়িতে অনি। আজ বাইরের হাওয়ার জন্য জানলা-দরজা বন্ধ। কাঁচের জানলা দিয়ে হঠাৎ চমকানো বিদ্যুতের আলো ঘরে এল। মা মাথায় ঘোমটা দিয়ে খাবার দিচ্ছিলেন।

পিসীমা বললেন, "বংশীটা মরে গেল।'

আমসত্ত্ব দুধে মাখতে মাখতে সরিৎশেখর বললেন, 'দুধটা আজ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে—কতবার বলেছি ঠাণ্ডা দুধ দেবে না।'

মা তাড়াতাড়ি একবাটি গরম দুধ নিয়ে এসে বললেন, 'একটু ঢেলে দেব বড়দি!'

পিসীমা বললেন, 'দাও।'

সরিৎশেখর বিরাট জামবাটিটা এগিয়ে দিয়ে খানিকটা দুধ নিলেন, নিয়ে বললেন, 'কে বংশী?'

"লাইনের বংশী। আগে জল এনে দিত আমাদের।'

'কি হয়েছিল?'

'মাছ ধরতে গিয়ে লতায় কেটেছে।'

www.MurchOna.com

কথাটা শুনে সরিৎশেখর চট করে অনির দিকে তাকালেন, তারপর জানলা দিয়ে বাইরের দিকে। বাইরে তখন ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আলোয় আলোয় ঝলসে যাচ্ছে গাছপালা। সেই দিকে চোখ রেখে সরিৎশেখর বললেন, 'বড় ভাল মাংস কাটতো লোকটা, এক কোপে মাথা নামিয়ে দিত।'

কথাটা শুনে চট করে একটা কথা মনে পড়ে গেল অনির। সরিৎশেখর আজকাল আর মাংস খান না। বাড়িতে মাংস এলে আলাদা রান্না হয়। একদিন পিসীমা দাদুর মাংস খাওয়ার গল্প করছিলেন। যৌবনে তিন সের মাংস একাই খেতেন উনি। মা বলেছিলেন, 'তিন সের?'

পিসীমা হাত নেড়ে বলেছেন, 'হবে না কেন? নদীর ধারে গাছে ঝুলিয়ে বংশী পাঁঠা কাটতো। তারপর সেই মাংসের অর্ধেক বাড়িতে রেখে বাকিটা অন্য বাবুদের বাড়ি বাবা দিয়ে দিতেন। আমাদের বাড়িতে খাওয়ার লোক তেমন ছিল না। মহী ছুটিতে বাড়ি এলে ওকে ধরলে চার-পাঁচজন। বাবাই অর্ধেক খেতেন।'

মা হেসে বললেন, 'একটা অর্ধেক পাঁঠার মাংস কি করে তিন সের হয় বড়দি?'

অনিও হেসে ফেললো। পিসীমা নাকি হিসেব রাখতে পারে না—দাদু বলেন। সেই বাবা মাংস ছেড়ে দিল একদিন,' পিসীমা বললেন, 'ভীষণ পাষাণ লোক ছিলেন বাবা। এখন কি দেখছিস, একদিন এমন জোরে বকেছিলেন যে ঝাড়ি প্যান্টে হিসি করে ফেলেছিল। গমগম করতো গলা। তখন শাক-সবজির ক্ষেতে অন্য লোকের গরু-ছাগল ঢুকলে বাবা রেগে কাঁই হয়ে যেতেন। পাঁঠা ঢুকলে বাবা ঝাড়িকে বলতেন সেটাকে ধরতে। ধরা হয়ে গেলে আমার কাছ থেকে সরষে চেয়ে নিয়ে বাবা সেটার কানের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতেন। যন্ত্রণায় মনে যেতো জীবটা। তখন যার পাঁঠা তাকে বলা হতো দোষ করেছে তাই শাস্তি দিয়েছি। বাবাকে ভয় পেত সবাই, কিছু বলতো না। বংশী এসে সেই পাঁঠার মাংস কেটে বাড়ি বাড়ি দিয়ে আসতো। যার পাঁঠা তার বাড়িও বাদ যেতো না। শেষ পর্যন্ত আমি আর সরষে দিতাম না, পাপের ভাগী হবে কে? এর মধ্যে হয়েছে কি, বাগানে কে এক সন্ন্যাসী এসেছে, বাবা দেখতে গিয়ে নমস্কার করলেন। সন্ন্যাসী মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'তোর তো বহুদিন প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে দেখছি।'

বাবা বললেন, 'কেন, কি জন্যে?'

সন্ন্যাসী হাত নেড়ে বলেছিলেন, 'তোর গায়ে খুনীর গন্ধ।'

চুপ করে ফিরে এসেছিলেন বাবা। আর ছাগল ধরতেন না, মাংস খাওয়া ছেড়ে দিলেন শেষ পর্যন্ত। তাও ছাড়া কি—একদিন খেতে বসেছেন, মাংস দেওয়া হয়েছে। একটু দিয়েই টান দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। চিৎকার করে বললেন, 'মাংস রেঁধেছে না বোষ্টমী করেছে। না হয়েছে নুন না ঝাল। আর আমাকে মাংস দেবার কষ্ট তোদের করতে হবে না।' আমি তো ভয়ে ভয়ে মহীকে বললাম, 'খেয়ে দ্যাখ তো।' মহী বলল, 'কই, খারাপ হয়নি তো। আসলে একটা বাহানা দরকার তো, সন্ন্যাসীর কথায় ছেড়ে দিলে লোকে বলবে কি!'

এখন দাদুর শরীরের দিকে তাকালে অনির মনেই হয় না এসব হতে পারে। একমাথা পাকা চুল, ঠোঁটের দুপাশে ঝুলে থাকা সাদা গোঁফ, বিরাট বুকে মেদ কিছুটা ঝুলে পড়েছে, বাঁ হাতে সোনার তাগা আর হাঁটু অবধি ধুতি পরা এই লম্বা-চওড়া মানুষটাকে অনির বড় ভাল লাগে। দাদুর সঙ্গে রোজ শোয় ও। ছেলেবেলা থেকেই। আর শুয়ে শুয়ে যত গল্প। পিসিমা বলেন, 'শুয়ে শুয়ে ও পুটুস পুটুস করে বাবাকে সব লাগায়।' আসলে দাদু যখন রোজ জিজ্ঞাসা করেন, 'আজ কি হলো বল!' তখন কোন্ কথাটা বাদ দেবে বুঝতে না পেরে সব বলে ফেলে অনি।

আজ রাত্রে দাদুর ঘর থেকে নিজের বালিশ নিয়ে এল ও, তারপর সোজা মায়ের বিছানায় শুয়ে পড়ল। মহীতোষ খানিক আগে ক্লাব বন্ধ করে ফিরেছেন। রোজ দশটা অবধি ক্লাব চলে, আজ বৃষ্টির জন্য একটু আগেই ভেঙে গেছে। শুয়ে শুয়ে অনি দাদুর গলা শুনতে পেল, ওকেই ডাকছেন। উঠে এল ও, দরজায় দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'আমি মায়ের কাছে শোব।' বিছানায় বাবু হয়ে বসে সরিৎশেখর ওকে দেখলেন, তরপর হেসে ঘাড় নাড়লেন। আর এই সময় ঝমঝম করে বৃষ্টি নেমে গেল। বাড়ির টিনের ছাদে যেন অজস্র পাথর পড়ছে, কানে তালা লেগে যাবার যোগাড়। অনি একছুটে মায়ের ঘরে ফিরে এল। বিছানায় শুয়ে বালিশে মুখ চেপে ও বৃষ্টির শব্দ শুনতে লাগল। মাঝে মাঝে শব্দ করে বাজ পড়ছে। মাথার পাশে কাঁচের জানলা দিয়ে বিদ্যুতের হঠাৎ-জাগা আলোয় পাশের সবজি ক্ষেত সাদা হয়ে

www.MurchOna.com

যাচ্ছে, সেই এক পলকের আলোয় বৃষ্টির ধারাগুলো কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। সবজি ক্ষেতের মধ্যে বড় পেঁপে গাছটা হিড়িম্বা রাক্ষসীর মত হাত পা নাড়ছে হাওয়ার ঝাপটে। ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল অনি। তারপর কখন কেমন করে জলের শব্দ শুনতে শুনতে ও ঘুমিয়ে পড়েছিল বুঝতে পারেনি।

মহীতোষের গলা শুনতে পেয়ে ও থতমত খেয়ে গিয়েছিলো। মাধুরী ওকে ভাল করে শুইয়ে দিচ্ছিলেন বলে ঘুমটা ভেঙে গেল। ওর মনে পড়ল ও আজ মায়ের ঘরে শুয়ে আছে। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে সমান তালে। চোখ একটু খুলে অনি দেখল ঘরের কোণায় রাখা হ্যারিকেনের আলো কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাশে শোয়া মায়ের শরীর থেকে কি মিষ্টি গন্ধ আসছে, অনির খুব ইচ্ছে হচ্ছিল মাকে জড়িয়ে ধরে। ঠিক এমন সময় মহীতোষ হঠাৎ বললেন, 'ও আজ এখানে শুয়েছে যে!'

মাধুরী হাসলেন, কিছু বললেন না।

'কি ব্যাপার?' মহীতোষ আবার জিজ্ঞাসা করলেন।

'বোধ হয় মন কেমন করছে।' মাধুরী বললেন।

অনির বুক দুরুদুরু করতে লাগল। এখন যদি মহীতোষ ওকে তুলে দাদুর ঘরে পাঠিয়ে দেন, তাহলে—? বাবাকে বিচ্ছিরি লোক বলে মনে হতে লাগল অনির। ওর ইচ্ছে হল মাকে আঁকড়ে ধরে।

'ঘুমিয়েছে?' মহীতোষের চাপা গলা শুনতে পেল অনি। সঙ্গে সঙ্গে ও চোখ বন্ধ করে ফেলল। মড়ার মত পড়ে থাকল অনি। ও অনুভব করল বুকের ওপর মায়ের একটা হাত এসে পড়ল। তারপর হাতটা ক্রমশ ওর চিবুক, গাল, চোখের ওপর দিয়ে আলতো করে বুলিয়ে গেল। মা বললেন, 'হুঁ।'

'বড়দি চলে গেলে তোমার অসুবিধে হবে?' মহীতোষ বললেন।

'হুঁ, এতদিনের অভ্যেস। বাড়িটা ফাঁকা হয়ে যাবে। অনি না গেলে কি আর হতো। পরে গেলেও পারত।' একটু বিষণ্ণ গলা মাধুরীর।

'না, এখনই যাক। জলপাইগুড়িতে ভাল স্কুল আছে, নিচু ক্লাস থেকে ভরতি হলে ভিতটা ভাল হবে। আমি ভাবছি, অনি হবার সময় বড়দিই তো সব করেছিল, এবার কি হবে!' একটু চিন্তিত গলা মহীতোষের, 'তুমি কি বড়দিকে বলেছ?'

'দেরি আছে তো। এই শোন, তোমার ছোট ভাই-এর বোধ হয় কিছু গোলমাল হচ্ছে।' মাধুরী বেশ মজা-মজা করে বললেন।

'কি হল আবার?' একটু নিস্পৃহ গলা মহীতোষের।

'তুমি বাবাকে বলবে না তো?'

'ব্যাপারটা কি?'

'বড়দি আজ খুব রেগে গিয়েছিল। ঝাড়িকে জিজ্ঞাসা করেছিল বড়দি। প্রিয় নদীর ঘাটে যায়নি জল বন্ধ হবার পর। অথচ ও অন্ধকারে জঙ্গলে ছিল। ঝাড়ি বলেছে, ওর সঙ্গে একটা শাড়ি-পরা মেয়ে ছিল। বোঝ!'

'শাড়ি-পরা মেয়ে? কি যা-তা বলছ!' মহীতোষ প্রায় উঠে বসলেন।

'আঃ আস্তে কথা বলো। গুদামবাবুর মেয়ে তপু।'

'ও কুচবিহারে চলে যায়নি?'

'না।'

'এইভাবে ছেলেদের মাথা খাবে নাকি?'

'তা তোমার ভাইটি যদি মাথা বাড়িয়ে দেয়, ওর দোষ কি?'

'বাবা শুনলে বাড়ি থেকে দূর করে দেবে ওকে।'

'তুমি কিছু বলো না। যার যা ইচ্ছে করুক, আমাদের কি দরকার? গুদামবাবু শুনেছি মেয়ের বিয়ের চেষ্টা করছে, হলে ভাল।'

'তুমি তো বলে খালাস, বাবা চলে গেলে প্রিয় এখানেই থাকবে, তখন সামলাবে কে? আমার এসব ভাল লাগে না। আসলে মেয়েটাই খারাপ, মালবাবু বলছিল কুচবিহারে ও নাকি কি গোলমাল করেছে একটা ছোঁড়ার সঙ্গে। মালবাবুর বড় শালী কুচবিহারে থাকে—তাই সে-ই বলেছে। আমি প্রিয়কে বলবো সাবধান হতে।'

www.MurchOna.com

'না, তুমি কিছু বলবে না। যা করার বড়দিই করবে।'

কিছুক্ষণ অনি আর কিছু শুনতে পেল না। ও তপু পিসীর মুখটা মনে করল। খুব সুন্দর দেখতে তপুপিসী, গায়ের রঙ কি ফরসা। আজ নদীর ধারে আকন্দগাছের পাশে তাহলে তপুপিসীই ছিল? ও বুঝতে পারছিল কাকু আর তপুপিসী নিশ্চয়ই খারাপ কিছু করেছে, যেটা মহীতোষ পছন্দ করছেন না, দাদু শুনলে রেগে যাবেন। কি সেটা? কাকুকে ভাল লাগে না ওর। টানতে টানতে ওর কান কাকু লম্বা করে দিয়েছে। বাঁ কানটা। আয়নায় ছোট বড় দেখায় দুটো।

'আমি তাহলে ঘুমোলাম।' মহীতোষের গলা পেল অনি।

'হুঁ।' বলে মাধুরী অনির দিকে ফিরে শুলেন। শুয়ে এক হাতে অনির গলা জড়িয়ে ধরলেন। একটু বাদেই মহীতোষের নাক ডাকতে শুরু করল। অনির গলার কাছে মায়ের হাতের বালার মুখটা একটু চেপে বসেছিল। ধার আছে মুখটায়। ওর চিনচিন করছিল গলার কাছটা। কিন্তু তবু সিঁটিয়ে শুয়ে থাকল অনি। চোখ বন্ধ করে ও মাথার ওপর টিনের ছাদে পড়া বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে মায়ের শরীর থেকে আসা মা-মা গন্ধটার মধ্যে সাঁতার কাটতে লাগল চোরের মত। গলার ব্যথাটা কখন হারিয়ে গেল একসময় টের পেল না অনি।

পাতাবাহার গাছগুলো সার দিয়ে রাস্তার দুপাশে লাগানো, রাস্তাটা ওদের বাড়ি থেকে সোজা উঠে এসে আসাম রোডে পড়েছে। অনি দেখল বাপী আর বিশু বইপত্তর হাতে ওর জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। ওদের স্কুলে কোন য়ুনিফর্ম নেই। তবু মহীতোষ ওর জন্য সাদা শার্ট আর কালো প্যান্ট করে দিয়েছেন, অনি তাই পরে স্কুলে যায়। ওর স্কুলের অন্য ছেলেমেয়েরা যে যেমন খুশী পরে আসে। জুতো পরার চল ওদের মধ্যে নেই, অন্তত স্কুলে জুতো পরে কেউ আসে না। অনি চটি পরে যায়। মা আর পিসীমা বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন। সরিৎশেখর আর মহীতোষ অফিসে চলে গেছেন সকালে। একটু বাদেই জলখাবার খেতে আসার সময়। সরিৎশেখর আসেন না, বকু সর্দার এসে ওঁর খাবার নিয়ে যায়। বাড়ি থেকে বেরুবার আগে পিসীমা ঠাকুরঘরে ওকে নিয়ে গিয়ে প্রণাম করিয়েছেন। তারপর পূজোর বেলপাতা ওর বুকপকেটে ভাল করে রেখে দিয়েছেন। অনি আজ জীবনের প্রথম পরীক্ষা দেবে। সকালে কাকু পরীক্ষার কথা শুনে বলেছে, 'যত বুজরুকি ভবানী মাস্টারের।'

আজ সকাল থেকেই কেমন পরিষ্কার সোনালি রোদ উঠেছে। গাছের পাতা এমন কি ঘাসগুলো অবধি নতুন নতুন দেখাচ্ছে। ওরা আসাম রোড দিয়ে হাঁটতে লাগল। পি. ডব্লু. ডি-র পিচের রাস্তার দুধারে লম্বা লম্বা গাছ, যার ডালগুলো এখনও ভেজা, মাথার ওপর বেঁকে আছে। দুপরবেলায় ছায়ায় ভরে থাকে এই রাস্তা। বাঁদরলাঠি ফল এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে।

চা-বাগানের সীমানা ছাড়ালেই হাট। দু পাশে ফাঁকা মাঠের মধ্যে মাঝে মাঝে চালাঘর করা। বাঁদিকে মাছমাংসের হাট, চালও বসে, ডানদিকে শুয়োর কাটার মাঠ। আজ অবশ্য সব ফাঁকা। রবিবার সকাল থেকে গিজগিজ করতে থাকে লোক। বানারহাট ধূপগুড়ি থেকে হাট-বাস বোঝাই ব্যাপারীরা এসে হাজির হয় বড় বড় ঝুড়ি নিয়ে। একটু বেলায় আসে খদ্দেররা। তখন চোঙায় করে কলের গান বাজায় অনেকে। কি জমজমাট লাগে চারধার। ফাঁকা হাট দু পাশে রেখে ওরা ছোট্ট পুলের ওপর এল। দু পাশে রেলিং দেওয়া, নিচে প্রচণ্ড শব্দ করে আঙরাভাসা নদী বয়ে যাচ্ছে ফ্যাক্টরীর দিকে। পুলের ওপর দাঁড়িয়েই লকগেটটা দেখতে পাওয়া যায়। ওপাশে পুকুরের মত থৈ-থৈ জল দাঁড়িয়ে। গেটের তলা দিয়ে অজস্র ফেনা তুলে ছিটকে বেরিয়ে আসছে এধারের ধারা। বিশু বলল, 'একদিন স্নান করার সময় এখানে এসে নামবো আর আমাদের ঘাটে গিয়ে উঠবো।'

বাপী বলল, 'যাঃ, মরে যাবি একদম—কি স্রোত!"

বিশু কিছু বলল না, কিন্তু অনি ওর মুখ দেখে বুঝল বিশু নিশ্চয়ই এই রকম একদিন করবে। যা ডানপিটে ছেলে ও। তালগাছে উঠে বাবুইপাখির বাচ্চা ধরতে চেয়েছিল একদিন। মা ভীষণ রাগ করবে বলে অনি কোনরকমে ওকে বারণ করেছে। আরও ওর মুখের দিকে তাকিয়ে অনির চট করে হরিশের কথা মনে পড়ে গেল। গায়ের মধ্যে সিরসির করে উঠল অনির।

পুল ছাড়ালেই ভরত হাজামের দোকান। ত্রিপলের ছাউনি দেওয়া, নিচে একটা টুল পাতা। ভরত খদ্দেরকে টুলে বসিয়ে চুল ছাঁটে। ওদের বাড়িতে মাসে দুবার যায় ভরত। দাদু দুবারই চুল ছাঁটান। কাঁঠালতলায় পিঁড়ি পেতে এক এক করে বসতে হয় ওদের। একটা কাপড় আছে ভরতের যার রঙ

www.MurchOna.com

কোনকালে হয়তো সাদা ছিল, দাদু বলেন ওটাতে ছারপোকা আর উকুন গিজগিজ করছে। খালি গায়ে বসে ওরা। মহীতোষ বলেন, ব্যাটা বাটিছাঁট ছাড়া আর কিছু জানে না। বুড়ো ভরত অনিকে চুল ছাঁটার সময় মজার মজার গল্প বলে। সব সময় মাথা নিচে করে বসে থাকতে পারে না ও। নড়লেই চাঁটি মারে ভরত। সঙ্গে সঙ্গে ছড়াও কাটে, 'নাচ বুড়িয়া নাচ, কান্ধে পর নাচ।' হেসে ফেলে অনি। ছেলেবেলায় ছোট কাকাকেও চুল কেটে দিত ভরত। এখন তেমাথার মোড়ে যে নতুন 'মর্ডান আর্ট সেলুন' হয়েছে, ছোট কাকা সেখানে গিয়ে চুল ছাঁটিয়ে আসেন। কিন্তু চোখে কম দেখলেও সরিৎশেখরের ভরতকে ছাড়া চলে না। ছোটঠাকুমার বিয়ের সময় নাকি ভরত হাজাম ছিল।

এখন সেলুনটা ফাঁকা। ভরতের তিনপায়া কুকুরটা টুলের ওপর উঠে বসে আছে। দোকানে ভরত নেই। আর একটু এগোলেই ছোট ছোট কয়েকটা স্টেশনারী দোকান, বিলাসের মিষ্টির দোকানে বিরাট কড়াই-এ দুধ ফুটছে। এর পরেই রাস্তাটা গুলতির বাঁটের মত দুভাগ হয়ে গিয়েছে। ঠিক মধ্যেখানে একটা বিরাট পাথরে সম্প্রতি লেখা হয়েছে গৌহাটি, নীচে বাঁদিকে একটা তীর, ডানদিকে লেখা নাথুয়া। বাঁদিকের রাস্তাটায় আর একটু গেলে জমজমাট তিনমাথার মোড়। কত রকমের দোকানপাট, রেস্টুরেন্ট, পেট্রল পাম্প, সব সময় লোক গিজগিজ করছে। ডানদিকের রাস্তাটা ধরে এগোলেই বড় বড় কাঠের গোলা চোখে পড়ে। কাছেই একটা স-মিলে কাজ হচ্ছে। করাত-টানার শব্দ হচ্ছে একটানা। ফরেস্ট অফিস এদিকটাতেই। রেঞ্জার সাহেবের অফিসের সামনে একটা জিপ দাঁড়িয়ে আছে। ডানদিকে মিশনারীদের একটা বাগানওয়ালা বাড়ি। ওখানে মদেসিয়া ছেলেমেয়েদের অক্ষরপরিচয় হয়। রাস্তাটা বাঁক দিতেই ছোট্ট মাঠ আর মাঠের গায়ে ওদের স্কুল।

ভবানী মাস্টার স্কুলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। এক ঘরের স্কুল। বারান্দায় মাঝে মাঝে ক্লাস নেন উনি। ওদের নতুন আসা দিদিমণি ভেতরের ঘরে ক্লাস ওয়ানদের পড়ান, ঘরের আর এক পাশে বাঁ বারান্দায় ক্লাস টু-কে পড়ান ভবানী মাস্টার। নতুন দিদিমণি পি. ডব্লু. ডি. অফিসের বড়বাবুর বোন। কদিন আগে ভবানী মাস্টারের অসুখের সময় হতে উনি এসে স্কুল দেখাশুনা করছেন। ভীষণ গম্ভীর।

স্বর্গছেঁড়ার তালেবর মানুষজন সম্প্রতি নতুন একটা স্কুলবাড়ি তৈরী করছেন হিন্দুপাড়ার মাঠে। বেশ বড়সড় স্কুল। এই কদিন ওদের এই একচালাতেই ক্লাস হচ্ছে। মাইনেপত্তর কোন ছাত্রকে দিতে হয় না। ক্লাব থেকে চাঁদা তুলে ভবানী মাস্টারের মাইনে দেওয়া হয়। নতুন দিদিমণি এখনো মাইনে নেন না।

আসলে এই ঘরটা বারোয়ারী পুজোর জন্যে বানানো হয়েছিল। দরজাটা তাই বেশ বড়। দুর্গাপুজোর খ্যাতি আছে স্বর্গছেঁড়ার। পুজোর একপক্ষ আগে থেকে স্কুল বন্ধ হয়ে যায়। বুড়ো হারাণ ঘোষ তাঁর দুই ছেলেকে নিয়ে এসে যান ঠাকুর গড়তে। সেই থেকে উৎসব লেগে যায় স্বর্গছেঁড়ায়। ভবানী মাস্টার তখন চলে যান দেশে। বাংলাদেশে। মাঝে মাঝে ওঁর কথা বুঝতে পারে না অনি। কথা না শুনলে চুল ধরে মাথা নামিয়ে পিঠের ওপর শব্দ করে যখন কিল মারেন ভবানী মাস্টার তখন বিড়বিড় করে নিজের ভাষায় কি বলেন কিছুতেই বুঝতে পারে না অনি। তবে অনি কোনদিন মারটার খায়নি। দাদু বলেন উনি ময়মনসিংহ না কি জেলার লোক। ভীষণ রাগী লোক।

ভবানী মাস্টার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওদের দেখলেন। তারপর ওরা কাছে যেতে বিশুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বেড়াতে যাও বুঝি, বেশ বেশ, তা এবার ভিতরে গিয়ে আমাকে উদ্ধার করো বাবা সব।' ঘরে ঢুকে অনির মনে হল আজ সবাই কেমন যেন আলাদা, অনেকের কপালে দই-এর টিপ। ভবানী মাস্টার আজ ক্লাস ওয়ান আর টু-দের পাশাপাশি বসতে বললেন। লম্বা লম্বা ডেস্কের সঙ্গে বেঞ্চি। সামনে একটা ব্ল্যাকবোর্ড। ব্ল্যাকবোর্ডে এক দুই করে প্রশ্ন লেখা। বাঁদিকে ক্লাস ওয়ানের জন্য, ডানদিকে ক্লাস টু। আজকে ভবানী মাস্টারের গলা ভীষণ ভারী এবং রাগী লাগছিল। সবাইকে বলে দিলেন, যে একটা কথা বলবে তাকে ইঁট মাথায় করে তেমাথা অবধি দৌড়ে ঘুরে আসতে হবে।

এমন সময় নতুন দিদিমণি স্কুলে এলেন। সাদা শাড়ি জামা, নাকের ডগায় তিল থাকায় সব সময় মনে হয় কিছু উড়ে এসে ওখানে বসেছে। দিদিমণি এসে প্রথমে রোলকল করলেন। তারপর ভবানী মাস্টারের কাছে গিয়ে ফিসফিস করে কি বললেন। ভবানী মাস্টারের মুখটা কেমন মজার-মজার হয়ে গেল। ঘাড় নেড়ে কি যেন বলে ওদের দিকে তাকালেন, 'এখন তোমরা দিদিমণির কাছে গান করবে। একটার পর পরীক্ষা।' বলে বাইরের বারান্দায় চলে গেলেন।

www.MurchOna.com

গানের কথা শুনে সবাই গুনগুন করে উঠল। গোপামাসী বসেছিলেন অনির পাশে। অনেক বড় গোপামাসী। স্কুলে শাড়ি পরে আসতে পারে না বলে ফ্রক পরে। অনিকে গোপামাসী বলল, 'গান গাইতে আমার খুব ভাল লাগে। দেখিস গানের পরীক্ষা নেবে। তুই পারবি?'

ঘাড় নাড়ল অনি, 'না।'

'এমন কি আর, শুধু জোরে জোরে সুর করে বলবি, সে হয়ে যাবে'খন। আমি তো হাটের দিনে গান শুনে শুনে শিখে গিয়েছি।' কথা বলতে বলতে চুপ করে গেল গোপামাসী। দিদিমণি ওর দিক তাকিয়ে আছেন একদৃষ্টে। তারপর একটু গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন উনি, 'আর কদিন বাদেই, তোমরা হয়তো জানো, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দিবস। জানো তো?'

'হ্যাঁ দিদিমণি।' পুরো ঘরটা একসঙ্গে চীৎকার করে উঠল।

'স্বাধীনতা মানে আমরা আর পরাধীন থাকবো না। ইংরেজদের হুকুম আমদের মানতে হবে না। আমরাই আমাদের রাজা। দিদিমণি হাত নেড়ে বললেন, 'এখন সেই দিনটি হল পনেরই আগস্ট। এই পনেরই আগস্ট হবে উৎসবের দিন। আমরা স্কুলের সামনে আমাদের জাতীয় পতাকা তুলবো। শহর থেকে একজন গণ্যমান্য লোক আসবেন তোমাদের কিছু বলতে। তখন তোমরা সবাই মিলে একটা গান গাইবে। আমাদের হাতে সময় আছে মাত্র পাঁচ দিন। এর মধ্যে তোমরা গানটা মুখস্থ করে নেবে। প্রথম আমি গাইছি তোমরা শোন।' দিদিমণি এবার সবার দিকে তাকিয়ে নিলেন। একসঙ্গে অনেক কথা বলায় ওঁর নাকের ডগায় তিলের ওপর একটু ঘাম জমতে দেখল অনি। আঁচল দিয়ে সেটা মুছে নিলেন উনি। তারপর একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে হাতের বইটা সামনে খুলে ধরে খুব নরম গলায় গাইতে লাগলেন, 'ধনধান্য পুষ্পভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা...।'

সমস্ত ঘর চুপচাপ, গান গাইছেন গম্ভীর-দিদিমণি। এত সুন্দর যে উনি গাইতে পারেন অনি তা জানতো না। সকলে কেমন মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে, এমন কি গোপামাসীও। এক-একটা লাইন ঘুরে ফিরে গাইছেন উনি, কি সুন্দর লাগছে। একসময় অনি গানের মধ্যে ঢুকে পড়ল। তারপর সেই দিদিমণি কেমন করুণ করে গাইলেন—'ও মা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি,' তখন হঠাৎ অনির শরীরটা থরথর করে কেঁপে উঠল, ওর হাতের লোমকূপগুলো কাঁটা হয়ে উঠল, এই মুহূর্তে মা কাছে থাকলে অনি তাকে জড়িয়ে ধরে বুকে মুখ রাখতো।

দিদি তখনও গেয়ে যাচ্ছেন, অনির শরীর অবশ হয়ে যাচ্ছিল। ও জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। স্কুলের পেছনের রাস্তাটা চলে গেছে খুঁটিমারীর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে নাথুয়ার দিকে। বেশ চনমনে রোদ উঠেছে। রাস্তাটা তাই ফাঁকা। সামনের বকুলগাছটায় একটা লেজঝোলা পাখি ঘাড় ঘুড়িয়ে ডাকছে। তার লেজের হলদে নীল লম্বা পালকে রোদ পড়ে চকমক করছে। পাশেই একটা লম্বা ইউক্যালিপটাস গাছ। ওরা বলে সাহেবগাছ। সাহেবগাছের একদম ওপরডালে মৌচাক বেঁধেছে মৌমাছিরা। গাছের তলায় গেলেই শব্দ শোনা যায়। ওরা কি ফুলের ওপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে? বিশু বলে, মৌচাকের মধ্যে মধু জমা আছে। গুলতি দিয়ে একদিন ভাঙবে ও মৌচাকটাকে। দিনের বেলা বলে ও পারছে না, চাক ভেঙে দিলে মৌমাছিরা নাকি ছেড়ে দেবে না। ভীষণ হুল। অনির কোন ভাই নেই, গানটায় ভাই-এ ভাই-এ এত স্নেহ বলেছেন দিদিমণি। আচ্ছা ওর ভাই নেই কেন? পিসীমা গল্প করার সময় বলেন, তুই যেমন মায়ের পেটে এসেছিলি—তেমনি একটা ভাই তো মায়ের পেটে আসতে পারে। তিনি দেখল রেতিয়া সামনের রাস্তাটা দিয়ে যাচ্ছে। ওদের চেয়ে বয়সে বড়, এক নম্বর লাইনের মদেসিয়া ছেলে। ও চোখে দেখতে পায় না। অথচ পা দিয়ে দিয়ে রাস্তা বুঝে রোজ বাজারে চলে আসে। বাজারে গিয়ে মতি সিংয়ের চায়ের দোকানের সামনে পাতা বেঞ্চিতে চুপ করে বসে থাকে। মতি সিং ওকে রোজ চা খাওয়ায়। সারা মুখে বসন্তের দাগ, ছেলেটা খোঁড়াতে খোঁড়াতে যাচ্ছে। হঠাৎ অনির খুব দুঃখ হল ওর জন্য। দিদিমণি যে এমন মন-কেমন-করা গান গাইছে বেচারা শুনতে পেল না। অথচ ওর খুব বুদ্ধি। এখন যদি অনি ছুটে ওর কাছে যায়, গিয়ে জিজ্ঞাসা করে, এই বল তো আমি কে, সঙ্গে সঙ্গে রেতিয়া মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাবে, ওর বসন্তের দাগওয়ালা কপালে ভাঁজ পড়বে, দুটো সাদা চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইবে, তারপর হঠাৎ সব সহজ হয়ে গিয়ে ওর হলদে ছাতা লাগা দাঁতগুলোয় শিউলি ফুলের বোঁটার মত হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠবে, ও মুখ নিচু করে বলবে, 'অনি।'

www.MurchOna.com

একসময় গান শেষ হয়ে গেল। এত সুন্দর গান এমন কথা অনি শোনেনি আগে। ও দেখল, ভবানী মাস্টার দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন। বোঝাই যাচ্ছে উনি গান শুনছিলেন, তাই ওঁর মুখটা অন্য রকম দেখাচ্ছিল। এর পর দিদিমণি ওদের গানটা শেখাতে আরম্ভ করলেন। গোপামাসীর গলা সবার ওপরে। এমনিতে অনি কোনদিন সবার সামনে গান গায়নি। কিন্তু আস্তে আস্তে ওর গলা খুলতে লাগল। গানের লাইনগুলোর সব মানে বুঝতে পারছিল না, এই যা।

কেমন ঘোরের মধ্যে সময়টা কেটে গেল। এক সময় দিদিমণি থামলেন। এখন টিফিন। অনি টিফিনের সময় কিছু খায় না। কেউই খায় না। দুটোয় ছুটি। বাড়ি ফিরে পিসীমার আলোচালের ভাত সুন্দর নিরামিষ তরকারি দিয়ে একসঙ্গে বসে খায়। এতক্ষণে ওর নজর পড়ল সামনের বোর্ডের দিকে। ভবানী মাস্টার প্রশ্নগুলো লিখে রেখেছেন। ও প্রশ্নগুলো পড়বার চেষ্টা করল। এখন ঘর ফাঁকা। সবাই বাইরের মাঠে রোদ্দুরে হইহই করছে। স-মিলের করাতের শব্দ এখানে আসছে। একটা কাঠঠোকরা পাখি সামনের সাহেবগাছে বসে একটানা শব্দ করে যাচ্ছে।

অনি দেখল গোপামাসী বাইরে থেকে ফিরে এল। এসে ওর পাশে বসল, 'কেমন গাইলাম রে!'

অনি হাসল। সবাই মিলে একসঙ্গে গান করেছে অথচ গোপামাসী এমন ভাব করছে যেন একাই গেয়েছে।

'আমি বড় হলে খুব বড় গায়িকা হব, জানিস, কাননবালা।'

কথাটা বলে চোখ বন্ধ করল গোপামাসী। গোপামাসী তো বড়ই হয়ে গিয়েছে। শুধু শাড়ি পরে না—এই যা।

'তুই নাকি চলে যাবি এখান থেকে?' হঠাৎ গোপামাসী বলল।

'হুঁ।'

'আর আসবি না?'

'আসবো তো। ছুটি হলেই আসবো।'

'আমার সঙ্গে দেখা করবি তো?'

'বাঃ, কেন করবো না!'

ঘাড় নিচু করে গোপামাসী বলল, 'তোরা ছেলেরা কেমন টুকটুক করে চলে যাস। আমি দ্যাখ এই এক ক্লাসে সারাজীবন পড়ে থাকলাম। পাস করলেও কি হবে, আমার তো পড়া হবে না আর।'

'নতুন স্কুল হচ্ছে, সেখানে পড়বে।' অনি বলল।

ঠোঁট ওল্টালে গোপামাসী, 'মা পড়তে দেবে না। ছোঁড়া ছোঁড়া মাস্টার আসবে যে সব। অথচ দ্যাখ ক্লাস ওয়ানের পরীক্ষা একেবারে আমি পাস করে গেছি।' হঠাৎ ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে গোপামাসী বলল, 'দাঁড়া, তোর খাতাটা দে দেখি।'

কিছু বুঝতে না পেরে অনি নতুন খাতাটা এগিয়ে দিল। গোপামাসী বলল, 'আমি তো ফেল করবোই। পাস করলে তো মা বাড়ি থেকে বেরুতে দেবে না। আমি তোর পরীক্ষার উত্তর লিখে দিচ্ছি। তুই চুপ করে বসে থাক।'

অনির খুব মজা লাগল। বোর্ডের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নগুলো দেখে গোপামাসী ওর খাতায় উত্তর লিখছে। এইসব প্রশ্নের উত্তর ও জানে, কিন্তু সেগুলো লেখার হাত থেকে বেঁচে যাচ্ছে বলে ওর আনন্দ হচ্ছিল। গোপামাসী লিখছে—ও জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল আবার। ওভারসিয়ারবাবু সাইকেলে চেপে আসছেন ঠা-ঠা রোদ্দুরে খুঁটিমারীর দিক থেকে। মাথায় সোলার হ্যাট। খাকি হাফপ্যান্টের নিচে ইয়া মোটা মোটা পা। পাছা দু'টো সিটের পাশে ঝুলে পড়েছে। দু হাতে সামনের হ্যাণ্ডেলে শরীরের ভর রেখে চোখ বন্ধ করেই বুঝি চালাচ্ছেন। চোখ এত ছোট আর মুখটা এত ফোলা যে বোঝা যায় না তাকিয়ে আছেন না ঘুমোচ্ছেন। হঠাৎ একটা প্রচণ্ড শব্দ হতেই চমকে উঠল অনি। একটা মোটা পা আকাশে তুলে অন্যটায় নিজেকে কোন রকমে সামলাচ্ছেন ওভারসিয়ারবাবু মাটিতে ভার দিয়ে। পেছনের চাকা চুপসে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে হইহই শব্দ উঠল। মাঠে যারা খেলছিল তারা ব্যাপারটা দেখেছে। ভবানী মাস্টারের গলা শোনা গেল, অবোধ্য ভাষায় গালাগাল দিচ্ছেন বোধ হয়, সবাই হুড়মুড় করে ঘরে ফিরে এল। বিশু ছড়া কাটছিলো, 'ওভারবাবুর চাকা, চলতে গেলেই বেঁকা।'

www.MurchOna.com

চোরের মতন খাতাটা দিয়ে দিল গোপামাসী, 'নে, শুধু একটা পারলাম না। যা শক্ত। এতেই পাশ করে যাবি।'

খাতাটা খুলে দেখল অনি। খুব সুন্দর হাতের লেখা গোপামাসীর। খাতার ওপরে ওর নাম লিখে দিয়েছে।

পরীক্ষা আরম্ভ হয়ে গেল। গোপামাসী কি সব লিখছে নিজের খাতায়। লেখার ভঙ্গীতে অনি বুঝল, মন নেই। ভবানী মাস্টার একটা লম্বা বেত হাতে নিয়ে মাঝখানে বসে। সবাই মুখ নিচু করে লিখছে। ভবানী মাস্টার অনিকে দেখলেন, 'কি অনিমেষ, লিখ লিখ।'

পাশ থেকে গোপামাসীর চাপা গলা শুনতে পেল অনি, 'আরে বোকা, ছবি আঁক না পেছন পাতায়। চুপ করে বসে থাকলে ধরা পড়ে যাবি না!'

এতক্ষণে অনির ভয়-ভয় করতে লাগল। ও বুঝতে পারল ব্যাপারটা অন্যায় হয়ে গিয়েছে। আস্তে আস্তে খাতা খুলে ও পেছনের পাতায় চলে এলো। তার পর মাথা ঝুঁকিয়ে পেন্সিলে একটা গোল দাগ আঁকল। তার মধ্যে আরো দুটো গোল, গোলের মধ্যে গোল। তারপর হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়াতে গোপামাসী যে উত্তরটা শক্ত বলেছিল সেটা চট করে লিখে ফেলল।

একসময় সময়টা শেষ হয়ে গেল। পরীক্ষা শেষ। সকলে এক এক করে খাতা জমা দিয়ে গেল। অনি কাছে দাঁড়াতেই ওর হাত থেকে খাতা নিলেন ভবানী মাস্টার, 'সব উত্তর দিয়েছ?'

ঘাড় নাড়তে গিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো অনি। ওর কেমন সিরসির করতে লাগল। ভবানী মাস্টারের ভাঙাচোরা মুখের দিকে তাকিয়ে ওর মনে দাদুর মুখটা ভেসে উঠল। ঘাড় নাড়ল ও, 'না।'

'কোনটা পার নাই?'

হঠাৎ অনির ঠোঁট কাঁপতে লাগল। ভবানী মাস্টার একদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে আছেন। ঘর প্রায় ফাঁকা। সবাই চলে যাচ্ছে। দরজায় বিশু আর বাপী দাঁড়িয়ে, ওরা অনির জন্যে অপেক্ষা করছে। গোপামাসী নেই। মাটির দিকে মুখ নামাল অনি। ওর চিবুক থরথর করছিল। দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল শেষ পর্যন্ত।

'কি হল—কাঁদো কেন?' ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ভবানী মাস্টার।

'আমি লিখিনি—' কান্না-জড়ানো গলায় বলল অনি।

এক হাতে ওকে জড়িয়ে কাছে আনলেন ভবানী মাস্টার, 'কি লিখ নাই?'

'গোপামাসী নিজে থেকে লিখে দিয়েছে। আমি লিখতে বলিনি।' জোরে কেঁদে উঠল ও।

ডান হাতে খাতাটা খুললেন ভবানী মাস্টার। উত্তরগুলো দেখলেন। মুহূর্তে ওঁর কপালের রগ দুটো নাচতে লাগল। তারপর অনির দিকে তাকালেন, 'তুমি এগুলান দেখছ?'

ঘাড় নাড়ল অনি, 'না।'

'বাঃ ভাল। এখন চোখ থিকা জল মোছ। গোপাটার মাথায় গোবর থাকলে সার হোত, তাও নেই। ও যা ভুল করছে তুমি তা শুদ্ধ করো। বসো।' কথাটা বলে অনির হাত ধরে সামনে বসিয়ে দিলেন উনি। তারপর দরজার দিকে তাকিয়ে বিশুদের দেখতে পেয়ে ধমক দিলেন, 'এই তোরা বাগানে থাকিস না। আয় বস, ঐ কোণায় বস। একসঙ্গে যাবি।'

অনি দেখল বিশু আর বাপী সুড়সুড় করে ভিতরে এসে বসল। ওদের দিকে না তাকিয়ে খাতাটা খুলল অনি। একটু পড়তেই ও দেখল একটা যোগ একদম ভুল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ও সেটা ঠিক করল।

শেষ পর্যন্ত ভুল ঠিক করা হয়ে গেলে ও খাতাটা মাস্টারের হাতে দিল। চটপট দেখে নিলেন উনি। দেখে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'বাঃ, ফার্স্ট ক্লাস।'

তারপর অনির দিকে ফিরে ওকে দু হাতে জড়িয়ে ধরলেন উনি। অনি বুঝতে পারছিল না ও কি করবে। ওঁর শরীর থেকে আসা ঘামের গন্ধে, নস্যির গন্ধে অনির কষ্ট হচ্ছিল। ভবানী মাস্টার ওর মাথায় হাত বুলিয়ে ফিস ফিস করে বললেন, 'একটা কথা মনে রাখবা বাবা, নিজের কাছে সৎ থাকলে জীবনে কোন দুঃখই দুঃখ হয় না। তুমি অনেক বড় হবা একদিন, কিন্তু সৎ থাকবা, আমাকে কথা দাও।'

কথাগুলো শুনতে শুনতে অনি আবার কেঁদে ফেলল। তারপর ঐ নস্যির গন্ধ, ঘামের গন্ধ মাখা বুকে মাথা রেখে ও কান্না জড়ানো গলায় কি বলে থরথর করে কাঁপতে লাগল।

www.MurchOna.com

স্কুলের মাঠে বিকেলে ফুটবল খেলা হয় কিন্তু অনিদের সেখানে যাওয়া হয় না। ওদের কোয়ার্টার থেকে স্কুলের ফুটবল মাঠ অনেক দূর। তাছাড়া গেলেই যে খেলতে পাবে এমন নয়। একদিন অনিরা গিয়ে দেখেছিল তাদের বয়সী কেউ খেলছে না। হাফ প্যান্ট বা ধুতি গুটিয়ে পরে বড় বড় মানুষ হইহই করে ফুটবল খেলছে ওখানে। তাদের বিশাল বিশাল লোমশ পা দেখে ওরা ভয়ে ফিরে এসেছিল। বাগানের কোয়ার্টারের সামনে অঢেল খোলা জমি। মাঝে মাঝে উঁচু নিচু অবশ্য, তা ছাড়া দুটো কাঁঠালচাঁপার গাছ শক্ত হয়ে বসে আছে মধ্যিখানে—তাও খেলাটেলা যেত কিন্তু মুশকিল হল ওদের বয়সী ছেলে এই কোয়ার্টারগুলোতে বেশী নেই। অনিদের বাতাবিলেবু গাছ থেকে গোলগাল একটা লেবু নিয়ে ওরা মাঝে মাঝে খেলে কিন্তু সেটা ঠিক জমে না।

অনিরা বাড়ির সামনের মাঠে গোল হয়ে বসে ধনধান্য পুষ্পভরা গাইছিল। মোটামুটি কথাগুলো এখন মুখস্থ হয়ে গেছে। গান করে গাইলে যে কোন কবিতা চট করে মুখস্থ হয়ে যায়। হঠাৎ ওরা শুনলো গোঁ গোঁ করে শব্দ উঠছে সামনের রাস্তায়। সাধারণত যেসব লরি বা বাস এই রাস্তায় রোজ চলাচল করে এ শব্দ তার থেকে আলাদা। কি গম্ভীর, যেন সমস্ত পৃথিবী কাঁপিয়ে শব্দটা গড়াতে গড়াতে আসছে। খানেক বাদেই ওরা দেখতে পেল ত্রিপলে মোড়া ভারী ভারী মিলিটারি ট্রাক একের পর এক ছুটে আসছে। মুখ-থ্যাবড়া গাড়িগুলো দেখতে বীভৎস, অনেকটা ক্ষেপে যাওয়া বুলডগের মত। প্রত্যেকটি গাড়ির নাকের ডগায় সরু লোহার সিক লিকলিক করছে। ট্রাকগুলো থেকে বেখাপ্পা মত কিছু বাইরে বেরিয়ে আছে, তবে সেগুলোর ওপর ভাল করে ত্রিপল ঢাকা। তারপরই ওরা দেখতে পেল লরিভর্তি কালো কালো বিকট চেহারার মিলিটারির দল। ট্রাকে বসে হইহই করে চিৎকার করছে। এই ধরনের চেহারার মানুষ ওরা কখনও দেখেনি। এত দূর থেকেও ওদের সাদা দাঁত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

হঠাৎ বিশু 'ওরে বাবা গো' বলে চোঁ চোঁ দৌড় দিল নিজের বাড়ির দিকে। ওর দেখাদেখি বাপীও ছুটল। মিলিটারি ট্রাক দেখলে কেউ বাড়ির বাইরে যাবে না—এরকম একটা আদেশ ছোটদের জন্যে দেওয়া আছে। কিন্তু কি করে অনিরা বুঝবে কখন ওরা আসবে! দৌড়তে গিয়ে অনি টের পেল ওর দুটো পা যেন জমে গেছে। পা ঝিনঝিন শুরু হয়ে গেল হঠাৎ। গলার কাছটায়, টনসিলের ব্যথাটাই বোধ হয়, কেমন করে উঠল। ছুটন্ত গাড়িগুলো দেখতে দেখতে ও নিজের অজান্তে ধনধান্য পুষ্পভরা ফিসফিস করে গাইতে লাগল। আর গাইতে গাইতে ওর শরীরের সিরসিরানিটার কমে যাওয়া টের পেল। অনি অবাক হয়ে দেখল একটা গাড়ি ঠিক ওদের বাড়ির সামনে ব্রেক কষে থেমে গেছে। গাড়িটা থামতেই একটা লোক লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে এল। এত লম্বা লোক অনিক কোনদিন দেখেনি, দু নম্বর লাইনের ভেটুয়া সর্দারের চেয়েও লম্বা। আর তেমনি মোটা। এদিক ওদিক মুখ ঘুরিয়ে জায়গাটা দেখে নিল লোকটা, তারপর অনিকে লক্ষ্য করে হন হন করে এগিয়ে আসতে লাগল। অনি দেখল লোকটার পিঠের পেছন থেকে ফাৎনার ডগার মত একটা কালো নল উঁকি মারছে আর একটা কিছু স্ট্র্যাপে লোকটার হাতে দোল খাচ্ছে হাঁটার তালে। ভয়ে সিঁটকে গিয়ে অনি প্রায় কান্নার সুরে ধনধান্য পুষ্পভরা বিড়বিড় করে যেতে লাগল বারংবার।

'ওয়াতার, ওয়াতার, পানি!'

অনি চোখ খুলে দেখল সামনে একটা ওয়াটার বট্‌ল ঝুলছে আর তার পেছনে পাহাড়ের মত উঁচু একটা লোক যার গায়ের রঙ মিশমিশে কালো। লোকটা হাসছে, কি সাদা দাঁতগুলো! লোকটা ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আবার বলল, 'ওয়াতার, প্লিজ!' জল চাইছে লোকটা, অনি পা দুটোয় ক্রমশ সাড় ফিরে পেল। ও তাকিয়ে দেখল পেছনের সব কোয়ার্টারগুলোর জানলা দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। শুধু ওদের বাড়ির জানলায় অনেকগুলো মুখ কি ভীষণ ভয় নিয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে।

এগিয়ে দেওয়া ওয়াটার বটল্‌টা হাতে নিয়ে অনি নিজের বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে ও টের পেল এখন আর একদম ভয় করছে না, বুকের মধ্যে একটুও সিরসিরানি নেই। বরং নিজেকে খুব কাজের বলে মনে হচ্ছে, বেশ বড় বড় লাগছে নিজেকে।

বারান্দায় উঠতেই দরজা খুলে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো হাত অনিকে জড়িয়ে ধরে ভেতরে টেনে নিল। সবাই মিলে বলতে লাগল, 'কি ছেলে রে বাবা, একটুও ভয় নেই, যদি ধরে নিয়ে যেত, আসুক আজ বাবা, হবে তোমার' ইত্যাদি। বেঁকেচুরে নিজের ছাড়িয়ে অনি ঝাড়িকাকুর দিকে ওয়াটার বট্‌লটা এগিয়ে দিয়ে গম্ভীর মুখে বলল, 'জল নিয়ে এস শিগ্‌গীর, লোকটা দাঁড়িয়ে আছে।'

www.MurchOna.com

অনির গলার স্বরে এমন একটা কিছু ছিল যে, মাধুরী অবাক হয়ে ছেলের দিকে তাকালেন। অনি যে এই গলায় কথা বলতে পারে মাধুরীর জানা ছিল না। ওয়াটার বট্‌লটা নিয়ে ভেতরে চলে গেলেন উনি।

পিসীমা বললেন, 'হ্যাঁরে, তোকে কি বলল রে?'

অনি বলল, 'কি আর বলবে, জল চাইল!'

পিসীমা আবার বললেন, 'তোকে কি ভয় দেখাল?'

বিরক্ত হয়ে অনি বলল, 'ভয় দেখাবে কেন? জল চাইতে হলে কি তুমি ভয় দেখাও?'

এমন সময় মাধুরী ওয়াটার বট্‌লটা নিয়ে ফিরে এলেন। কম্বলে মোড়া বট্‌লটা এখন বেশ ভারী। মাধুরী জলের সঙ্গে একটা প্লেটে বেশ কিছু বাতাসা বাতাসা দিলেন। বাতাসাটা নিয়ে অনি মায়ের দিকে তাকাতে মাধুরী হাসলেন, 'শুধু জল দিতে নেই রে, যা।' এক হাতে জল অন্য হাতে বাতাসা নিয়ে অনি গটগট করে বাইরে বেরিয়ে এল। এই জন্যে মাকে ওর এত ভাল লাগে।

মাঠের মধ্যে গাছের মত লোকটা একা দাঁড়িয়ে ছিল। অনিকে আসতে দেখে একগাল হাসল। হাসি দেখে অনির সাহস বেড়ে গেল। কাছাকাছি হতে লোকটা হাত বাড়িয়ে ওয়াটার বট্‌লটা নিয়ে বলল, 'থ্যাঙ্কু।' কথাটা অনি ঠিক বুঝলো না, কিন্তু ভঙ্গীতে বেশ মজা লাগল। ও বাতাসার প্লেটটা এগিয়ে ধরতে লোকটা চোখ কুঁচকে সেটাকে দেখে বলল, 'হোয়াতিজ দ্যাট?' মানেটা ধরতে না পারলেও অনিক বুঝতে পারল লোকটা কি বলতে চাইছে। এখনও ওদের স্কুলে ইংরেজী শুরু হয়নি। সরিৎশেখর অবশ্য ওকে মাঝে মাঝে ইংরেজী শব্দ শেখান কিন্তু বাতাসার ইংরেজী কোনদিন শুনেছে বলে মনে করতে পারল না। বরং বাতাসা খেতে মিষ্টি, আর মিষ্টির ইংরেজী সুইট—এটা বলে দিলেই তো হয়! শব্দটা শুনে লোকটা ঠোঁট দুটো গোল করে অবাক হবার ভান করে বলল, 'হোয়াই?' অনির মুখ দেখে হাসল সে, 'নো গুড ইংলিশ? আই টু। ওকে, ওকে।' বলে এক থাবায় বাতাসাগুলো নিয়ে মুখে পুরে চিবোতে লাগল। স্বাদ জিভে যেতে লোকটার মাথা দুলতে লাগলো চিবোনোর তালে তালে। তারপর ঢকঢক করে কয়েকটা ঢোক জল খেয়ে নিতেই পেছন থেকে ট্রাকের লোকগুলো হইহই করে ডাকতে শুরু করল। অনি দেখল পেছনের লোকগুলো ইংরেজী নয়, অন্য কোন ভাষায় জবাব দিয়ে একহাতে অনিকে শূন্যে তুলে নিয়ে ট্রাকের দিকে হাঁটতে লাগল। লোকটার গায়ের ঘেমো বোটকা গন্ধ আর ট্রাকের একদল নিগ্রোর হইহই, পেছনের বারান্দায় বেরিয়ে আসা পিসীমা আর্ত চিৎকারে অনির শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল, ওর হাত থেকে প্লেটটা টুপ করে পড়ে গেল। ওর মনে হল ও ছেলে ধরার কবলে পড়েছে, এখন ঐ ট্রাকে চাপিয়ে পৃথিবীর কোন দূরান্তে ওকে নিয়ে যাবে ওরা। বাবা মা দাদু কাউকে কোনদিন দেখতে পাবে না ও। প্রচণ্ড আক্রোশে লোকটার চোখদুটো দুই আঙুলে টিপে অন্ধ করে দিতে গিয়ে অনি শুনল ওকে মাথায় তুলে হাঁটতে হাঁটতে লোকটা অদ্ভুত ভাষায় ভীষণ চেনা সুরে গান গাইছে। গাইবার ধরন দেখে বোঝা যায়, খুব মগ্ন হয়ে গাইছে ও। ওর ভাষা বোঝা অসম্ভব কিন্তু সুর শুনে অনির মনে হল পুজো করার সময় পিসীমা এই রকম সুরে গুনগুন করেন। অনির হাত লোকটার স্প্রিং-এর মত চুলের ওপর এসে থেমে গেল। ট্রাকের কাছে এসে লোকটা কিছু বলতে ট্রাকের ওপর দাঁড়ানো লোকগুলো হইহই করে উঠে হাত বাড়িয়ে অনির দিকে চার-পাঁচটা প্যাকেট এগিয়ে দিল। লোকটার কাঁধের ওপর থাকায় অনি ট্রাকের সবটাই দেখতে পাচ্ছে। একগাদা কম্বল পাতা, বন্দুক, কাচের বোতল ছড়ানো। প্যাকেটগুলো ওর হাতে গছিয়ে দেওয়া হয়ে গেলে লোকটা ওকে মাটিতে নামিয়ে দিল। তারপর বিরাট থাবার মধ্যে ওর মুখটা ধরে কেমন গলায় বলল, 'থাঙ্কু ইউ মাই সন।' বলে লাফ দিয়ে ট্রাকে উঠে গেল। ওয়াটার বট্‌লটা তখন ট্রাকের ভেতর হাতে হাতে ঘুরছে।

ট্রাকটা চলে যেতে রাস্তাটা ফাঁকা হয়ে গেল। বিরাট আসাম রোড চুপচাপ—শব্দ নেই কোথাও। অনি ওর বুকের কাছে ধরা প্যাকেটগুলোর দিকে তাকাল। গন্ধ এবং ছবিতে বোঝা যাচ্ছে, এগুলো বিস্কুট এবং টফির প্যাকেট। ওরা ওকে এগুলো ভালবেসে দিয়ে গেল। অথচ কি ভয় পেয়ে গিয়েছিল! লোকগুলোকে ছেলেধরা বলে ভেবেছিল। হঠাৎ অনি অনুভব করল ওর প্যান্টের সামনেটা কেমন ভেজা-ভেজা। এক হাতে প্যাকেটগুলো সামলে অন্য হাতে জায়গাটা পরীক্ষা করে ও পাথর হয়ে গেল। ভয়ের চোটে এতক্ষণ টেরই পায়নি। অথচ লোকগুলো কত ভালো! নিজের বাড়ির দিকে তাকিয়ে ও দেখল

www.MurchOna.com

পিসীমা মাঠের মাঝে দাঁড়িয়ে, পাশে ঝাড়িকাকু, অনেক পেছনে মা। হঠাৎ ওর পিসীমার ওপর রাগ হল, পিসীমাই শুধু শুধু মিলিটারিদের ছেলেধরা বলে ভয় দেখায়। অনি আর দাঁড়াল না। একছুটে মাঠটা পেরিয়ে পিসীমার বাড়ানো হাতের ফাঁক গলে মায়ের শরীর জড়িয়ে ধরল।

মাধুরী বললেন, 'কী হয়েছে?'

মাকে জড়িয়ে ধরতে মুঠো আলগা হওয়ায় অনির হাত থেকে প্যাকেটগুলো টুপটুপ করে মাটিতে পড়ে যাচ্ছিল। সেই অবস্থায় মায়ের বুকে মুখ গুঁজে অনি বলল, 'লোকটা খুব ভালো, কিন্তু মা, আমি বোকার মত হিসি করে ফেলেছি।'

ভরত হাজাম সরিৎশেখরের চুল কাটছিল। কাঁঠালতলার রোদ্দুরে কাঠের পিঁড়ি পেতে উনি বসেছিলেন। চুল কাটার সব সরঞ্জাম বাড়িতে রেখেছেন উনি। বারো ভূতের চুল-কাটা কাঁচি খুরে ওঁর বড় ঘেন্না, কার কি রোগ আছে বলা যায় না। ভরত তাই খালি হাতে এ বাড়িতে আসে। এমন কি কাটা চুল থেকে গা বাঁচানোর জন্যে ত্রিশ বছরের পুরোনো লং ক্লথ যেটা এই মুহূর্তে সরিৎশেখর জড়িয়ে বসে আছেন সেটাও আনতে হয় না।

কিচকিচ শব্দ উঠছিল ভরতের দুই আঙুলের চাপে। বেশীক্ষণ মাথা নিচু করতে পারেন না বাবু, তাই মাঝে মাঝে হাত সরিয়ে নিচ্ছিল ভরত। আজ ত্রিশ বছর এই বাড়ির চুল কাটছে ও, অনেককেই জন্মাতে দেখেছে, মরতেও। বিয়ে দিয়ে এনেছে কয়েকজনকে। কিন্তু এখন আর তেমন জোর নেই ওর। কেমন যে ও পুরোনো হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারে না। এই বাড়ির সেজবাবু ওর কাছে চুল কাটে না। একদিন বলতেই হেসে উঠেছিল, 'কেন বাবা, আমাকে আর দয়া নাই বা করলে, তোমার বাটিছাঁট নেবার পার্টি এ বাড়িতে অনেক আছে। বাবা টু অনি। অল ফাউন্ড দু টাকা!' মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল ভরতের, হ্যাঁ, দু টাকায় ও সবাইয়ের এমন কি ঝাড়ির চুলটাও কেটে দেয়। প্রথম ছিল আট আনা, বছর পাঁচেক আগে বেড়ে গিয়ে দু টাকা হল।

সরিৎশেখর মাথা তুলতেই হাত সরিয়ে নিল ভরত হাজাম, 'তোর কাছে এই শেষ চুল কাটা, না?' ভরত কোন উত্তর দিল না। বাবুর চাকরি শেষ, এই বাগান থেকে শহরে বাড়ি করে বাবু চলে যাচ্ছেন। এই মাথার কালো চুলগুলো চোখের সামনে ফুলের মতো সাদা হয়ে গেল—আজ ত্রিশ বছর ধরে এই মাথার চুল কেটেছে ও, আর কোনোদিন কাটতে পারবে না। লোকমুখে শুনেছে ও, বাবু নাকি এই বাগানে আর কোনদিন পা দেবেন না। কথাটা ভাবতেই বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল। পানসে চোখে জল আসতে লাগল।

হঠাৎ সরিৎশেখর বললেন, 'ভরত, যাবার সময় এই খুরকাঁচিগুলো নিয়ে যাস। খুব চাইতিস তো এককালে!'

সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড চিৎকার করে কেঁদে উঠল ভরত। দু হাতে মুখ গুঁজে ফোঁপাতে লাগল বাচ্চা ছেলের মত।

কান্নার শব্দ শুনে সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে এল। রান্নাঘরে অনিকে খেতে দিচ্ছিলেন মাধুরী, শব্দ শুনে এঁটো হাতে একছুটে বেরিয়ে এল অনি, পিছনে পিছনে মাধুরী। ঝাড়িকাকু ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে হাসছে। মহীতোষকে দেখে মাথায় ঘোমটা তুলে দিলেন মাধুরী। শ্বশুরমশাই পিছন ফিরে বসে, সামনে ভরত হাজাম মাটিতে বসে কাঁদছে। একটু আগে স্নান হয়ে গেছে মহীতোষের। এই বাড়িতে লুঙ্গী পরা নিষেধ ছিল এককালে। মহীতোষ নিয়ম ভেঙেছেন। শীতকাল নয় তবু ঠাণ্ডা আছে, তাই লুঙ্গির ওপর পুরো হাতের গেঞ্জি চাপানো। অনি দেখল পিসীমা দাদুর কাছে এগিয়ে গেলেন। মহীতোষ বারান্দায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছে?' সরিৎশেখর মুখ ঘুরিয়ে সবাইকে দেখলেন। অনি দেখল দাদুর মুখ কেমন অন্যরকম হয়ে গিয়েছে। কী গম্ভীর! ভরত হাজামকে কি দাদু বকেছে খুব? অমন করে কাঁদছে কেন? চুল কাটার সময় ভরত এমন করে ওর ঘাড় ধরে থাকে যেন অনিরই কান্না পেয়ে যায়। একটু নড়াচড়া করলে মাথায় গাঁট্টা মারে। আবার মন ভালো থাকলে গানও শোনায় কাঁচি চালাতে চালাতে। একটা গান তো অনিরই মুখস্থ হয়ে গেছে—'বুড্ডা কাঁদে বুড্ডি নাচে, বুড্ডা বোলে ভাগো'। মা অবশ্য খুব বারণ করে দিয়েছে গানটা গাইতে। কিন্তু বাবা দাদু বাড়িতে না থাকলে ছোটকাকু গলা ছেড়ে ঠাট্টা করে গানটা মাঝে মাঝে গায়।

www.MurchOna.com

সরিৎশেখর গম্ভীর গলায় বললেন, 'মহী, আমি যখন এখানে থাকবো না তখন যেন ভরতের এ বাড়িতে আসা বন্ধ না হয়।'

মহীতোষ বললেন, 'কী আশ্চর্য, বন্ধ হবে কেন?'

সরিৎশেখর বললেন, 'আর তো বুড়ো হয়ে গেছে, যখন চুল কাটা ছেড়ে দেবে তখনও যেন প্রতি মাসে টাকাটা দেওয়া হয়।'

মহীতোষ হাসলেন, 'আচ্ছা।'

পিসীমা জিজ্ঞাসা করলেন, 'ও বাবা, এই জন্যে ভরত কাঁদছে?'

সরিৎশেখর মাথা নাড়লেন, না। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে হেঁকে উঠলেন, 'আয় বাবা ভরত, বাকি চুলটা কেটে দে, আমি সারাদিন বসে থাকতে পারব না।'

বাঁধাছাঁধা শেষ। টুকিটাকি যাবতীয় জিনিসপত্র পিসীমা জড়ো করেছেন। চিরকালের জন্য যেন স্বর্গছেঁড়া ছেড়ে চলে যাওয়া—এই যে মাধুরী মহীতোষেরা এখানে থাকছেন এ কথাটা আর মনে নেই। শহরে গিয়ে অসুবিধে হতে পারে বলে পুরো সংসারটা তুলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছেন পিসীমা। অনির জামাকাপড় বাক্সে তোলা হয়ে গিয়েছে। সময়টা যত গড়িয়ে যাচ্ছে অনির বুকের ভেতর তত কি খারাপ লাগছে! অথচ দাদুর মুখ দেখে মোটেই মনে হচ্ছে না, এখান থেকে যেতে একটুও খারাপ লাগছে। এই চা-বাগান নাকি দাদু নিজের হাতে তৈরি করেছেন। দাদুর তো বেশী মন-কেমন করা উচিত। বরং দাদু চলে যাচ্ছেন শুনে এত যে লোকজন দেখা করতে আসছে, তাদের সঙ্গে বেশ হেসে হেসে দাদু কথা বলছেন। মাঝে আর একটা দিন। পনেরই আগস্ট। তার পরদিনই চলে যেতে হবে এখান থেকে। বাগান থেকে দুটো লরি দেবে মালপত্র নিয়ে যেতে—আজ অবধি অনি শহরে যায়নি কখনো।

অন্ধকারে অনি চারপাশে চোখ বোলাল। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এখন রাত ক'টা! ভোর পাঁচটার সময় বিশু আর বাপী ওদের বাড়ির সামনে আসবে। রাত্রে শোওয়ার সময় মাধুরী অনির জন্য সাদা শার্ট কালো প্যান্ট ইস্ত্রি করিয়ে রেখে দিয়েছেন। পাঁচটা বাজতে আর কত দেরি! অনির মোটেই ঘুম আসছিল না। ওর বুকের ওপর মাধুরীর একটা হাত নেতিয়ে পড়ে আছে। ওপাশে মহীতোষের নাক ডাকছে। কান খাড়া করে অনি কিছুক্ষণ শুনতে চেষ্টা করল বৃষ্টির শব্দ হচ্ছে কিনা। যাক্ বাবা, বৃষ্টি হচ্ছে না। কাল সারাটা দিন যদিও রোদের দিন গেছে, তবু সন্ধ্যেনাগাদ মেঘ-মেঘ করছিল। হঠাৎ মাধুরীর হাতটা একটু নড়ে উঠতে অনি চমকে উঠল। মাধুরীর শরীর থেকে অদ্ভুত মিষ্টি গন্ধটা বেরুচ্ছে। আর এক দিন একটা রাত—মায়ের বুকে মুখ গুঁজে দিতে মাধুরীর ঘুম ভেঙে গেল! জড়ানো গলায় বললেন, 'আঃ, ঠেসছিস কেন?' আর সঙ্গে সঙ্গে অনি শুনতে পেল কে যেন তার নাম ধরে বাইরে ডাকছে। তড়াক করে উঠে পড়ল ও। মাধুরী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হল?' অনি বলল, 'ওরা এসে গেছে।' অনি দেখল, ওর গলা শুনে মহীতোষের নাক ডাকা থেমে গেল। বাবার ঘুমটা অদ্ভুত, অনি ঠিক বুঝতে পারে না।

পাটভাঙা জামাপ্যান্ট, বুকে কাগজের গান্ধীর ছবি পিন দিয়ে এঁটে, হাতে জাতীয় পতাকা নিয়ে বীরের মত পা ফেলে অনি বাইরের ঘরে এসে থমকে দাঁড়াল। বাইরের ঘরের জানলা খুলে দেওয়া হয়েছে। দরজাও খোলা। বাইরে এখনও আলো ফোটেনি। অন্ধকারটা ফ্যাকাশে হয়ে এসেছে। সেই ফ্যাকাশে অন্ধকারটা ঘরময় জুড়ে রয়েছে। ঘরের একপাশে ইজিচেয়ারে সরিৎশেখর চুপচাপ বসে আছেন। অনির পায়ের শব্দে উনি মুখ ফিরিয়ে ওকে দেখলেন। দাদু এভাবে বসে আছেন কেন? দাদু কি কাল রাত্রে ঘুমোননি? দাদুর মুখটা অমন দেখাচ্ছে কেন? হাত বাড়িয়ে সরিৎশেখর অনিকে ডাকলেন, 'কোথায় চললে?'

'স্কুলে। আজ আমাদের স্বাধীনতা দিবস।' অনি বলল।

'স্বাধীনতা মানে জানো?' সরিৎশেখর বললেন।

'হ্যাঁ, আমরা নিজেরাই নিজেদের রাজা এখন।' অনি শোনা কথাটা বলল।

'গুড। গো অ্যাহেড। এগিয়ে যাও।' পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন সরিৎশেখর।

ওকে দেখে বিশু বলল, 'তাড়াতাড়ি চল, আরম্ভ হয়ে গেল বলে।'

বাপী বলল, 'কাল রাত্রে তোদের রেডিওটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, না?'

www.MurchOna.com

অনি বলল, 'জানি না তো।'

বাপী বলল, 'কাল বারোটার সময় সবাই রেডিও শুনতে গিয়ে দেখে খারাপ হয়ে গিয়েছে। ঝবা বাড়ি ফিরে বলল।' অনি ব্যাপারটা জানে না, ও শুনেছিল রাতে রেডিওতে নাকি কি সব বলবে, কিন্তু ওদের রেডিওটাই খারাপ হয়ে গেল, যাঃ!

দেরি হয়ে গেছে বলে ওরা দৌড় শুরু করল। আসাম রোডের দু পাশে সার দিয়ে দাঁড়ানো পাইন-দেওদার গাছের শরীরে অন্ধকার ঝুপসি হয়ে বসে আছে। রাস্তাটা এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পূব দিকটায় একটা লালচে আভা এসেছে। ওরা তিনজন পাশাপাশি তিনটে পতাকা সামনে ধরে দৌড়চ্ছিল। হাওয়ায় পতাকা তিনটে পতপত করে উড়ছে; একটু শীতের ভাব থাকলেও বেশ আরাম লাগছে ছুটতে। অনির ভারী ভালো লাগছিল। আর আমরা নিজের রাজা নিজে। দৌড়তে দৌড়তে বাপী চিৎকার করল, 'পনেরই আগস্ট', ওরা চিৎকার করে জবাব দিল, 'স্বাধীনতা দিবস।' এখন এই রাস্তার চারপাশে কেউ জেগে নেই। নির্জন আসাম রোডের ওপর ছুটে চলা তিনটে বালকের চিৎকার শুনে একরাশ পাখি দুদিকের গাছের মাথায় বসে কলরব করে জানান দিল। ভারতবর্ষের কোন এক কোণে এই নিঝুম প্রান্তরে সাতচল্লিশ সালের পনেরই আগস্টের এই ভোর-হতে-যাওয়া সময়টায় তিনটে বালক কি বিরাট দায়িত্ব নিয়ে পতাকা উঁচু রেখে দৌড়তে দৌড়তে গান ধরল, ওদের একটিমাত্র শেখা গান, 'ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা।' দৌড়বার তালে অনভ্যস্ত গলার সুর ভেঙেচুরে যাচ্ছে, তবু দু পাশের প্রকৃতি যেন তা অঞ্জলির মত গ্রহণ করছিল।

স্কুলবাড়ির কাছাকাছি এসে ওরা দাঁড়িয়ে পড়ল। এখনও আলো ফোটেনি, কিন্তু কষ্ট করে অন্ধকার খুঁজতে হয়। ওরা দেখল একটি মূর্তি খুব সতর্ক পায়ে রাস্তার এক পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। বিশু বলল, 'রেতিয়া না রে?'

ওরা তিনজন তিন পাশে দাঁড়াতে রেতিয়া চমকে সোজা হয়ে দাঁড়াল, মুখটা ছুঁচলো করে অন্ধ চোখ দুটো বন্ধ করে কিছু টের পেতে চেষ্টা করল। গলা ভারি করে অনি জিজ্ঞাসা করল, 'কাঁহা যাহাতিস রে!'

চট করে উত্তর এল, 'স্কুল।' ওরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল, তারপর আবার দৌড় শুরু করল। অনি ঠিক বুঝতে পারছিল না রেতিয়ার কাছে কি করে খবর গেল যে আজ স্বাধীনতা দিবস। স্বাধীনতা মানে আমি নিজেই নিজের রাজা। রাজার ইংরেজি কিং। বাবারা তাস খেলার সময় কিংকে সাহেব বলে। আমরা আজ থেকে সব সাহেব হয়ে গেলাম। রেতিয়া পর্যন্ত।

স্কুলের মাঠটা এই সাতসকালে প্রায় ভরে গেছে। ওদের বাগান থেকে মাত্র ওরা তিনজন কিন্তু ওপাশের বাজার, হিন্দুপাড়া কলিন পার্ক থেকে ছেলেমেয়ের দল এসে মাঠটা ভরিয়ে দিয়েছে। স্কুলের সামনে একটা লম্বা বাঁশ পোঁতা হয়েছে যার ডগা থেকে একটা দড়ি নিচে নামানো। পাশে টেবিলের ওপর মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর ছবি। এই নামটা অনি সবে শিখেছে। এত বড় নাম মনে না থাকলে গান্ধীজী বলা যেতে পারে, নতুন দিদিমণি বলেছেন। ভবানী মাস্টারকে দেখে অবাক হয়ে গেল ও। ধোপভাঙা ধুতি পাঞ্জাবি পরলেও অনেককে ভাল দেখায় না, ভবানী মাস্টারকেও কেমন দেখাচ্ছে। তার ওপর মাথায় সাদা নৌকো টুপি। সুভাষচন্দ্র বসুর ছবিতে দেখেছে ও। নতুন দিদিমণি গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন পাশে। টেবিলের ওপাশে দুটো চেয়ার, একটাতে ব্যানার্জি স-মিলের বড় কর্তা, অন্যটাতে মোটা মতন একটা লোক নৌকো টুপি পরে বসে ঘড়ি দেখছেন মাঝে মাঝে।

অনিরা ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে গেল। স্বর্গছেঁড়ার বেশ বড় বড় কয়েকজন ছেলে যারা স্কুলে পড়ে না তারা ভিড় ম্যানেজ করছিল। পূর্বদিকটা ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। ব্যানার্জি স-মিলের বড়কর্তা ভবানী মাস্টারকে ডেকে ফিসফিস করে কি বলতে ভবানী মাস্টার হাত তুলে সবাইকে শান্ত হতে বললেন। গোলমাল থেমে যেতেই নতুন দিদিমণি চিৎকার করে উঠলেন, 'বন্দে-এ মাতরম্।' সঙ্গে সঙ্গে কয়েকশ' শিশুর গলায় উল্লাস উঠল, 'বন্দে-এ মাতরম্।' তিনবার এই ধ্বনিটা উচ্চারণ করে অনির মনে হল ওদের চারপাশে অদ্ভুত একটা ফুলের দেওয়াল তৈরি হয়ে গেছে। ভবানী মাস্টার চিৎকার করে উঠলেন, 'তোমরা জান, আজ ইংরেজের দাসত্ব মোচন করে আমরা স্বাধীন হয়েছি। দু'শ বছর পরাধীনতার পরে আমাদের ক্ষুদিরাম, বাঘা যতীন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, গান্ধীজির জন্যে আজ এই দেশে স্বাধীনতা এসেছে।' নতুন দিদিমণি ফিসফিস করে কিছু বলতেই ভবানী মাস্টার বললেন, 'হ্যাঁ, এই সঙ্গে

www.MurchOna.com

সুভাষ বোসের নাম ভুলে গেলে চলবে না। স্বাধীনতার এই পুণ্যদিনে আমরা সমবেত হয়েছি। তোমরা যারা এখনও নাবালক তারা শোন, এই দেশটাকে ছিঁড়ে শুষে নষ্ট করে দিতে চেয়েছে ইংরেজরা। এই দেশটাকে নিজের মায়ের মত ভেবে নিয়ে তোমাদের নতুন করে গড়তে হবে। বল সবাই বন্দে মাতরম্।' অনিরা গলা ফাটিয়ে চিৎকার কলল, 'বন্দে মাতরম্।' অনি দেখল ভবানী মাস্টারের চোখ থেকে জল নেমে এসেছে, তিনি মোছার চেষ্টা করছেন না। সেই অবস্থায় ভবানী মাস্টার বললেন, 'তাকিয়ে দ্যাখো পূর্ব দিগন্তে সূর্যদেব উঠেছেন। এই মহালগ্নে আমাদের স্বর্গছেঁড়ার আকাশে প্রথম জাতীয় পতাকা উড়বে। শহর থেকে বিশিষ্ট জননেতা শ্রীযুক্ত হরবিলাস রায় মহাশয় আজ আমাদের এখানে এসেছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর অবদানের কথা আমরা সবাই জানি। আমি তাঁকে অনুরোধ করেছি এই পবিত্র দায়িত্ব গ্রহণ করতে।' সবাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে। কোথাও কোনো শব্দ নেই। স্বর্গছেঁড়ার মানুষের জীবনে এমন একটা ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে যার গুরুত্ব সম্পর্কে কেউ হয়তো কোনদিন সচেতন ছিল না। এখন এই মুহূর্তে সবাই উন্মুখ হয়ে দাঁড়িয়ে।

হরবিলাসবাবু দাঁড়ালেন, সামনের জনতার ওপর ওঁর বৃদ্ধ চোখ দুটো রাখলেন খানিক, তারপর খুব পরিচ্ছন্ন গলায় বললেন, 'আজ সেই মুহূর্ত এসেছে যার জন্য আমরা সারাজীবন সংগ্রাম করেছি। গান্ধীজীর অনুগামী আমি, আমাদের সংগ্রাম শান্তির জন্য, ভালবাসার জন্য। কিন্তু আমার তো বয়স হয়েছে। এই পতাকা আমার যৌবনের স্বপ্ন ছিল, একে আমি আমার রক্তের চেয়ে বেশী ভালবাসি। আজ এই পতাকা মাথা উঁচু করে আকাশে উড়বে—এই দৃশ্য দেখার জন্যই আমি বেঁচে আছি। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, এই পতাকা আকাশে তোলার যোগ্যতা আমার নেই। এই পতাকা তুলবে আগামীকালের ভারতবর্ষের দায়িত্ব যাদের ওপর তারাই। সাতচল্লিশ সালের পনেরই আগস্টের এই সকাল তাদের সারাজীবন দেশ গড়ার কাজে শক্তি যোগাবে। তাই আমি আগামীকালের নাগরিকদের মধ্যে একজনকে এই পতাকা তোলার জন্য আহ্বান করছি।' সবাই অবাক হয়ে কথাগুলো শুনলো। হরবিলাসবাবু কয়েক পা এগিয়ে এসে সামনের দিকে তাকালেন। তাঁর চোখ ছোট ছেলেদের মুখের ওপর, কাকে ডাকবেন তিনি ভাবছেন। হঠাৎ অনি দেখল হরবিলাসবাবু তার দিকে তাকিয়ে আছেন। খানিকক্ষণ দেখে তিনি আঙুল তুলে অনিকে কাছে ডাকলেন। অনি প্রথমে বুঝতে পারেনি যে তাকেই ডাকা হচ্ছে। বোঝা মাত্রই ওর বুকের মধ্যে দুকদুক শুরু হয়ে গেল। হাঁটুর তলায় পা দুটোর অস্তিত্ব যেন হঠাৎই নেই। বাপী ফিসফিস করে বলল, 'তোকে ডাকছে, যা।'

হরবিলাসবাবু ডাকলেন, 'তুমি এস ভাই।'

কি করবে ভেবে না পেয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল অনি। স্বর্গছেঁড়ার ছেলেমেয়ের দল অনির দিকে তাকিয়ে আছে। হরবিলাসবাবু এক হাতে অনিকে জড়িয়ে ধরে পতাকার কাছে নিয়ে গেলেন। ভবানী মাস্টার বাঁশের গায়ে জড়ানো দড়িটা খুলে অনিকে ফিসফিস করে বললেন, 'এইদিকের রশিটা টানবা, পুঁটলিটা একদম ডগায় গেলে রশিটা জোরে নাচাবা।'

অনি সম্মোহিতের মত মাথা নাড়ল। হরবিলাসবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার নাম কি ভাই?'

'অনি, অনিমেষ।'

হরবিলাসবাবু সোজা হয়ে সামনের দিকে তাকালেন, 'আপনারা সবাই প্রস্তুত হোন। এখন সেই ব্রাহ্মমুহূর্ত, আমাদের জাতীয় পতাকা স্বাধীন ভারতের আকাশে মাথা উঁচু কর উড়বে। তাকে তুলে ধরছে আগামীকালের ভারতবর্ষের অন্যতম নাগরিক শ্রীমান অনিমেষ।' কথাটা শেষ হতেই ভবানী মাস্টার ইঙ্গিত করে অনিমেষকে দড়িটা টানতে বললেন।

দু হাতে হঠাৎ যেন শক্তি ফিরে পেল অনি, সমস্ত শরীরে কাঁটা দিচ্ছে, মা কোথায়—মা যদি দেখত, অনি দড়িটা ধরে টানতে লাগল। এ পাশের দড়ি বেয়ে একটা রঙিন পুঁটলি উঠে যাচ্ছে, ওদিকে দড়ি নেমে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে হরবিলাসবাবু চিৎকার করে উঠলেন, 'বন্দে মাতরম্।' সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গছেঁড়া কাঁপিয়ে চিৎকার উঠল, 'বন্দে মাতরম্'। চিৎকারটা থামছে না, একের পর এক ডাকের নেশায় সবাই পাগল, সেই সঙ্গে শঙ্খ বাজতে লাগল। নতুন দিদিমণি ব্যাগ থেকে শঙ্খ বের করে গাল ফুলিয়ে সেই ডাকের সঙ্গে মিলিয়ে সেই শঙ্খধ্বনি করতে লাগলেন। অনি তকিয়ে দেখল পুঁটলিটা ওপরে উঠে গেছে। দড়িটা ধরে ঝাঁকুনি দিতেই চট করে সেটা খুলে গিয়ে ঝুরঝুর করে কি সব আকাশ থেকে অনির

www.MurchOna.com

মাথার ওপর ঝরে পড়তে লাগল। অনি দেখল একরাশ ফুলের পাপড়ি ওর সমস্ত শরীর ছুঁয়ে নিচে পড়ছে আর সকালের বাতাস মেখে প্রথম সূর্যের আলো বুকে নিয়ে তিনরঙা পতাকা কী দারুণ গর্বে দোল খাচ্ছে। চারধারে হইহই চিৎকার, ও ওকে জড়িয়ে ধরছে আনন্দে, কারো কোন কথা শোনা যাচ্ছে না। ওপরের ঐ গর্বিত পতাকার দিকে তাকিয়ে অনির মনে হল ও এখনও ছোট, পতাকাটা ওর নাগালের অনেক বাইরে।

সরিৎশেখর ফেয়ারওয়েল নিতে রাজী হলেন না। পনেরই আগস্টের দুপুরে হে সাহেব নিজে গাড়ি চালিয়ে সরিৎশেখরের কাছে এলেন। সরিৎশেখর তখন বারান্দায় বেতের চেয়ারে অনিকে নিয়ে বসে ছিলেন। আর স্বর্গছেঁড়ায় অনি একটা খবর হয়ে গিয়েছে। হরবিলাসবাবু অনিকে দিয়ে প্রথম জাতীয় পতাকা তুলিয়েছেন, এই কথাটা সবার মুখে মুখে ঘুরছে। পতাকা তোলার পর ছবি তোলা হয়েছে অনিকে সামনে রেখে। ভবানী মাস্টার বলেছেন ছবিটা বাঁধিয়ে স্কুলের বারান্দায় টাঙিয়ে রাখবেন। খবরটা শুনে সরিৎশেখর সেই যে অনিকে সঙ্গে রেখেছেন আর ছাড়তেই চাইছেন না।

হে সাহেবের বাড়ি স্কট্‌ল্যাণ্ডে। চা-বাগানের ম্যানেজারি করে গায়ের রঙটা সামান্য নষ্ট হলেও আচার-আচরণে পুরো সাহেব। গাড়ি থেকে নামতেই সরিৎশেখর উঠে দাঁড়ালেন। এই দীর্ঘ বছরগুলো চা-বাগানে কাজ করে তিনি অনেক বিদেশী ম্যানেজারের সংস্পর্শে এসেছেন এবং তাঁদের মধ্যে কেউ তাঁর বিরুদ্ধে অসৌজন্যের অভিযোগ করতে পারেননি। ম্যাকফার্সন সাহেব একসময় অভিযোগ করতেন সরিৎশেখর কংগ্রেসীদের সঙ্গে বেশি মেশামেশি করছেন, হিন্দু-মুসলমান গণনার সময় তিনি কংগ্রেসকে সাহায্য করেছেন, কিন্তু সেটা ছিল তাঁদের অন্তরঙ্গ ব্যাপার। এ নিয়ে ম্যাকফার্সন সাহেব ওপরতলায় কোনদিন রিপোর্ট করেননি।

'হ্যালো বড়বাবু!' হে সাহেব হাসলেন, হেসে হাত বাড়িয়ে দিলেন। সরিৎশেখর করমর্দন করে সাহেবকে চেয়ারে বসালেন। হঠাৎ অনির ভবানী মাস্টারের কথা মনে পড়ে গেল। ইংরেজ সাহেবরা আমাদের দেশটাকে ছিঁড়ে শুষে নিয়ে চলে গেছে। সবাই তো যায়নি, এই হে সাহেব তো এখনও দাদুর সামনের চেয়ারে বসে হাসছেন। দাদু ওঁর সঙ্গে অমন ভালভাবে কথা বলছে কেন? আজ তো আমরা নিজেরাই নিজেদের রাজা। বড় খারাপ লাগছিল অনির।

হে সাহেব বললেন, 'আমি খবর পেলাম, তুমি নাকি ফেয়ারওয়েল নিতে রাজী হচ্ছো না!' বাংলা বলেন সাহেব, ভাঙা ভাঙা, তবে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। কথাটা বলার সময় সাহেবের মুখ-চোখ খুব গম্ভীর দেখালো।

সরিৎশেখর হাসলেন, 'আমাকে তোমরা তাড়িয়ে দিতে চাইছ?'

সাহেব বললেন, 'সে কি, একথা কেন বলছ? এই টি-এস্টেট তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। ফেয়ারওয়েল মানে কি তাড়িয়ে দেওয়া?'

সরিৎশেখর হাসলেন, 'দ্যাখো সাহেব, আমি জানি এই বাগানের সবাই আমাকে ভালোবাসে। আজ সবাই আমাকে ভাল কথা বলে উপহার দেবে এবং আমি সেগুলো নিয়ে চুপচাপ চলে যাব, ব্যাপারটা ভাবতে খুব অস্বস্তি লাগছে।'

সাহেব বললেন, 'কিন্তু এটাই তো প্র্যাকটিস।'

খুব ধীরে ধীরে সরিৎশেখর বললেন, 'আজ আমাদের ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে। দু'শ বছর পর তোমাদের হাত থেকে ক্ষমতা পেয়েছি। এমন দিনে আমাকে ফেয়ারওয়েল দিও না, নিজেকে বড় অক্ষম মনে হবে। আমাকে তো বেঁচে থাকতে হবে!'

হে সাহেব সরিৎশেখরের দিকে কিছুক্ষণ স্থির চোখে তাকালেন, তারপর মাথা নিচু করলেন, 'আই আণ্ডারস্টাণ্ড। তবে আমরা তো কমন পিপল, ওয়েল, তোমার ফেয়ারওয়েলে যদি আমি না থাকি তাহলে তোমার আপত্তি আছে?'

চট করে উঠে দাঁড়ালেন সরিৎশেখর, উঠে এসে হে সাহেবের হাত জড়িয়ে ধরলেন, 'কি বলছ সাহেব! আমি তোমাকে হেয় করতে চাইনি। তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কের মধ্যে আমি বিশ্বাস করি কোন তিক্ততা নেই। তোমার পূর্বপুরুষ আমার পূর্বপুরুষের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল, তার

www.MurchOna.com

জন্যে তুমি দায়ী হবে কে? তুমি তো জান আমি অ্যাকটিভ পলিটিক্স কোনকালে করিনি। আর আমি জানি এখন ভারতবর্ষের যাঁরা নেতা হবেন তাঁদের সঙ্গে আমাদের মত সাধারণ মানুষের কোন যোগাযোগ থাকবে না। তবু আজ আমাদের স্বাধীনতা দিবস—এটা একটা আলাদা ফিলিংস—আমার মনে হচ্ছে আমি যৌবনে ফিরে গিয়েছি—তুমি ফেয়ারওয়েল দিয়ে আমাকে বুড়ো করে দিও না।'

হে সাহেব উঠে দাদুর একটা হাত ধরে গাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলেন, পেছনে অনি। হে সাহেব বললেন, 'বাবু, এবার বোধ হয় আমাকে দেশে ফিরে যেতে হবে। কোম্পানী ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট ইণ্ডিয়ায় হয়তো বিজনেস করতে চাইবে না। সো, আমাদের হয়তো আর কোনদিন দেখা হবে না। বাট, আমি চিরকাল এই দিনগুলো মনে রাখবো, আমি জানি তুমিও ভুলবে না।'

দাদু কিছু বললেন না। সাহেব গাড়িতে উঠে অনির দিকে তাকালেন, তারপর হাত নেড়ে বললেন, 'কনগ্রাচুলেশন, আওয়ার ইয়ং হিরো!'

গাড়িটা চলে যেতে অনি দাদুর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। দাদুর পাশে দাঁড়ালে ওর নিজেকে ভীষণ ছোট লাগে। সরিৎশেখর নাতির কাঁধে হাত রেখে হাঁটতে লাগলেন হঠাৎ। পায়চারি করে বেড়াবার মত ওঁরা আসাম রোডে এসে পড়লেন। অনি দেখছিল, দাদু কোন কথা বলছেন না, মুখটা গম্ভীর। বাড়ির সবাই ওঁকে খুব ভয় করে কিন্তু অনির সঙ্গে উনি এরকম মুখ করে থাকেন না। অনেকক্ষণ থেকে সাহেব সম্পর্কে একগাদা জিজ্ঞাসা অনির মনে ছটফট করছিল। হাঁটতে হাঁটতে সে বলল, 'দাদু, সাহেবকে তুমি কিছু বললে না কেন?'

সরিৎশেখর আনমনে বললেন, 'কেন, কি বলব?'

অনি অবাক হল, 'কেন? ওরা আমাদের দেশটাকে ছিঁড়ে শুষে নষ্ট করে দেয়নি?'

সরিৎশেখর চমকে নাতির দিকে তাকালেন, 'ও বাবা, তুমি এসব কথা কোত্থেকে শিখলে? নিশ্চয় ভবানী মাস্টার বলেছে?'

ঘাড় নাড়ল অনি, 'হ্যাঁ, বল না মিথ্যে কথা না সত্যি কথা?'

দুদিকে মাথা দোলালেন সরিৎশেখর, 'মিথ্যে নয় আবার সবটা সত্যি নয়। শোন ভাই, কেউ কাউকে নষ্ট করতে পারে না। সাহেবরা যখন এসেছিল আমরা ওদের হাতে দেশটাকে তুলে দিয়েছিলাম; ওরা নিজেদের স্বার্থে দেশটাকে ব্যবহার করবেই। কিন্তু হাতের পাঁচ আঙ্গুল কি সমান? কেউ কেউ তো অত্যাচারী নাও হতে পারে। যেমন ধর এই হে সাহেব, ওরা যে আমাদের প্রভু, আমরা যে পরাধীন তা কোনদিন ওঁর ব্যবহারে টের পাইনি। যেই আমরা স্বাধীন হলাম অমনি সাহেব খারাপ হয়ে গেল তা বলি কি করে?'

দু পাশে বড় বড় দেওদার, শাল তাদের ডালপালা দিয়ে আকাশ ঢেকে রেখেছে, ছায়া-ছায়া পথটায় ওঁরা হাঁটছিলেন। হাঁটতে হাঁটতে সরিৎশেখর বললেন, 'আজ যদি তুমি কলকাতায় থাকতে তা হলে কত কি দেখতে পেতে। কত উৎসব হচ্ছে সেখানে আমরা তো এখানে কিছুই বুঝতে পারি না, আজ অবধি এই স্বর্গছেঁড়ায় একদিনও আন্দোলন হয়নি। এখানকার বাগানের কুলিকামিনরা স্বাধীনতা মানেই জানে না। বরং আজ যদি সাহেব চলে যায় ওরা কাঁদবে। কিন্তু কলকাতা হল এই দেশের প্রাণকেন্দ্র, আমাদের ফুসফুসের মত। কত আন্দোলন হয়েছে সেখানে, কত মানুষ মরেছে পুলিশের গুলিতে।'

'কেন, মরেছে কেন? পুলিশ কেন গুলি করবে?' অনি বলল।

হাসলেন সরিৎশেখর, 'তুমি যে জামাটা পরে আছ, কেউ যদি সেটা চায় তুমি দিয়ে দেবে?'

'কেন দেব? আমার জামা আমি পরব!'

'কিন্তু ধর জামাটা একদিন তার ছিল, তুমি পেয়ে গেছ বলে পরছ, তা হলে? তুমি ভাবছ এখন এটা তোমার সম্পত্তি কিন্তু সে ওটা ফিরিয়ে নেবে বলে ঝামেলা করছে, ব্যাস, লেগে যাবে লড়াই!'

অনি বলল, 'জামাটা যদি আমার না হয় তাহলে আমি ফিরিয়ে দেব।'

মাথা নাড়লেন সরিৎশেখর, 'সেটাই উচিত, কিন্তু বড়রা এই কথাটা বোঝে না।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ হেঁটে যাওয়ার পর অনি বলল, 'আমাকে কলকাতায় নিয়ে যাবে দাদু?'

নাতির দিকে তাকালেন সরিৎশেখর, 'কলকাতায় তুমি একদিন যাবেই দাদু। তবে যেদিন যাবে নিজে নিজে যাবে। কারোর সঙ্গে যেও না।'

www.MurchOna.com

অনি বলল, 'কেন?'

সরিৎশেখর বললেন, 'এখন তো তুমি ছোট, আরো বড় হও তখন বুঝবে। শুধু মনে রেখো, কলকাতায় যখন তুমি যাবে তখন যোগ্যতা নিয়ে যাবে। তোমাকে তার জন্য সাধনা করতে হবে, মন দিয়ে পড়াশুনা করতে হবে। অনেক বড় নেতা হবে তুমি—স্বাধীন দেশের মাথা-উঁচু-করা নেতা।'

দাদুর কথাগুলো ঠিক ঠিক বুঝতে পারছিল না অনি। তবে ভেতরে ভেতরে অদ্ভুত একটা শিহরণ বোধ করছিল ও। আজ ভোরবেলায় ছুটে যেতে যেতে বন্দে মাতরম্ বলে চিৎকার করার সময় যে ধরনের গায়ে-কাঁটা-ওঠা কাঁপুনি এসেছিল ওর হঠাৎ সেই রকম হল। এই নির্জন রাস্তায় দাদুর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে অনি মনে মনে চিৎকার করে যেতে লাগল, 'বন্দে মাতরম্'।

কখন যেন ভোর হয়ে গেল, ঝকমকে রোদ উঠল কিন্তু স্বর্গছেঁড়া চা-বাগানের ফ্যাক্টরীতে আজ ভোঁ বাজল না। কিন্তু একটি দুটি করে মদেসিয়া ওঁরাও মানুষের দল ঘর ছেড়ে বেরুতে লাগল। সরিৎশেখরের কোয়ার্টারের সামনে যে বিরাট মাঠটা চাঁপা গাছ বুকে নিয়ে রয়েছে তার এক কোণে এসে চুপচাপ বসে থাকল।

কখন যেন ভোর হয়ে গেল, সরিৎশেখর নিজেই টের পাননি। কদিন থেকেই রাতের বেলা এলে তাঁর ঘুম চলে যায়। একা একা এই ঘরের জানলা দিয়ে বাইরের অন্ধকারে চোখে রেখে তিনি অদ্ভুত সব ছবি দেখতে পান। খোলা চোখ কখন দৃষ্টিহীন হয়ে মনের মত করে কিছু চেহারা তৈরী করে দেখতে শুরু করে দেয়। যাবার সময় যত এগিয়ে আসছে তত এটা বাড়ছে, চোখ তত সাদা হয়ে থাকছে। চূড়ান্ত হয়ে গেল আজ রাতটায়। কাল যে খাওয়া-দাওয়া চুকে গেলে শুয়েছেন বিছানায়, এই রোদ-ওঠা সময় অবধি ঘুমই এল না।

কান্নাকাটির ধাত সরিৎশেখরের কোনকালেই ছিল না। বরং খুব কঠোর বা নিষ্ঠুর বলে একটা কুখ্যাতি ছিল ওঁর সম্বন্ধে। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে স্বর্গছেঁড়া ছেড়ে চলে যাবার সময় এরকম কেন হচ্ছে! সারাটা জীবন এখানে কাটিয়ে নতুন জায়গায় যাবার অস্বস্তিতে? নতুন জায়গায় যেতে তিনি নিজেই চেয়েছিলেন, কর্মহীন হয়ে এই স্বর্গছেঁড়ায় থাকতে কিছুতেই চান না তিনি। তা হলে? কাল রাত্রে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখলেন উনি। উঠোনের লিচু গাছটার মাথায় অন্ধকার জমে গিয়ে ঠিক বড় বউ-এর পেছন ফিরে চুল খুলে দাঁড়াবার মূর্তি হয়ে গিয়েছে। চমকে গিয়েছিলেন তিনি। সে কত বছর আগের কথা। বড় বউ-এর মুখটা এখন আর মনে পড়ে না। চোখ ভাবতে গেলে চিবুকের ডোলটা হারিয়ে যায়, নাকটা খুব টিকোলো ছিল না মনে আছে, কিন্তু সব মিলিয়ে পুরো মুখটা যে কিছুতেই মনে পড়ে না। অনির মুখের দিকে তাকালে হঠাৎ হঠাৎ বড় বউ-এর মুখটা চলকে ওঠে। মহীতোষ বড় বউ-এর ছেলে, কিন্তু মায়ের কোন ছায়া ওর মধ্যে নেই। আবার মহীতোষের ছেলেকে দেখে সরিৎশেখরের কেন যে বড় বউ-এর কথা মনে আসে কে জানে! তা সেই অস্পষ্ট হয়ে যাওয়া বড় বউকে কাল রাত্রে অন্ধকারমাখা লিচু গাছটা ঠিক আস্ত ফিরিয়ে এনে দিল। রাত্রে শোবার আগে হ্যারিকেনের দিকে তাকিয়ে চুল আঁচড়াতো বড় বউ। পিছন থেকে সরিৎশেখর তার মুখ দেখতে পেতেন না, চুঁইয়ে আসা আলো খোলা চুলের ধারগুলোয় গুটিসুটি মেরে থাকত। ঠিক সেই রকম হয়েছিল কাল রাতে লিচু গাছটার।

কিন্তু বড় বউকে নিয়ে কিছু ভাবতে গেলেই যা হয় তাই হয়েছিল। হুড়মুড় করে ছোট বউ এসে যায়। ছোট বউ একদম স্পষ্ট। কুড়ি বছর আগের সেই ছটফটে চেহারা বড় বউ-এর ঠাণ্ডা এবং অস্পষ্ট চেহারাকে লহমায় মুছে দেয়। বড় বউ-এর সময় ছবি তোলা সম্ভব হয়নি। স্বর্গছেঁড়ায় ফটোর দোকান ছিল না। ছোট বউ-এর সময় সরিৎশেখর নিজে বইপত্তর পড়ে ছবি তোলা এবং তার ওয়াশপ্রিন্টিং শিখে নিয়েছিলেন। এখন এই কোয়ার্টারের দেওয়ালে ছোট বউ-এর মুখ ফ্রেমে বাঁধানো হয়ে অন্তত তিন জায়গায় রয়েছে। ছোট বউ দপদপিয়ে চলাফেরা করত, তাই যখন সে চলে গেল সরিৎশেখরের বুকের গভীরে দগদগে ঘা তৈরী হয়ে গেল। বড় বউ কখন এল কখন গেল, কোন অনুভূতি তৈরী হল না। কিন্তু কাল সারারাত ধরে এই দুটি বিপরীত চরিত্রের মেয়ে বার বার নিজেদের স্বভাব নিয়ে সরিৎশেখরের কাছে ফিরে ফিরে এসেছে। স্বর্গছেঁড়ার এই বাড়ির চৌহদ্দিতে যাদের অস্তিত্ব সীমায়িত তারা সরিৎশেখরকে এই যাবার আগের রাতে শেষবারের জন্য ঘুমোতে দিল না।

www.MurchOna.com

কখন যেন ভোর হয়ে গেল, বাতাবীলেবু গাছটায় বসে একটা দাঁড়কাক কেমন করুণ গলায় ডাক শুরু করে দিল, জানলার তার গলে বিছানায় সকালে রোদ আলোছায়ার নকশা কাটা শুরু করে দিল অনি টের পায়নি। কাল রাত্রে মায়ের কাছে শুয়ে অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখেছিল ও। আজ এই সকালে স্বপ্নটা যেন তাকে ছেড়ে যেতে চাইছে না। স্বপ্নটার কথা মনে হতেই ও আর একবার বালিশে মুখ গুঁজে কেঁদে নিল। কাল রাতে মায়ের পাশে শুয়ে শুয়ে সেই মিষ্টি গন্ধটা পেতেই বুকটা কেমন করে উঠেছিল। আজ শেষ রাত, কাল থেকে আর মাকে এমন করে পাব না, এই বোধটা যত বাড়তে লাগল তত চোখ ভারী হয়ে উঠছিল। শেষে ছেলের কান্না শুনে মাধুরী ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কি হল?' অনি অনেকক্ষণ কোন জবাব দেয়নি। মাধুরী অনেক বুঝিয়েছিলেন। অনিকে অনেক বড় হতে হবে, লেখাপড়া শিখতে হবে। এখানে স্বর্গছেঁড়ায় তো ভাল স্কুল নেই। প্রত্যেক ছুটিতে অনি যখন এখানে আসবে তখন নতুন নতুন গল্প শুনবে মাধুরী ওর কাছে। অনি যখন বলল, 'তোমাকে ছেড়ে আমি কি করে থাকব মা', তখন মাধুরীর গলাটা একদম পালটে গেল, 'আমি তো সব সময় তোর সঙ্গে আছি রে বোকা।' অনি হঠাৎ টের পেল ওর বুকের কান্নাটা মায়ের বুকের ভেতর চলে গেছে। আর একটু হলেই মা অনির মত কেঁদে ফেলবে। খুব শক্ত হয়ে গেল অনির শরীর। টানটান করে সিঁটিয়ে শুয়ে রইল। মাকে কষ্ট দিলে মহাপাপ হয়, পিসীমা বলেছে। তারপর সেইভাবে শুয়ে থেকে কখন যে ঘুম এসে গেল ও জানে না। কে যেন তার হাত ধরে হাঁটতে লাগল, তার মুখ সে দেখতে পাচ্ছে না। ক্রমশ তার শরীর বড় হয়ে যেতে লাগল। সে দেখল অনেকেই তার মত হাঁটছে, অজস্র লোক। যে লোকটার সঙ্গে ও যাচ্ছিল সে বলল আগে যেতে হবে, সবার আগে যেতে হবে। অনির মনে হল সবাই এক কথাই ভাবছে। অনি দৌড়তে লাগল। অনেকে পড়ে যাচ্ছে, আবার উঠছে। হঠাৎ অনি দেখল ওর সামনে কেউ নেই, পেছনে হাজার হাজার লোক। কে যেন ফিসফিসিয়ে বলল, 'গলা খুলে চেঁচাও।' ও দেখল ভবানী মাস্টার ওর পেছনে। অনি সমস্ত শরীর নেড়ে ডাক দিল, 'বন্দে মাতরম্'। কানের পর্দা ফেটে যাবার উপক্রম হল সেই ডাকের সাড়ায়। এইভাবে এগোতে এগোতে অনি থমকে দাঁড়াল। সামনেই একটা খাদ, তার তলা দেখা যাচ্ছে না। খাদের কাছে ঝুঁকে অনি বলল, 'বন্দে মাতরম্। সঙ্গে সঙ্গে নিচ থেকে একটা গমগমে গলা বলে উঠল, 'মানে কি?' অনি মানেটা খুঁজতে গিয়ে শুনল নিচ থেকে কে যেন বলছে, 'বোকা ছেলে, আমার কাছে আয়।' অনি অবাক হয়ে দেখল অনেক নিচে মায়ের মুখ, ওর দিকে তাকিয়ে হাসছেন। অনির ঘুম ভেঙে গেল।

এখন এই সকালে ওর মনে পড়ে গেল ভবানী মাস্টার বলে দিয়েছিলেন বন্দে মাতরম্ শব্দের মানে কি! এখন এই মুহূর্তে দাদুর সঙ্গে শহরে যেতে ওর একদম ইচ্ছে করছে না। স্বর্গছেঁড়ার এই বাড়ি, মায়ের গন্ধ, সামনের মাঠের চাঁপা গাছ আর পেছনের ঝিরঝিরে নদীটা ছেড়ে না গেলে যদি বড় না হওয়া যায় তাতে ওর বিন্দুমাত্র এসে যায় না।

তিন-তিনটে লরিতে মালপত্র বোঝাই হচ্ছে। পিসীমা সমস্ত বাড়ি ঘুরে এসে ঠাকুরঘরে ঢুকেছেন। মহীতোষ দাঁড়িয়ে থেকে দেখছেন কুলিরা লরিতে মালপত্র ঠিকঠাক রাখছে কিনা। প্রিয়তোষ দাঁড়িয়ে ছিল বারান্দায়, তাকে লরির ওপর উঠে তদারকি করতে বলে মহীতোষ ঘরে এলেন। সরিৎশেখরের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গিয়েছিল আগেই, এখন যাবার জন্য জামাকাপড় পরে একদম প্রস্তুত। সকাল থেকে অনেকবার তাগাদা দিয়েছেন সবাইকে, বিকেল হয়ে গেলে তিস্তা পেরুতে জোড়া নৌকো পাওয়া যাবে না। সেই সাতসকালে খেয়েদেয়ে বসে আছেন। ঘরভর্তি এখন লোক। স্বর্গছেঁড়া চা-বাগনের বাবুরা তো আছেনই, আশেপাশের বয়স্ক টিম্বার-মার্চেন্টরাও এসেছেন। ঘরে ঢোকার আগে মহীতোষ দেখে এসেছেন সামনের মাঠটা মানুষের মাথায় ভরে গেছে। চা-বাগানের সমস্ত মদেসিয়া-মুণ্ডা-ওঁরাও শ্রমিকরা একদৃষ্টে এইবাড়ির দিকে চেয়ে আছে। ফুটবল মাঠেও এত ভিড় হয় না।

সরিৎশেখর ছেলেকে দেখে বললেন, 'হয়ে গেছে সব?'

মহীতোষ বললেন, 'একটু বাকী আছে।'

সরিৎশেখর বললেন, 'কি যে কর তোমরা, বারোটা পঞ্চাশের পর যাওয়া যাবে না, বারবেলা পড়ে যাবে। তাড়াতাড়ি করতে বল সবাইকে।'

www.MurchOna.com

মহীতোষ ভেতরে এসে দেখলেন মাধুরী একটা ছোট স্যুটকেসে অনির জামাকাপড় ভরে সেটাকে দরজার পাশে রাখছেন। মহীতোষ বললেন, 'অনি কোথায়?'

মাধুরী বললেন, 'এই তো এখানেই ছিল। মোটেই যেতে চাইছে না।'

'যাবার জন্য লাফাচ্ছিল এতদিন, এখন যেতে চাইছে না বললে হবে!' মহীতোষ কেমন বিষণ্ন গলায় বললেন।

'দ্যাখো, যা ভাল বোঝ কর।' বলে মাধুরী ভেতরে চলে গেলেন।

মহীতোষ বাড়ির ভেতরে ছেলেকে পেলেন না। বাগানের দিকে উঁকি মেরে দেখলেন সেখানে কেউ নেই। যাবার সময় হয়ে গেল অথচ ছেলেটা গেল কোথায়। গোয়ালঘরের পেছনে এসে মহীতোষ থমকে দাঁড়ালেন। অনিকে দেখা যাচ্ছে। মাটিতে উবু হয়ে বসে আছে। ডাকতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত না ডেকে নিঃশব্দে পেছনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। এখান থেকে অনির মুখ দেখা যাচ্ছে না বটে কিন্তু ফোঁপানির শব্দটা শোনা যাচ্ছে। এইভাবে নির্জনে বসে ছেলেটাকে কাঁদতে দেখে মহীতোষ কেমন হয়ে গেলেন। সাধারণ ছেলেমেয়ের মত ও চটপটে নয়, কিন্তু ঐ বয়সের ছেলের চেয়ে ওর বুদ্ধিটা অনেক বড়, বেশী রকম বড়। কথা যখন বলে তখন ওর বয়েসের ছেলের মত বলে না। সরিৎশেখর ওকে বেশী স্নেহ করেন, বোধহয় পৃথিবীতে একমাত্র অনিই সরিৎশেখরের মন নরম করতে পারে। এখন ছেলেকে কাঁদতে দেখে মহীতোষের বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। এই একান্নবর্তী পরিবারে ছেলের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আলাদা করে নয়। বলতে গেলে ঝাড়ির সঙ্গে যতটুকু কথা হয় অনির সঙ্গে সেইটুকুই হয়। অনি শহরে চলে যাবে বাবার সঙ্গে, লেখাপড়া শিখবে—এরকম কথা ছিল। কিন্তু এইমাত্র মহীতোষের মনে হল তাঁর ছেলে এখন থেকে তাঁর সঙ্গে থাকছে না।

দুহাত বাড়িয়ে অনিকে কোলে তুলে নিতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন মহীতোষ। উবু হয়ে বসে ফোঁপাতে ফোঁপাতে অনি মুঠোয় করে মাটি তুলছে। ওর সামনে একটা রুমাল পাতা। রুমালটার অনেকটা সেই মাটিতে ভর্তি। ব্যাপারটা কি, ও রুমালে মাটি রাখছে কেন? শেষ পর্যন্ত অনি যখন রুমাল বাঁধতে শুরু করল মহীতোষ নিঃশব্দে পিছু ফিরলেন। ছেলের এই গোপন সংগ্রহ দেখে ফেলেছেন—এটা ওকে বুঝতে দেওয়া কোনমতেই চলবে না। গোয়ালঘর পেরিয়ে এসে উঁকি মেরে দেখলেন অনি উঠে দাঁড়িয়েছে। এক হাতে চোখ মুছছে, অন্য হাতে রুমালের পুঁটলিটা ধরা। আড়াল থেকে মহীতোষ হাঁক দিলেন, 'অনি, অনি।' ছেলের সাড়া না পেয়ে আবার ডাকলেন। এবার খুব আস্তে, ক্ষীণ গলায় অনি সাড়া দিতে মহীতোষ উঁচু গলায় বললেন, 'ওখানে কি করছ! দাদু যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন, তাড়াতাড়ি চলে এস।' কথাটা বলে আর এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন না মহীতোষ।

ঘর থেকে সবাই বারান্দায় নেমে দাঁড়িয়েছে। বাড়ির সামনে দাঁড়ানো লরিগুলোর গা ঘেঁষে মানুষের জটলা। মালপত্র বাঁধা শেষ, প্রিয়তোষ ঘরে ঢুকে সরিৎশেখরকে বলল, 'আর দেরি করবেন না, বেলা হল।'

কথাটা শোনার জন্যই বসেছিলেন সরিৎশেখর, তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে বললেন, 'চলি তাহলে।'

ডাক্তার ঘোষাল বললেন, 'একদম ভুলে যাবেন না আমাদের।'

সরিৎশেখর বললেন, 'সে কি! তোমাকে ভুলব কি করে হে, তুমি যে আমার—' কথাটা বলতে গিয়ে থমকে গেলেন উনি।

এখন এই পরিবেশে ওঁদের সেই চিরকেলে ঠাট্টাটা একদম মানায় না। সরিৎশেখর থেমে গেলেও ডাক্তার ঘোষাল বাকীটুকু মনে মনে জুড়ে নিলেন, 'বউটাকে মেরেছ!'

কথাটা তো নেহাৎ ইয়ার্কি করে বলা, সবাই জানে। ডাক্তার ঘোষালের হাত চট করে সরিৎশেখর জড়িয়ে ধরলেন, 'কিছু মনে করো না ডাক্তার।' ডাক্তার মাথা নাড়লেন।

এবার মহীতোষকে সরিৎশেখর বললেন, 'তোমার দিদি কোথায়?'

মহীতোষ বললেন, 'সবাই রেডি।'

সরিৎশেখর বললেন, 'অনি!'

www.MurchOna.com

গম্ভীর গলায় ডাকটা ভেতরে যেতেই অনির বুকটা কেঁপে উঠল। ভিতরের ঘরে খাটের ওপর মা এবং পিসীমার মধ্যে অনি বসে ছিল। বাগানের অন্য বাবুদের স্ত্রী ও মেয়েরা ভিড় করেছে সেখানে। পিসীমা চলে যাচ্ছে বলে সবাই দেখতে এসেছে। খাটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে বিশু, বাপী। ওদের দিকে তাকাচ্ছে না অনি। ওর চোখ জলে অন্ধ। দ্বিতীয়বার ডাকটা আসতে মাধুরী আঁচল দিয়ে ছেলের চোখ মুছিয়ে দিয়ে বললেন, 'যা।'

কাঁপতে কাঁপতে অনি বাইরের ঘরে এসে দাঁড়াতে সরিৎশেখর নাতিকে আপাতমস্তক্ষ দেখলেন, দেখে হাসলেন, 'কি হয়েছে তোমার?'

ডাক্তার ঘোষাল বললেন, 'বোধ হয় মন খারাপ।'

সরিৎশেখর কি ভাবলেন খানিক, 'তাহলে ও থাক'।

কথাটা শুনেই অনির সমস্ত শরীরে হইচই পড়ে গেল। দাদুর দিকে তাকাতে গিয়ে বাবার গলা শুনল ও, 'না, এখন যাওয়াই ভাল। এখানে তো পড়াশুনা হবে না।'

মুহূর্তে বেলুনটা ফুটো হয়ে সব হাওয়া হুস করে বেরিয়ে গেল যেন। সরিৎশেখর ডাকলেন 'হেম!'

অনি অবাক হয়ে দেখল পিসীমা ঠাকুরের মূর্তিটা পুঁটলিতে নিয়ে দরজায় এসে দাঁড়ালেন। পিসীমাকে এখন অদ্ভুত দেখাচ্ছে। মাথায় ঘোমটা, গরদের কাপড়ের ওপর সাদা চাদর। মহীতোষও দিদিকে দেখছিলেন। দিদির ভাল নাম যে হেমলতা তা যেন খেয়ালই ছিল না। সরিৎশেখর অনেকদিন পর দিদির নাম ধরে ডাকলেন। এই স্বর্গছেঁড়ায় সবার কাছে উনি দিদি বা বড়দি। হেম বলে ডাকার লোক খুব বেশী নেই।

সরিৎশেখর বললেন, 'হেম, এই ছেলেটিকে আমরা নিয়ে যাচ্ছি, আজ থেকে এর সব ভার তোমার ওপর, যদ্দিন ও কলেজে না ওঠে। মনে থাকবে তো?'

পিসীমাকে ঘোমটার মধ্যে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতে দেখল অনি, 'আপনি যা বলবেন।'

সরিৎশেখর এবার মাধুরীকে ডাকলেন। ঘরে আর কেউ কোন কথা বলছে না। মাধুরী এসে হেমলতার পাশে দাঁড়াতে সরিৎশেখর বললেন, 'বউমা, আমি চললাম। এখানে আর আমার পিছুটান নেই। তোমাকে আমি পছন্দ করে আমাদের সংসারে এনেছিলাম, এই সংসারের ভার তোমার ওপর দিয়ে যাচ্ছি। আর মা, তোমার পুত্রটিকে আমার হাতে দিতে তোমার আপত্তি নেই তো?'

মাধুরী ঘাড় নাড়লেন। সরিৎশেখর বললেন, 'ঠিক আছে, তুমি দেখো, এই কাঁচা সোনাকে কিভাবে পাকা সোনা করে ফিরিয়ে দিই।' কথাটা বলে অনিকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন সরিৎশেখর। অনি দেখল মা এক হাতে ঘোমটা ঠিক করতে গিয়ে শাড়ির পাড় চোখের তলায় চেপে রাখল।

হে সাহেব চেয়েছিলেন যে, সরিৎশেখর প্রাইভেট কারে শহরে যান। কিন্তু সরিৎশেখর রাজী হননি। লরির সামনে ড্রাইভারের পাশে তো অনেক জায়গা আছে, আলাদা করে গাড়ির দরকার নেই। মহীতোষ বারান্দায় এসে দেখলেন কুলি-সর্দাররা সব সামনে দাঁড়িয়ে, পেছনে অনেক মুখ।

মহীতোষের পেছনে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে সরিৎশেখর এসে দাঁড়াতেই একটা গুঞ্জন উঠল। সরিৎশেখর কিছুটা বিব্রত হয়ে সামনে তাকালেন। একজন সর্দার এগিয়ে এল, এসে সরিৎশেখরের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে চিৎকার করে উঠল, 'কাঁহা যাতিস রে মো সব ছোড়কে?'

সরিৎশেখর বললেন, 'কেন?'

লোকটা তেমনি চিৎকার করে বলল, 'কিনো? এখানে থাক, আমাদের বাবা হয়ে থাক, তোকে আমরা যেতে দেব না।' সঙ্গে সঙ্গে আর একজন সর্দার চিৎকার করে উঠলো, 'বাবা যাবেক নাই।' আর সেই একটা গলার সঙ্গে সমস্ত মাঠ গলা মেলাল। সরিৎশেখর দেখলেন বকু সর্দার ওদের মধ্যে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আছে সেরাও। এদের প্রায় প্রত্যেককে কয়েকটা ছেলেছোকরা বাদে তিনি চেনেন। চিৎকার সামনে বাড়ছিল। মহীতোষ সরিৎশেখরকে বললেন, 'কি ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছি না, কি করবেন?

ডাক্তারবাবু, বললেন, 'আমি দেখছি।' তারপর সামনে এগিয়ে তিনি হাত উঁচু করে সবাইকে থামতে বললেন, "চিৎকারটা কমে এল। ডাক্তারবাবু বললেন, 'তোরা বাবাকে যেতে দিবি না বলছিস কিন্তু বাবার যে চাকরি নেই—তা জানিস?'

www.MurchOna.com

একজন সর্দার বলল, 'এই চা-বাগান বাবা তৈরি করেছে, বাবা যতদিন জীবিত থাকবে তাকে চাকরি করতে দিতে হবে।' সঙ্গে সঙ্গে তার সমর্থনে আওয়াজ উঠল।

এবার সরিৎশেখর বারান্দা থেকে নেমে সর্দারদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে সবাই তাঁকে ঘিরে ধরল। সরিৎশেখর সামনের কালো কালো বিচলিত মুখগুলোর দিকে তাকালেন, 'আমাকে তোরা যেতে দে। সারাজীবন তো চাকরি করলাম, একটু বিশ্রাম চাই রে।'

একজন সর্দার বলল, 'আমাদের কে দেখবে? কার কাছে যাব?'

সরিৎশেখর বললেন, 'আরে বোকা, এখন তোরা স্বাধীন, এখন ভয় কি? তোদের চার-পাঁচজন মিলে একটা দল কর। সবাই সেই দলকে সুবিধে-অসুবিধে জানাবে। ঐ দলই সাহেবের সঙ্গে কথা বলে দাবি আদায় করবে, ব্যাস।'

সর্দাররা সবাই মুখ-চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। হঠাৎ বকু সর্দার এগিয়ে এসে সরিৎশেখরের পায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কোন কথা নয়, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে সেটা সংক্রামক রোগের মত ছড়িয়ে পড়ল অন্য মুখগুলোতে। সরিৎশেখর এই সব সরল মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার করলেন যে তাঁর নিজের চোখের আগল কখন খুলে গেছে, বয়স্ক শুকনো গালের চামড়ার ওপর ফোঁটা ফোঁটা জলবিন্দু পড়ায় অদ্ভুত শান্তি লাগছে। অথচ কোন শোক তাঁকে কাঁদাতে পারেনি এতদিন।

হয়তো কান্নার জন্যেই প্রতিরোধ নরম হয়ে সরে গেল। অনি দেখল পিসীমা মাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন। ঝাড়িকাকু এবং প্রিয়তোষ লরির ওপর উঠল। মহীতোষ প্রথমে লরির সামনে ড্রাইভারের পাশে অনিকে তুলে দিলে হেমলতা তার পাশে উঠে বসলেন। সরিৎশেখর ঐ সব বোবা মুখের দিকে তাকিয়ে লরিতে উঠতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। ভিড় কাটিয়ে বিলাস ছুটে আসছে। সরিৎশেখরের হাতে একটা বিরাট মিষ্টির হাঁড়ি ধরিয়ে দিয়ে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল সে। সরিৎশেখর হাঁড়িটা অনির হাতে দিতেই একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়ে গেল। দুজন সর্দার ফিসফিস করে কি বলে মাথার পাগড়ী সরিৎশেখরের পায়ের সামনে টানটান করে ধরে থাকল। আর কয়েকশ' মানুষ এগিয়ে এসে এক আনা, দু আনা, লাল পয়সা, ফুটো পয়সা ফেলতে লাগল তাতে। ডাক্তার ঘোষাল, মালবাবু, মনোজ হালদাররা সব দাঁড়িয়ে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখছে। ক্রমশ কাপড়টার মাঝখানে পয়সা উঁচু হচ্ছিল।

সরিৎশেখর অদ্ভুত গলায় বললেন, 'ডাক্তার, তোমরা ফেয়ারওয়েলের কথা বলেছিলে না, পৃথিবীতে কেউ এর চেয়ে বড় ফেয়ারওয়েল পেয়েছে?"

মহীতোষ সঙ্গে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মাধুরী একা থাকবে বলে সরিৎশেখর নিষেধ করেছেন। সঙ্গে তো প্রিয়তোষ যাচ্ছেই, কোন অসুবিধে হবে না। তাছাড়া দুদিন আগে লোক পাঠিয়ে জলপাইগুড়ির বাড়ি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করিয়ে নিয়েছেন। ঘড়ি দেখলেন তিনি, আর একদম সময় নেই। ড্রাইভার উঠে বসল, তার পাশে অনি। অনির পাশে হেমলতা, তাঁর গায়ে দরজার ধারে সরিৎশেখর কোলে খুচরা পয়সার পুঁটলিটা নিয়ে বসে আছেন।

ড্রাইভারকে স্টার্ট নেবার ইঙ্গিত করতে যেতেই সরিৎশেখর টের পেলেন গাড়িটা দুলছে। তারপর গাড়িটা একটু একটু করে চলতে শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার উঠল, 'বাবা যায়—ধেউসি রে, আউড় থোড়া—ধেউসি রে।' ড্রাইভার অসহায়ের মত বসে রইল স্টিয়ারিং ধরে, গাড়ি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে ওরা। দুজন সর্দার পাদানির ওপর লাফিয়ে উঠে অন্যান্যকে নির্দেশ দিতে লাগল ঠেলার জন্য। ক্রমশ মাঠ পেরিয়ে লরি আসাম রোডে পড়ল। পিছনের গাড়িটাকে কেউ ঠেলছে না, কিন্তু সেটাও স্পীড নিতে পারছে না এই লরির জন্য।

অনি দেখছিল সামনের কাঁচের ওপর একটা হনুমানের ছবি, এক হাতে পাহাড় বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, বুকে রাম সীতার ছবি। কাঁচের ওপাশে আকাশ। ভাল করে দেখার জন্য উঠে দাঁড়াতেই ওর নজরে পড়ল ওদের লরির সঙ্গে বাগানের কুলিরা হেঁটে যাচ্ছে রাস্তা জুড়ে। সামনের দিক থেকে আসা গাড়িগুলো রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে গেছে পর পর। সবাই হর্ন দিচ্ছে কিন্তু কেউ তাতে কান দিচ্ছে না। হঠাৎ অনির নজরে পড়ল রাস্তাটা যেখানে বাঁক দিয়েছে সেই বিরাট বটগাছের তলায় মুখ উঁচু করে রেতিয়া দাঁড়িয়ে আছে। কাছাকাছি হতে অনি চিৎকার করে উঠল, 'রেতিয়া!' সঙ্গে সঙ্গে সরিৎশেখর আর হেমলতা ওর দিকে অবাক হয়ে তাকালেন। কিন্তু অনির সেদিকে নজর নেই। ও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে রেতিয়ার অন্ধ

www.MurchOna.com

চোখ দুটোর পাতা যেন কেঁপে উঠল। ঠোঁট দুটো গোল হয়ে যেন কিছু বলল। কি বলল সেটা সম্মিলিত চিৎকারে শোনা গেল না। ক্রমশ সামনের কাঁচের মধ্যে থেকে রেতিয়ার মুখ মুছে গেলে অনির বুকের মধ্যে অনেকক্ষণের জমা কান্নাটা ছিটকে বেরিয়ে এল। হেমলতা এক হাতে ঠাকুরের পুটুলি সামলে অন্য হাতে অনিকে বুকে টেনে নিলেন।

সরিৎশেখর ক্রমশ অস্থির হয়ে উঠছিলেন। এভাবে লরি ঠেলে ওরা কদ্দুর যাবে? যেভাবে ওরা যাচ্ছে তাতে উৎসাহ ভাঁটা পড়ার কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। পাশের পাদানিতে দাঁড়ানো সর্দারকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কদ্দুর যাবি তোরা?' খুব যেন উৎসাহ হচ্ছে এই রকম মেজাজে সে জবাব দিল, 'তোর ঘর তক্।'

বলে কি! জলপাইগুড়ি অবধি পায়ে হেঁটে ওরা হয়ত যেতে পারে কিন্তু তাতে তো মাঝরাত হয়ে যাবে। সরিৎশেখর ড্রাইভারকে স্টার্ট নিতে ইঙ্গিত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভট ভট করে ইঞ্জিনটা হঙ্কার ছাড়ল। সরিৎশেখর দেখলেন শব্দ শুনে সামনের লোকজন লাফ দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়াল। সেই সুযোগের ড্রাইভার স্পীড্ বাড়িয়ে দিল চটপট, মুহূর্তে জনতা চিৎকার করে উঠল, কিন্তু ততক্ষণে ওঁরা অনেক দূরে চলে এসেছেন। পিছনের গাড়িটাও বোধ হয় সেই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল, সরিৎশেখর দেখলেন সেটাও পিছন পিছন আসছে। ডুডুয়া নদীর পুলের কাছে এসে সরিৎশেখরের খেয়াল হল সর্দার দুজন এখনও পাদানিতে দাঁড়িয়ে আছে। আর আশ্চর্য এই যে, গাড়ি ছুটে যাচ্ছে ওদের নিয়ে—এতে কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই যেন; হাসি হাসি মুখ করে ছুটন্ত গাড়ির হাওয়া মুখচোখে মাখছে দু'জন।

গাড়ি থামাতে বললেন, সরিৎশেখর। তারপর নিচে নেমে সর্দার দুটোকে ডাকলেন। ওরা মাথা নিচু করে কাছে আসতে বললেন, 'এবার তোরা যা, আর এই টাকাগুলো রাখ। লাইনের লোকজনকে আজ রাত্রে আচ্ছাসে ভোজ দিবি।' পকেট থেকে কয়েকটা দশটাকার নোট বের করে ওদের হাতে গুঁজে দিলেন তিনি। সর্দার দুটো চকচকে নতুন নোট হাতে নিয়ে কি করবে বুঝতে পারছিল না। সরিৎশেখর আর সুযোগ দিলেন না ওদের, গাড়িতে উঠে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

তাঁর সারাজীবনের স্মৃতি বুকে নিয়ে স্বর্গছেঁড়া ক্রমশ পেছনে চলে যেতে লাগল।

॥ ২ ॥

অবসর-জীবন কিভাবে কাটাবেন সরিৎশেখর কোনদিন চিন্তা করেননি। সেই কোন ছেলেবেলায় চা-বাগানে ঢুকে পড়ার পর এতটা কাল হু-হু করে কেটে গেল, নিঃশ্বাস ফেলার সময় পাননি। চাকুরির মেয়াদ ফুরিয়ে আসার মুখে ভেবেছিলেন কর্মহীন অবস্থায় এই তল্লাটে আর থাকবেনই না। আজ ডুয়ার্সের সব লোক তাঁকে একডাকে চেনে যেজন্যে সেটা ক্ষয়ে যাবে বেকার ক্ষমতাহীন হয়ে বসে থাকলে। তার চেয়ে কলকাতার কাছে গঙ্গার ধারে বাড়ি নিলে বেশ হয়, এরকমটা ভাবতে শুরু করেছিলেন। হেমলতা বলেছিলেন, 'যদি এ দেশ ছেড়ে যেতেই হয় তো দেশে চলুন।' দেশ বলতে সরিৎশেখর অবাক হয়েছিলেন, আজ প্রায় কুড়ি বছর তিনি নদীয়ার সেই গন্ডগ্রামে পা বাড়ান নি, পিতা ষষ্ঠীচরণ দেহ রাখার পর সে ভিটেতে খুড়তুতো ভাইরা ধুঁকছে। নিজের একটা দেশ আছে এই বোধটা কবেই চলে গেছে। বোধ হয় বড় বউ চলে যাবার পর থেকেই দেশ সম্পর্কে মায়া-মমতা তাঁর নেই। তাছাড়া এতটা কাল সাহেবসুবোদের সঙ্গে কাটিয়ে ঐ গ্রামের জীবন তাঁর পোষাবে না। দেশ শব্দটা তাই তাঁর মনে পড়ে না। অথচ হেমলতা কি সহজে দেশ বলল আবেগ-আবেগ গলায়। বেচারা তো কখনো সে গ্রাম চোখেই দ্যাখেনি। বাবার ইচ্ছের কথা শুনে মহীতোষ বেঁকে বসল, 'আমাদের ছেড়ে আপনি অতো দূরে চলে যাবেন—এ হয় না। আপনি যখন রিটায়ার করে আমার সঙ্গে থাকবেনই না, তাহলে অন্তত কাছাকাছি থাকুন। সাপ্লায়ারদের বললে জলপাইগুড়িতে একটা জমির ব্যবস্থা হয়ে যাবে। বিপদে আপদে আমরা যেতে পারবো। কিন্তু কোলকাতায় আপনি তিষ্ঠোতে পারবেন না, আর কিছু একটা হয়ে গেলে আমরা আফসোসে মরে যাব।' কথাগুলোকে খুব একটা পাত্তা দিচ্ছিলেন না সরিৎশেখর। শেষ পর্যন্ত বউমা বললেন 'বাবা, আপনি চলে গেলে অনির কি হবে? ও কার কাছে পড়াশুনা করবে?"

ব্যাস হয়ে গেল। সরিৎশেখর জলপাইগুড়ি শহরে জমি কিনলেন। মাত্র দু-হাজার টাকায় শহরের ওপরে জমিসমেত দুটো কাঁঠাল গাছ, একটা আম আর অজস্র সুপুরি। এছাড়া একটা টিনের চালওয়ালা দু-ঘরের মাথা গোঁজার আস্তানা, যেটায় দিব্যি থাকা যায় কিছুদিন।

www.MurchOna.com

জমিটা রেজিস্ট্রী হয়ে গেলেই তিনি বড় ছেলে পরিতোষকে পাঠিয়ে দিলেন। এই ছেলে তাঁর রাতের ঘুম দিনের স্বস্তি কেড়ে নিতে যথেষ্ট। অনেক ঘাট ঘুরে সরিৎশেখরের অনেক পয়সা আজেবাজে ব্যবসায় নষ্ট করে একজন কাঠের কন্ট্রাক্টরের কাছে পড়েছিল। সরিৎশেখর তাকে কাজে লাগাতে চাইলেন। মিউনিসিপ্যালটি থেকে প্ল্যান মঞ্জুর হয়ে গিয়েছিল বাড়ির। দোতলার ভিত হবে, পাঁচটা শোবার ঘর, একটা হল বসার ঘর, কিচেন, দুটো বাথরুম, একটা ডাইনিং স্পেস, মেয়েদের গল্প করার জন্য বেশ বড় ঠাকুরঘর। ম্যাকফার্সন সাহেবের সঙ্গে বসে বাড়ির প্ল্যান করা হল। ঘুপচি ঘর নয়, দক্ষিণের বাতাস যেন চিরুনির মত সমস্ত বাড়িটার মধ্যে দিয়ে বয়ে যেতে পারে এরকমভাবে জানলা দরজা বানানো হবে। পরিতোষ শহরে এসে বাড়ির তদারকি করবে দাঁড়িয়ে থেকে। কন্ট্রাক্টরকে বিশ্বাস নেই সরিৎশেখরের। এদের কাজকর্ম তো বাগানের বিভিন্ন ব্যাপারে অষ্টপ্রহর দেখছেন। কাজ যদি সঠিক হতো তাহলে পুজো বা ক্রীসমাসে এত ভেট দিতে হতো না। সরিৎশেখর নিজের বাড়ির তৈরী করতে গিয়ে কন্ট্রাক্টরের ভেট চান না।

বাড়ি করার আগে সরিৎশেখর পরিতোষকে নিয়ে এক সকালে শহরে এলেন। পরিতোষের ইচ্ছা সে নিজেই মিস্ত্রী যোগাড় করে প্ল্যানমাফিক বাড়ি বানাবে—সরিৎশেখর একেবারে গৃহপ্রবেশ করবেন। কিন্তু ছেলের কথায় তাঁর আজকাল খুব ভরসা নেই। শহরে সরিৎশেখরের দেশের গাঁয়ের একজন আছেন যাঁকে তিনি বন্ধুর মত বিশ্বাস করেন—সেই সাধুচরণ হালদারের বাড়িতে পরিতোষ প্রথমটা আসতে চায়নি। কিন্তু সরিৎশেখর যখন সেখানে যাবেনই পরিতোষকে বাধ্য হয়ে সঙ্গী হতে হল।

রায়কতপাড়ায় ঢুকতেই সাধুচরণের কাঠ-সিমেন্ট-মেশানো দোতলা বাড়ি। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় নদীয়া জেলার যেসব মানুষ পাকাপাকি বাস করছেন তাঁদের নাড়ীনক্ষত্র সাধুচরণের জানা। দেশের খবরাখবর এবং ছেলেমেয়েদের বিয়ের সম্বন্ধের জন্য তাঁরা সাধুচরণের শরণাপন্ন হন। কদমতলায় ওঁর বিরাট স্টেশনারি দোকান এককালে রমরম করত। স্যার আশুতোষের মত গোঁফ তখনো কুচকুচে কালো, সরিৎশেখর শহরে এলেই দোকানে কিছুক্ষণ কাটিয়ে যেতেন। তা এখন বয়স হয়েছে সাধুচরণের, দুই ছেলে দোকানে বসে। বাড়ি বসে বন্ধকী কারবার করেন তিনি। সরিৎশেখর জিজ্ঞাসা করায় বলেছিলেন, কিছু একটা নিয়ে থাকতে হবে তো!

পরিতোষের এ বাড়িতে আসতে না চাওয়ার পেছনে যে কারণটা সেটা সরিৎশেখর জানেন। সাধুচরণের স্ত্রী এবং কন্যা উন্মাদ। স্ত্রী যতটা কন্যা তার দ্বিগুণ। বিবস্ত্র হয়ে যাতে না থাকে সেজন্যে পা অবধি ঝুল এবং তলায় বোতাম আঁটা এক ধরনের অর্ডারী সেমিজ মেয়েকে পরিয়ে রাখেন সাধুচরণ। মেয়েটি চিৎকার চেঁচামেচি করে না, কামড়ায় না। শুধু অঙ্গভঙ্গী করে এবং শব্দ না করে হাসে। পরিতোষ এর আগে দেখেছে সাধুচরণ মেয়েটাকে বারান্দার এক কোণে চেয়ারে বসিয়ে তার খানিক তফাতে নিজে বসে অতিথির সঙ্গে কথা বলেন। সাধুকাকার সঙ্গে কথা বলতে বলতে তার চোখ মেয়েটার দিকে যেতে সে শিউরে উঠেছিল। অত কুৎসিত করে কোন মেয়ে নিঃশব্দে হাসতে পারে সে জানতো না। আর তার ঐ প্রতিক্রিয়া দেখে সাধুচরণ খুব মজা পাচ্ছেন—সেটা পরিতোষ বেশ টের পাচ্ছিল। বোধ হয় মেয়েকে সামনে বসিয়ে অতিথিদের নার্ভের ওপর একটা প্রেসার সৃষ্টি করে ভদ্রলোক তাকে নিয়ে খেলা করেন। সেদিন সাধুচরণের স্ত্রী এসে তাকে চা দিয়েছিল। নিশ্চিত ভদ্রমহিলা সেদিন কিছু সুস্থ ছিলেন। তবে তাঁর চোখ মুখ অসম্ভব লাল দেখাচ্ছিল। পরিতোষ শুনেছে ভদ্রমহিলা মাঝে মাঝে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যান, তখন তাঁকে ঘরবন্দী করে রাখা হয়—আবার টপ করে সুস্থও হয়ে যান। পরিতোষ এও শুনেছে এক জ্যোতিষী হাত দেখে বলেছে বিয়ে দিলে মেয়ের এই পাগলামি সেরে যাবে। কিন্তু সাধুচরণ নদীয় জেলায় সে ধরনের পাত্রের সন্ধান পাচ্ছেন না।

তবু সরিৎশেখরের সঙ্গে পরিতোষকে আসতেই হল। রিকশায় চড়া সরিৎশেখর একদম পছন্দ করেন না। লাঠি হাতে লম্বা শরীরটা নিয়ে যখন হন হন করে হেঁটে যান, তখন তাঁর সঙ্গে পাল্লা দেওয়া মুশকিল। তাছাড়া বাবার সঙ্গে হাঁটতে পরিতোষের ভীষণ অস্বস্তি হয়—ইচ্ছে করে পিছিয়ে পড়ে এমনভাবে সে হাঁটে যেন সরিৎশেখর তার কেউ না।

সাধুচরণ হালদার বাড়িতেই ছিলেন। সরিৎশেখরের গলা শুনে হাত জোড় করে হাসতে হাসতে অভ্যর্থনা জানালেন। চেয়ারে বসতে বসতে সরিৎশেখরের প্রথম কথা হল, 'বসো হে সাধু, তোমার সঙ্গে কথা আছে। আর হ্যাঁ, মেয়েটাকে আজ বাইরে আনার দরকার নেই।'

www.MurchOna.com

সাধুচরণ ঘাড় নাড়লেন, 'না, না, আপনারা নিশ্চিন্তে বসুন, তাকে বাইরে আনার দরকার হবে না।'

পরিতোষ বারান্দার একপাশে দাঁড়িয়ে ভ্রু কুঁচকালো। সরিৎশেখর খানিক অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন, আনতে হবে না কেন?'

'আজ্ঞে, ডাক্তার বলেছে ও আর বেশী দিন বাঁচবে না। আজন্ম শুনে এলাম পাগলরা দীর্ঘজীবী হয়—কিন্তু এ মেয়ে নাকি বড়জোর মাসখানেক। কথা তো কোনকালেই বলে না—এখন মুখে গ্যাঁজলা উঠছে, বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না। যাক বাবা, যত শীঘ্র যায় ততই মঙ্গল। কি বলেন?

সরিৎশেখর অন্যমনস্ক গলায় বললেন, 'তবু তো তোমার মেয়ে হে।'

মাথা নাড়লেন সাধুচরণ, 'না, না। বাপ তো মেয়েকে সৎপাত্রে দান করতে পারলে বেঁচে যায়—তা ওর ক্ষেত্রে মৃত্যু হল সৎপাত্রে দান। এ ব্যাপারে আপনি বিন্দুমাত্র চিন্তিত হবেন না। এখন বলুন আগমনের উদ্দেশ্যটা কি?'

সরিৎশেখর বাড়ি বানাবার কথা বললেন। যেহেতু তিনি শহরে থাকতে পারছেন না তাই সাধুবাবুর সাহায্য নিতে চান। ভাল রাজমিস্ত্রী যোগাড় করে দেওয়া তো সাধুবাবার কাছে কোন সমস্যা নয়। ইট-ভাটায় খবর দিয়ে গরুর গাড়ি করে ইট আসবে—সিমেন্টের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আর ঐ এলাহী কাজকর্ম ঠিক হচ্ছে কিনা দেখার জন্য পরিতোষ থাকল। সাধুকাকাকে দেখতে হবে পরিতোষ ঠিকমত কাজকর্ম দেখাশোনা করছে কিনা। সরিৎশেখর মাঝে মাঝে এসে দেখে যাবেন।

সাধুচরণ চুপচাপ শুনলেন, তারপর বললেন, 'আপনি শহরে এসে আমাদের সঙ্গে থাকবেন, দুবেলা দেখা পাব—এ তো আমাদের সৌভাগ্য। সব ব্যবস্থা করে দেব। রহমৎ মিয়া আছে—খুব গুণী মিস্ত্রি—ওর ওপর ভার দিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে বসে থাকতে পারেন। সে সব কিছুতেই আটকাবে না। আমি ভাবছি আপনার পুত্র আহারাদি করবে কোথায়?'

পরিতোষ চমকে উঠে কিছু বলতে চাইলে সরিৎশেখর হাত নেড়ে তাকে থামিয়ে দিলেন, 'কোন হোটেলের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে নিলেই হবে। কিং সাহেবের ঘাটে এখন তো অনেক পাইস-হোটেল হয়েছে।'

সাধুচরণ বললেন, 'দুদিনেই পেটের বারোটা বেজে যাবে। তার চেয়ে ও আমার এখানেই থাকা-খাওয়া করে কাজকর্ম দেখতে পারে। আমার সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ হবে।'

কিন্তু পরিতোষ বাইরে বেরিয়ে এসে প্রায় বিদ্রোহ করে বসল। সাধুচরণের বাড়িতে সে মরে গেলেও থাকবে না। দু-দুটো পাগলকে দিনরাত দেখার মত নার্ভ তার নাকি নাই। সাধুচরণের বউকে যদিও সহ্য করা যায়, কিন্তু মেয়েকে অসম্ভব। তার চেয়ে সে নিজে হাত পুড়িয়ে ভাতে ভাত রেধে খাবে। বাবার দিক থেকে উল্টো-মুখো হয়ে সে বলল, 'আপনি এ ব্যাপারে একদম চিন্তা করবেন না বাবা।'

সরিৎশেখরেরও সাধুচরণের কথাটা ভাল লাগেনি। হয়তো সে খোলা মনেই বলেছে। তবু একটা সোমত্থ মেয়ে রয়েছে বাড়িতে, হোক না পাগল, সোমত্থ তো, সেখানে পরিতোষের মত দুর্নামযুক্ত একটা ছেলেকে বাড়িতে রাখার প্রস্তাব—কেন যেন মনে সন্দেহ এনে দেয়। ঠিক হল, পরিতোষ নিজেই খাবার ব্যবস্থা করবে, টিনের ঘরটাকে বসবাসের উপযুক্ত করে দিয়ে গেলেন সরিৎশেখর। রহমৎ মিঞা কাজ করবে লোকজন নিয়ে—সরিৎশেখর সপ্তাহে একদিন এসে টাকা-পয়সা দিয়ে যাবেন পুত্রকে। কোন সমস্যা দেখা দিলে পরিতোষ সাধুচরণের পরামর্শ নেবে। খুব ঠেকায় না পড়লে যেন টাকা-পয়সা না নেয়।

ভিত খোঁড়া হল। প্ল্যানমাফিক কাজ এগোতে লাগল। ভিত-পুজোটুজোর ব্যাপার করলেন না সরিৎশেখর। প্রথম দিকে তরতর করে কাজ চলতে লাগল। সরিৎশেখর সন্তুষ্ট, ছেলের পরিবর্তন হয়েছে দেখে খুশী হলেন। সাধুচরণও পরিতোষের প্রশংসা করেন। সারাদিন রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে থেকে মজুরদের কাজ করায়। ক্রমশ সরিৎশেখর ছেলেকে বিশ্বাস করতে লাগলেন। লোক মারফৎ টাকা পাঠান, চা-বাগানের কাজ ফাঁকি দিয়ে ঘন ঘন শহরে আসা সম্ভবও হয় না। যেভাবে কাজ চলছে পুরো বাড়ি শেষ হতে মাস দুয়েক লাগার কথা নয়। এখনও রিটায়ার করতে দেরি আছে। তবে সরিৎশেখর ঠিক করলেন ভাড়াটাড়া দেবেন না।

www.MurchOna.com

এমন সময় সাধুচরণের একটা চিঠি পেলেন সরিৎশেখর। শনিবার সন্ধ্যোনাগাদ চলে আসুন, দিনমানে অবশ্যই নয়। আমার গৃহে তো থাকবেন না তাই রুবি বোর্ডিং-এ আপনার ব্যবস্থা করতে পারি। আসা আপনার প্রয়োজন কারণ আপনার পুত্রের সঙ্গে আপনার ভবিষ্যৎ এক্ষেত্রে জড়িত হয়ে পড়েছে।

মাথায় রক্ত উঠে গেল সরিৎ শেখরের। অতীতের অনেক অপকর্মের নায়ক নিজের ছেলেকে তিনি জানেন। শনিবার পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন না। বিকেলের ডাকে চিঠি পেয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সাহেবকে বলে একটা গাড়ি যোগাড় করে শহরে রওনা হলেন। যাবার সময় মহীতোষকেও কিছু বললেন না। শহরে এসে প্রথমে ভাবলেন সাধুচরণের কাছে যাবেন কিনা। তারপর ঠিক করলেন নিজেই ব্যাপারটা দেখবেন আগে। সাধুচরণের চিঠির ভাষা খুবই সন্দেহজনক—সরিৎশেখর একটা বিশ্রী গন্ধ পাচ্ছেন তাতে—আর তাই সাক্ষী রাখা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছিল অনেকক্ষণ। তিস্তা নদীর গায়ে যে মাটির রাস্তা সেনপাড়ার দিকে চলে গিয়েছে, সেখানে গাড়ি রেখে ড্রাইভারকে চুপচাপ বসে থাকতে বললেন। গাড়ি থেকে নেমে ওঁর খেয়াল হল উত্তেজনায় আসবার সময় কাশ্মীরী লাঠিটা সঙ্গে আনতে ভুলে গেছেন। সামনে অনেকটা খোলা মাঠ অন্ধকারে ঢাকা—অনেক দূরে টিনের ঘরের সামনে হ্যারিকেন জ্বলছে মিটমিট করে। কি মনে করে সরিৎশেখর গাড়ির হ্যান্ডেলটা লাঠির মত বাগিয়ে মাঠ ভাঙতে লাগলেন।

জাল তারের বেড়া দিয়ে সমস্ত জমিটা ঘিরে রাখা হয়েছিল। এদিকটা দিয়ে বাড়ির মালমশলা আনবার জন্য একটা ছোট টিনের গেট করা আছে। সরিৎশেখর গেট খুলে ভেতরে ঢুকলেন।

ঢুকতেই তিনি বড় ছেলের গলা শুনতে পেলেন। এলোমেলো গলায় সায়গলের গান গাইছে। গানের গলাটা তো বেশ ভাল! ছেলের গান কোনদিন শোনেন নি তিনি। হঠাৎ মনে হল ওকে যদি গান শেখানো যেত, তাহলে নাম করতে পারতো। কিন্তু গলাটা স্থির থাকছে না কেন! কয়েক পা এগোতেই নতুন বাঁধাই কুয়োটার পাশে এসে দাঁড়ালেন। ভিত খোঁড়ার পর এই কুয়োটা হয়েছে। খাবার জল নয়—বাড়ির কাজে জল দরকার বলে এটা খোঁড়া। অগভীর। অন্ধকার হালকা করে অনেক তারা উঠে এল আকাশটায়। সরিৎশেখর কুয়োর দিকে তাকাতে অবাক হলেন। বেশ কিছুটা নিচে অন্ধকারেও যেন কিছু চিক-চিক করছে। জল নয় অবশ্যই। হাতের লোহার হ্যান্ডেলটা নিচে নামিয়ে দিতেই ঠক্ করে শব্দ হল। জোরে চাপ দিতে মচ্ করে ভেঙে গেল। সরিৎশেখর বুঝলেন ওটা কাঁচ। এত কাঁচে কুয়ো ভর্তি হবে কেন? নাকি এ কুয়োর জল পায় না বলে ওরা অন্য কুয়ো খুঁড়েছে? বোধ হয় এটাতে আবর্জনা ফেলে আজকাল। কিন্তু এগুলো কিসের বোতল?

কিছুক্ষণ বাদেই গান শেষ হল। আর সঙ্গে সঙ্গে আড়ষ্ট হয়ে সরিৎশেখর শুনলেন দুটি স্ত্রী-কণ্ঠে প্রবল উল্লাসের ঝড় উঠল। একটি কণ্ঠ মাতাল গলায়, 'তুমি মাইরি নাগর ভালই গাও, এসো তোমার গলায় একটা চুমু খাই।' বলে খিলখিল করে উঠল।

সরিৎশেখর আর স্থির থাকতে পারলেন না। দ্রুতপায়ে নিচে বারান্দায় উঠে এসে লোহার হ্যান্ডেলটা দিয়ে দরজায় ঠেলা দিলেন। ভেজানো ছিল দরজাটা, হাট করে খুলে গেল। দুটো ঘরের মধ্যে এটাই একটু বড়। ঘরের মধ্যিখানে একটা জলচৌকির ওপর দুটো বড় মোমবাতি জ্বলছে। দরজাটা খুলল বলে মোমবাতির শিখা দুটো থর থর করে কাঁপছে এখন। সরিৎশেখর দেখলেন পরিতোষ একটা বালিশ পেটের নিচে নিয়ে একটা কদাকার মেয়ের কোলে মুখ রেখে শুয়ে আছে। মেয়েটি হাতের গেলাস থেকে মাঝে মাঝে নিজে নিচ্ছে আবার পরিতোষকে মদ খাওয়াচ্ছে। আর একটা বয়স্কা মোটা মেয়েছেলে পরিতোষের পায়ের কাছে বসে ওর গোড়ালি টিপছে।

দরজাটা খুলে যেতেই বয়স্কা মেয়েছেলেটি প্রথম ওঁকে দেখতে পেল, তারপর গলা দুলিয়ে বলল, 'কে এলে গো, লতুন নাগর?'

সরিৎশেখর প্রথমে উত্তেজনায় বলতে পারছিলেন না। থর থর করে ওঁর দেহ কাঁপছিল। কোনরকমে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গর্জে উঠলেন, পরিতোষ!' বাবার গলা শুনে নেশাগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও পরিতোষ তড়াক করে উঠে বসল। অন্ধকারে মোমবাতির আলোয় পুরোটা দেখা যায় না, তাই দরজায় দাঁড়ানো সরিৎশেখরকে মোমবাতির মাথা ডিঙিয়ে অস্পষ্ট ছায়া-ছায়া দেখল সে।

www.MurchOna.com

সরিৎশেখর তখন এক-পা এগিয়েছেন, 'হারামজাদা, বদমাস, কুলাঙ্গার'—কথা বলতে বলতে হাতের হ্যান্ডেলটা শূন্যে আস্ফালন করে সজোরে পুত্রের দিকে ঘোরালেন তিনি। পলকে মোমবাতি দুটো শূন্যে উঠে নিবে গেল। পরিতোষ যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠে দাঁড়াল। মেয়ে দুটো তাদের বাবু বিপদে পড়েছে দেখে হাউমাউ করে কেঁদে প্রায় বিবস্ত্র অবস্থায় এসে সরিৎশেখরের দুই পা জড়িয়ে ধরল। সরিৎশেখর একটাকে লাথি মেরে বসিয়ে দিলেও মোটা মেয়েছেলেটিকে পারলেন না। সে সমানে ককিয়ে যাচ্ছে, 'বাবুসাহেব আর আসব না, মাইরি বলছি, টাকা দিলেও রাজী হব না ভদ্দরপাড়ায় আসতে। আমাদের বেগুনটুলিই 'ভাল ছিল গো—ও—ও।'

আর এই সুযোগে এক হাতে মাথার একটা পাশ ধরে তীরের মত দরজা দিয়ে পরিতোষ ছুটে বেরিয়ে গেল। পা আটকে থাকায় সরিৎশেখর পুত্রকে আর একবার বেদম প্রহার করার চেষ্টা করেও বিফল হলেন।

মেয়েছেলে দুটোকে দূর করে দেবার সময় আবার ঝামেলায় পড়তে হল। টাকা ছাড়া তারা যাবে না। জানতে পারলেন পরিতোষ প্রায়ই তাদের নিয়ে আসে, ফূর্তি করে, যাবার সময় টাকা দেয়। চিৎকার চেঁচামেচি করে ওরা সরিৎশেখরের কাছ থেকে টাকা আদায় করল। ভাগ্যিস এখনও এদিকে তেমন লোকবসতি হয়নি এবং সময়টা সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে তাই কেউ জানল না। সরিৎশেখর সব কটা দরজায় তালা লাগিয়ে পেছনে আসতে হাঁ হয়ে গেলেন। এতদিনে তাঁর বাড়ির অর্ধেকটা কাজ হয়ে যাবার কথা। জানলা দরজায় ফ্রেম লেগে যাবে শুনেছিলেন। কিন্তু এই অস্পষ্ট অন্ধকারে উনি দেখতে পেলেন ভিত-এর গাঁথুনির পর আর এক ইঞ্চি দেয়ালও ওঠেনি।

নিজের সারাজীবনের সঞ্চয়ের একটা অংশের এই পরিণতি দেখতে দেখতে সরিৎশেখর শক্ত হয়ে দাঁড়ালেন। তারপর মাথা উঁচু করে অন্ধকারে মাঠ ভেঙে গাড়িতে ফিরে এলেন। একবার ভাবলেন এখনি বায়কতপাড়ায় গিয়ে সাধুচরণের সঙ্গে দেখা করবেন। কেন তাঁকে এতদিন পর তিনি জানালেন পুত্রের কথা? কেন সময় থাকতে সাবধান করে খবর দেননি? বন্ধু হিসেবে সরিৎশেখর তো সাধুচরণের ওপর নির্ভর করতে চেয়েছিলেন! হঠাৎ তাঁর একটা কথা মনে পড়ে গেল। সাধুচরণ অনেকদিন আগে তাঁকে একবার বলেছিলেন, আপনার এই পুত্রটিকে নিয়ে দুশ্চিন্তার দেখছি অবধি নেই। আমাদের জাতের কেউ জেনেশুনে ওকে কন্যা দেবে না। আমার ও কন্যাটিকে নিয়ে ভাবনার শেষ হয় না। এই দুটিকে একসঙ্গে জুটিয়ে দিলে কেমন হয়?'

সরিৎশেখর অবাক হয়ে বলেছিলেন, 'কি যা-তা বলছ?'

সাধুচরণ বলেছিলেন, 'তা অবশ্য। আপনার পুত্র আগে খুব আসতো, এখন আসতে চায় না।'

গাড়ি আর ঘোরালেন না তিনি। সোজা কিং সাহেবের ঘাটে চলে এলেন। তিস্তার এই ঘাটটা এখন জমজমাট। অজস্র খড়ের চালের দোকান হয়েছে চা-খাবারের। সন্ধ্যের পর ঘাট বন্ধ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ, অনেক কষ্টে বেশী বকশিশের লোভ দেখিয়ে সরিৎশেখর একটা জোড়া-নৌকো যোগাড় করে গাড়ি তুললেন তাতে।

সেদিন গভীর রাত্রে বাড়ি ফিরে তিনি কিছুক্ষণ নিজের খাটের ওপর গুম হয়ে বসে রইলেন। সবাই আন্দাজ করছে কিছু একটা হয়েছে, কিন্তু কেউ আগবাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করতে সাহস পাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত নিজেই ডাকলেন তিনি হেম, মহীতোষ আর প্রিয়তোষকে। ওঁরা শুনলেন ওঁদের বাবা ওঁদের বড়দাদাকে আজ থেকে ত্যাজ্যপুত্র বলে ঘোষণা করলেন। খাটের একপাশে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে ঘাপটি মেরে শুয়ে থাকা অনিমেষ কথাগুলো স্পষ্ট শুনতে পেল। দাদু আসার পরই ওর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, কিন্তু ও বুঝতে পেরেছিল সেটা টের পেতে দেওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কিন্তু ত্যাজ্যপুত্র শব্দটার মানে কি?

রহমৎ মিঞার হাতে বাড়ি তরতর করে উঠতে লাগল। ছাতি মাথায় সরিৎশেখর সারাদিন মিস্ত্রীদের পেছনে লেগে রইলেন। ট্রাকে করে ইঁট-বালি আসছে। ভারা বেঁধে মিস্ত্রীরা কাজ করছে। বাউন্ডারির মধ্যে একচালা করে মজুররা সেখানে আস্তানা করে নিয়েছে। সন্ধ্যের সময় ইঁটের উনুন জ্বালিয়ে রুটি সেঁকতে সেঁকতে রামলীলা গায় ওরা তারস্বরে। অনি ঘুরে ঘুরে দেখে সারাদিন। সরিৎশেখর ঠিক

www.MurchOna.com

করেছেন, সামনের বছর ওকে জিলা স্কুলে ভর্তি করে দেবেন। যেহেতু এটা প্রায় বছরের শেষ, ভর্তি হওয়া চলবে না। ফলে অনির আর বই নিয়ে বসতে হয় না। ওদের বাড়ির কাছে বড় রাস্তা নেই। দাদুর সঙ্গে বাজারে যাবার সময় ও দেখতে পায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা লাইন করে জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে গান গাইতে গাইতে যাচ্ছে। জিলা স্কুলে ভর্তি হতে অনিকে যে আরো কয়েক মাস অপেক্ষা করতে হবে। সরিৎশেখর ওকে খবরের কাগজ পড়া শেখাচ্ছেন। রোজ বিকেলে যখন কাগজওয়ালা ক্লাগজ দিয়ে যায়, তখন প্রথম পাতা জুড়ে মহাত্মা গান্ধী আর জহরলাল নেহেরুর ছবি দেখতে পায় অনি।

এখানে শোওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে এই রকম—বড় ঘরটায় সরিৎশেখরের বিরাট খাটটা পাতা আছে। দামী মেহগনি কাঠের খাট। খাটের গায়ে চীনে-লণ্ঠন রাখার একটা স্ট্যান্ড। অনি দাদুর সঙ্গে ঐ খাটে শোয়। সারাদিন মিস্ত্রীদের পিছনে খেটে সরিৎশেখর সন্ধ্যে পেরুলেই খাওয়া-দাওয়া সেরে অনিকে নিয়ে শুয়ে পড়েন। অন্ধকার ঘরে দাদুর নাক ডাকা শুনতে শুনতে অনির কিছুতেই ঘুম আসে না। রাত হয়ে গেলে মজুররা আর গান গায় না, শুধু একলা একটা ঢোলক তালে তালে বেজে যায়। সেই বাজনা শুনতে শুনতে অনির মায়ের কথা মনে পড়ে যায়। আর তখনি বুক কেমন করে ওর কান্না আসে। এখানে ওর একটাও বন্ধু নেই, সমবয়সী কোন ছেলের সঙ্গে ওর আলাপ নেই। পাশের ঘরে শোন হেমলতা। ঘরের এক কোণে রান্নার জিনিসপত্র, অন্য কোণে ঠাকুরের আসন। এইভাবে থাকা ওঁর কোনদিন অভ্যেস নেই। প্রথম দিন ব্যবস্থা দেখে বলেছিলেন, 'ওমা, এইরকম ভাবে থাকব কি করে?' সরিৎশেখর কোন জবাব দেননি। তবে বাড়ি তৈরী না হওয়া অবধি কষ্ট করতে হবেই—উপায় কি—এই রকম একটা ভঙ্গী তাঁর আচরণে ছিল। কিন্তু হেমলতা চমৎকার মানিয়ে নিলেন। এখানকার সংসার, তা যত কষ্টকর হোক তাঁর নিজের। চিরকাল ভাই ভাই-বউদের সঙ্গে থেকে এরকম একটা মজা তিনি পাননি কোনদিন। নিজের সংসার তো কোনকালে করা হল না, বাবা আর ভাইপোকে নিয়ে নতুন সংসারে অদ্ভুতভাবে মজে গেলেন হেমলতা।

খুব ভোরে সরিৎশেখর অনিকে ঘুম থেকে তোলেন। এই সময় প্রায়ই ভোরের দিকে বৃষ্টি হয়। সরিৎশেখর তা গ্রাহ্য করেন না। বৃষ্টি হলে গামবুট বা ছাতি নিয়ে দাদুর সঙ্গে অনিকে বেরুতে হয়। দাদুরও একই পোশাক। ঘুমে চোখের পাতা এঁটে থাকে, জল ছিটিয়ে চোখ ধুয়ে বেরুতে হয়। বেরুবার সময় সরিৎশেখর হেমলতার ঘুম ভাঙিয়ে যান নইলে দরজা খোলা থাকবে যে। মাঠ পেরিয়ে নাতির হাত ধরে হনহন করে তিনি তিস্তার পারে চলে আসেন। এখন তিস্তা পোয়াতি মেয়ের লাবণ্যে টলটলে। বৃষ্টি না হলে অন্ধকার পাতলা সরের মত পৃথিবীময় জুড়ে থাকে। টুপটাপ তারাগুলো নিভছে। কখনো সাদা হাড়ের মত চাঁদ আকাশের এক কোণে ঝুলে থাকে। সারারাত বিশ্রাম পেয়ে পৃথিবীর বুকের ভিতর থেকে উঠে আসা নিঃশ্বাসের মত একরাশ ঠাণ্ডা বাতাস নদীর জলে খেলা করতে করতে অনিদের ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে যায় মন্ডলঘাটের দিকে। নদীর বুকে অদ্ভুত এক অন্ধকার লুকোচুরি খেলা করে জলের সঙ্গে। হাঁটতে শুরু করেন সরিৎশেখর কাঁচা রাস্তা ধরে। এক পাশে নদী, অন্য পাশে ঘুমন্ত শহর। দাদুর দ্রুত পদক্ষেপের সঙ্গে তাল রাখতে অনিকে হাঁপাতে হয়। চলার সময় কোন কথা বলেন না সরিৎশেখর। কিং সাহেবের ঘাট ছাড়াবার পর হঠাৎই পুবের আকাশটা রং বদলায়। অনি দেখেছে, যে মুহূর্তে ওরা কিং সাহেবের ঘাট পেরিয়ে পিলখানার রাস্তায় পা বাড়ায়, ঠিক তখনি অন্ধকার মাটি থেকে হুস করে উঠে গিয়ে গাছের মাথায় মাথায় জমে। আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত চরাচর ঠাকুরঘরের মত পবিত্র হয়ে যায়। এমন কি মাটির ওপর ধুলোগুলো কেমন শান্ত হয়ে এলিয়ে থাকে শিশির মেখে। অনি দ্যাখে নদীর গায়ে কোথাও অন্ধকার নেই। অদ্ভুত সারল্য নিয়ে জলেরা বয়ে যায়। দু-একটা তারা ডুবে যাবার আগে, যেন কেউ তাদের কথা দিয়ে নিয়ে যায়নি এইরকম আফসোস-মুখে চেয়ে থাকে তখনো। পুবের আকাশটায় হোলি খেলা শুরু হয়ে যায় হঠাৎ। তখনি দাদু দাঁড়িয়ে পড়েন সেদিকে হাত জোড় করে। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় খোলা গলায় সূর্য প্রণাম—ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্। ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরম্।। কবিতার সুরে সুরে অদ্ভুত এক মায়াময় জগৎ তৈরী হয়ে যায় তখন, প্রতিটি শব্দ যেন সামনের আকাশের অঞ্জলির মত রঙ হয়ে জড়িয়ে যায়। এক সময় দিগন্তরেখায় যেখানে তিস্তার বুকে অসম্ভব লালচে রঙের আকাশ মুখ ডুবিয়েছে সেখানটা কাঁপতে থাকে

www.MurchOna.com

থর থর করে। সেই কাঁপুনি গায়ে মেখে টুক করে সূর্যটা উঠে পড়ে জল থেকে আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আকাশে একটা আলোড়ন শুরু হয়ে যায়। এক সময় যখন সুন্দর সোনার টিপটা থেকে ঝলক ঝলক আগুন বেরোতে থাকে তখন সরিৎশেখর বাড়ির পথ ধরেন। অনির তখন মনটা কেমন করে ওঠে। যে কোন ভাল জিনিস দেখলেই মায়ের কথা মনে পড়ে যায়। এই মুহূর্তে ওর দাদুকে খুব ভাল লাগে—ঘুম ভাঙিয়ে তোলার জন্য কোন আফসোস থাকে না।

বাড়ি ফিরে জল খেয়ে বাড়ির কাজে লেগে যান সরিৎশেখর। সারাদিনের প্রতিটি মুহূর্তে মিস্ত্রীদের চিৎকার আর বিভিন্ন রকমের শব্দে বাড়িটা ভরে থাকে। হেমলতা নিজের মনে সংসারের কাজ করে যান। এখানে এসে প্রথমে চাকরবাকর পাওয়া যায়নি। এখন চাকর রাখলেই যেন হেমলতার অসুবিধে হবে বেশী। কোন কাজ নিজের হাতে না করলে তাঁর স্বস্তি হয় না। বাবার খাওয়া-দাওয়ার দিকে তাঁর কড়া নজর। ঠিক সময়ে শরবৎ পাঠিয়ে দেন অনির হাত দিয়ে পাথরের গ্লাসে করে। একদিন অন্তর সকালে বাজারে যান সরিৎশেখর। অনি তখন সঙ্গী হয়। দাদুর সঙ্গে যেতে যেতে রাস্তায় কত রকমের লোকের সঙ্গে দেখা হয়, তাদের বেশীর ভাগই দাদুকে নমস্কার করে কথা বলে, নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে। অনি বুঝতে পারে ইংরেজরা চলে যাওয়ায় আমাদের অনেক দায়িত্ব বেড়ে গেছে। দাদুর বন্ধুদের কেউ বলেন, যারা ইংরেজদের চাকর ছিল সেই অফিসাররা কি করে দেশ শাসন করবে? আবার একজন বুড়ো বললেন, জিনিসপত্রের দাম যেভাবে বাড়ছে, এর চেয়ে ইংরেজ-আমল বরং ভাল ছিল। লোকটা কথা বলার সময় চারপাশে চোরের মত তাকাচ্ছিল। অনির ওকে ভাল লাগছিল না। এ-সব কথাবার্তার সবটা অনি বুঝতে পারছিল না। কিন্তু ওর মনে হতে লাগল ও বড় হচ্ছে, একটু একটু করে বড় হচ্ছে।

বাড়ির একদিকে চুড়ো করে বালি রাখা ছিল। খাওয়া-দাওয়ার পর অনি একা একা সেখানটায় সুড়ঙ্গ তৈরির খেলা খেলত। অনেকটা দূর ওপরের বালি না ভেঙে গর্ত করে চুপচাপ ভেতরে ঢুকে বসে থাকা যায়। এদিকটায় নতুন তৈরী বাড়ির ছায়া পড়ে থাকায় বেশ ঠান্ডা। দরজা-জানলার ফ্রেম বসে গেছে। কয়েকদিন আগেই ঢালাই শেষ হয়ে গিয়েছে। ছাদ পেটানোর কাজ চলছে। রহমৎ মিঞা কম পয়সায় বেশী কাজ পাওয়া যায় বলে একগাদা কামিন নিয়ে এসেছে। তারা সকালে দল বেঁধে আসে, সন্ধ্যের সময় দল বেঁধে চলে যায়। সরিৎশেখর মজুরদের দিয়ে বাড়ির ভিতরের খোলা জায়গায় অজস্র গাছপালা লাগিয়ে নিয়েছেন। তারা শিকড়ে জোর পেয়ে গেছে। অনি ভালবাসে বলে তিনটে পেয়ারা এবং বাউন্ডারীর ধার ঘেঁষে সার দিয়ে কলাগাছ লাগানো হয়েছে।

সেদিন দুপুরে অনি বালির পাহাড়ের তলায় সুড়ঙ্গ করে একদম ওপাশে প্রায় চলে এল। সারা গায়ে বালি মেখে অনি বেরুতে যাচ্ছে হঠাৎ চাপা গলা শুনতে পেল। ওর মনে হল কোন কারণে দাদু আজ এদিকটায় চলে এসেছেন। আজ এই বালিমাখা অবস্থায় তিনি যদি অনিকে দ্যাখেন, তাহলে নির্ঘাত শাস্তি পেতে হবে। এর আগে বালি নষ্ট করার জন্যে ওকে ধমক খেতে হয়েছে। চোরের মত উল্টোদিকে হামাগুড়ি দিয়ে ফিরতে যেতে অনি আবার গলাটা শুনতে পেল। না, এ গলা তো দাদুর নয়। হিন্দীতে কথা বলছে। ছেলেটা কি যেন বলছে খুব চাপা গলায় আর মেয়েটা না না বলছে সমানে। অনি ফিরল না আর। ওরা কারা দেখার কৌতূহলে ও এগিয়ে গেল হামাগুড়ি দিয়ে। একদম শেষ প্রান্তে গুহার মুখটা বড় হয়নি, একটা বড় ছিদ্র হয়ে রয়েছে, অনি সেখানে চোখ রাখল। ও দেখতে পেল একটা মাঝবয়সী মজুর, যার দাড়ি আছে অনেকটা আর রাত্রে রামলীলা গায়, নতুন আসা একটা লম্বা কামিনের হাত ধরে কথা বলছে। কামিনটা বার বার ঘাড় নাড়ছে আর ভয়-ভয় চোখে চারপাশে তাকিয়ে দেখছে কেউ দেখে ফেলল কি না। কিন্তু মজুরটা যেন কোন কথা শুনতে রাজী নয়। হঠাৎ সে দু-হাতে কামিনটাকে জড়িয়ে ধরে নিজের বুকে চাপতে লাগল। কামিনটা প্রাণপণে নিজেকে ছাড়াতে চেষ্টা করে দুমদাম মজুরটার বুকে ঘুঁষি মারতে লাগল। মজুরটা ভীষণ অন্যায় করছে এটা বুঝতে পারছিল অনি। ওর মনে হল কামিনটাকে বাঁচানো দরকার। চিৎকার করবে কিনা অনি যখন ভাবছে, ঠিক তখনি মজুরটা কামিনটাকে টপ করে চুমু খেয়ে ফেলল। অনি অবাক হয়ে দেখল চুমু খেতেই কামিনটা কেমন হয়ে গেল। হাত পা ছুঁড়ছে না, প্রতিবাদ করছে না, বরং দু-হাতে মজুরটাকে জড়িয়ে ধরেছে ও। আর মজুরটা ওর সমস্ত শরীরে আদর করার মত করে হাত বোলাতে লাগল। এখন চিৎকার করার কোন মানে হয় না, কারণ

www.MurchOna.com

মেয়েটা তো সাহায্য চাইছে না—এটুকু অনি বুঝতে পারল। এক সময় লোকটা কামিনের ওপরের কালো জামাটা খুলে ফেলল। অনি কামিনটার পিঠ দেখতে পাচ্ছে। কালো শরীরের ওপর একটা ফ্যাকাশে সাদা দাগ। অনেক দিন চাপা পড়ে থাকা ঘাসের রঙ। মজুরটার এখন সব আগ্রহ কামিনের বুকের ওপরে—যেটা অনির দিক থেকে আড়াল করা। হঠাৎ কার গলা ভেসে এল। কে যেন কাউকে ডাকছে। সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে সরে এল কামিনটা এদিকে আর মজুরটা সাড়া দিতে দিতে দৌড়ে চলে গেল কামিনটাকে কি যেন বলে। মাটিতে পড়ে থাকা জামাটা দ্রুত তুলে নিয়ে এপাশে ফিরে হাঁটু গেড়ে বসে সে পরতে লাগল। অনি দেখল মেয়েটির তামাটে রঙের বড় বড় বুকের ওপর লালচে লালচে দাঁতের দাগ। এভাবে কোনদিন এইরকম বুক দ্যাখেনি অনি। মেয়েটি জামা পরতে পরতে কি মমতায় একবার দাগগুলোর ওপর হাত বুলিয়ে নিল। তারপর অনির পাশে বালির ওপর পিচ করে থুতু ফেলে হেলতে দুলতে চলে গেল।

মেয়েটি চলে যাবার পর অসাড় হয়ে অনি শুয়ে থাকল বালির ভেতর। ওর মাথা ঘুরছিল এবং বুঝতে পারছিল ওরা খুব খারাপ কিছু করেছিল যেটা সবার সামনে করা যায় না। মেয়েটা তাহলে প্রথমে অত ছটফট করছিল কেন? কেন লোকটাকে ঘুঁষি মারছিল? আবার পরে লোকটা যখন ওর বুকে অমন দাঁত বসিয়ে দিল তখন ও কেন যন্ত্রণা পায়নি? কেন তখনো ও মজুরটাকে আদর করছিল? হঠাৎ ওর মালবাবুর ছোট মেয়ে সীতার কথা মনে পড়ে গেল। সীতা ওর চেয়ে এক বছরের ছোট। বাড়ি থেকে খুব কম বের হয়। কিন্তু ওর হাত একটু শক্ত করে ধরলে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলে। সীতাও কি বুকে ওরকম করে কামড়ে দিলে কাঁদবে না? সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে পড়ল সীতার বুক তো ওদের মতই একদম সমান। তাহলে বড় হলে সীতার বুক নিশ্চয়ই এক কামিনটার মত হয়ে যাবে। আর বুক বড় হয়ে মেয়েটার নিশ্চয়ই ব্যথা লাগে না। সমস্যাটার এই রকম একটা সমাধান করতে পেরে অনি অন্যমনস্ক হয়ে পড়তেই চাপ লেগে বালির দেওয়াল ধসে পড়ল। অনি দেখল ওপরের বালি হুড়মুড়িয়ে তাকে চাপা দিতে আসছে। কোন রকম টেনে হিঁচড়ে ও বাইরের খোলা হাওয়ায় বেরিয়ে এল।

বাড়ি শেষ হয়ে গেলে হেমলতার চাপে সরিৎশেখর ঘটা করে গৃহপ্রবেশের ব্যবস্থা করলেন। ঝকঝকে তকতকে বাড়ির দিকে তাকালে তাঁর চোখ জুড়িয়ে যায়। নতুন রঙ আর সিমেন্টের গন্ধ নাক ভরে নেন তিনি। সাধুচরণের সঙ্গে এখানকার কালীবাড়ির পুরোহিতদের খুব ভাব আছে। তিনি সরিৎশেখরকে কোলকাতার কাছে হালিশহরে এক তান্ত্রিকের খবর দিলেন, যিনি নাকি সিদ্ধ পুরুষ। অনেক চেষ্টাচরিত্র করে তাঁকে আনানোর ব্যবস্থা হল। স্বর্গছেঁড়া থেকে সবাই এসে হাজির। এখানে আসার পর অনি একদিনও স্বর্গছেঁড়ায় যায়নি। সরিৎশেখর পাঠাতে চেয়েছিলেন কিন্তু মহীতোষ জানিয়েছেন এত ঘন ঘন এলে শহরে মন বসবে না। মাধুরী আসার পর হেমলতা বললেন, 'দ্যাখ, তোর ছেলে কত রোগা হয়ে গেছে।'

মাধুরী ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, 'রোগা কোথায়, ও দেখছি বেশ লম্বা হয়েছে।'

হেমলতা বললেন, 'হবে না কেন? এ বংশের ধারাই তো লম্বাটে।'

একসময় একটু একলা পেয়ে মাধুরী ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁ রে, আমার জন্যে তোর মন-কেমন করে না?' আর সঙ্গে সঙ্গে অনি ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল।

সেই কান্না শুনে বাড়ির সবাই ছুটে এসে দেখল অনি মাধুরীকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। মাধুরী ছেলেকে যত থামাতে চান কান্না তত বেড়ে যেতে লাগল। শেষ পর্যন্ত হেমলতা বললেন, 'না, ভাই, এতদিন পর দেখা হল আর তুমি ওকে বকাবকি করছ—এটা উচিত হয়নি।'

এমন কি সরিৎশেখর অবধি যেতে যেতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে বললেন, 'না, বৌমা, তুমি বড্ড ছেলেকে শাসন করো।' মাধুরী লজ্জায় মরে যান। ছেলে যে এভাবে কেঁদে উঠবে বুঝতে পারেন নি তিনি।

তোড়জোড় চলতে লাগল গৃহপ্রবেশের। কাল মঙ্গলবার, সব মিলিয়ে দিন ভাল। আত্মীয়স্বজন তো আছেনই, সরিৎশেখর সহরের সমস্ত বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করেছেন। কিন্তু আজ সকাল থেকেই আকাশ মেঘলা, টিপটিপিয়ে বৃষ্টি পড়ছে। কে যেন এসে বলে গেল তিস্তার জল বেড়েছে। ভোরে যাবার সময়

www.MurchOna.com

সরিৎশেখর তেমন কিছু লক্ষ্য করেননি। উঠোনে ভিয়েন বসেছে। কাল দুপুরে খাওয়া-দাওয়া হলেও আজ থেকে মেয়েদের রান্নাঘরে যেতে হচ্ছে না। সন্ধ্যের ট্রেনে হালিশহরের সিদ্ধপুরুষ একজন শিষ্যসমেত এসে গেলেন। সরিৎশেখর মহীতোষকে নিয়ে স্টেশনে গিয়েছিলেন তাঁকে আনতে। কিন্তু তিনি সোজা গিয়ে কালীবাড়িতে উঠলেন। ঠিক হল পরদিন ভোরে পুরোহিতমশাই-এর সঙ্গে উনি চলে আসবেন। খাওয়া-দাওয়া সারতে রাত হয়ে গেল। ঠিক হল টিনের চালায় মেয়েরা বাচ্চাদের নিয়ে শোবেন। যেহেতু গৃহপ্রবেশ এখনো হয়নি তাই ঘরে নয়, নতুন বাড়ির ঢাকা বারান্দায় শতরঞ্জি বিছিয়ে ছেলেদের শোওয়ার ব্যবস্থা হল। শোওয়ার আগে ক্যাম্প খাট পেতে সরিৎশেখর একবার অনির খোঁজ করতে হেমলতা বললেন 'ও মায়ের সঙ্গে শোবে।'

বড় ঘর থেকে খাটটা সরানো গেল না। তাই মেয়েরা মাটিতে ঢালাও বিছানা পেতে শুলেন। খাটের ওপর মাধুরী আর অনি। মাধুরী নিচেই শুতে চেয়েছিলেন, হেমলতা বকাবকি করাতে রাজী হতে হল।

মায়ের কাছে এতদিন বাদে শুয়ে অনির কিছুতেই ঘুম আসছিল না। মায়ের গন্ধ মায়ের নরম হাত ওকে কেমন আবিষ্ট করে রেখেছিল। মাধুরী এক সময় চাপা গলায় বললেন, 'তুই সকালে অমন বোকার মত কাঁদলি কেন? সবাই আমাকে বকলো!'

অন্ধকার ঘরে মায়ের বুকের কাছে মুখ রেখে অনি বলল, 'তুমি আমাকে বললে কেন? তুমি জান না বুঝি!' মাধুরী ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। মায়ের বুকের ওপর গাল রাখতে গিয়ে অনির চট করে সেই কামিনটার কথা মনে পড়ে গেল। ও বলল, 'মা, তোমার বুকে যদি আমি কামড়ে দাগ করে দিই তাহলে তোমার লাগবে না?'

চাপা গলায় ছেলের প্রশ্নটা শুনে মাধুরী হকচকিয়ে গেলেন। অনি যে এ ধরনের প্রশ্ন করবে ভাবতেই পারেননি। কোন রকমে বললেন, 'মানে?'

অনি বলল, 'জানো, এখানে না একটা কামিনের বুকে একটা কুলি অনেক দাঁত বসিয়ে দিয়েছিল কিন্তু কামিনটা একদম কাঁদেনি। বড় বুকে কামড়ালে লাগে না, না?'

উত্তেজনায় মাধুরী উঠে বসতে যাচ্ছিলেন, কোন রকমে কৌতূহল চেপে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুই কি করে জানলি?'

তখন অনি পুটুরপুটুর করে মাকে সব কথা বলল, এমন কী সীতার কথাটাও। মাধুরী কি করবেন প্রথমটা বুঝতে পারছিলেন না। ব্যাপারটা খারাপ বললে ছেলের যদি কৌতূহল বেড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত মাধুরী বললেন, 'ওরা ভীষণ অন্যায় করেছে তাই লুকিয়েছিল। তুমি ওসব আর দেখো না। ওসব দেখলেও পাপ হয়, ভগবান রাগ করেন।'

অনি বলল, 'আমার তাহলে পাপ হয়েছে?'

মাধুরী ছেলের মাথায় হাত রাখলেন, 'না, না, মায়ের কাছে সব কথা খুলে বললে কোন পাপ আর থাকে না। তুমি চিরকাল আমাকে সব কথা খুলে বলো অনি।'

মাধুরীর খেয়াল হল তাঁর পেটে আর একটি সন্তান এসে গেছে। এই অবস্থায় টানটান হয়ে শোওয়া উচিত নয়। মাধুরী হাঁটু দুটো পেটের কাছে নিয়ে এসে পাশ ফিরে শুলেন।

সিদ্ধপুরুষ তান্ত্রিকের নাম শনিবাবা। বিশাল তাঁর চেহারা, যেমন ভুঁড়ি তেমনি লম্বা। লাল কাপড় পরে খড়ম পায়ে রিকশা করে যখন নামলেন তখন অনির ভয়ে চোখ বন্ধ হবার যোগাড়। পিসীমা আগে গল্প করেছিলেন, তান্ত্রিকেরা নাকি ইচ্ছে করলে যা খুশি করতে পারে। শনিবাবাকে দেখলেই বুক হিম হয়ে যায়, সামনে যাবে নাকি!

পূজোয় বসার আগে শনিবাবা একবার নতুন বাড়ির চারপাশে পাক দিয়ে এলেন। যে ঘরটা ঠাকুরঘর হবে বলে হেমলতা ঠিক করেছিলেন সেখানেই পূজোর আসন পাতা হয়েছে। আসনে বসে অনেকক্ষণ ধ্যানস্থ হয়ে থাকলেন শনিবাবা। ওঁর সামনে কোন মূর্তি নেই। শুধু চারটে মোটা চন্দনকাঠের টুকরো ছড়ানো বালির ওপর সাজানো রয়েছে। শনিবাবার অনেকটা পিছনে ঘরের মধ্যে সরিৎশেখর হাঁটু গেড়ে বসে, তাঁর পেছনে পুরোহিতমশাই, মহীতোষ এবং সাধুচরণ বসে আছেন। প্রিয়তোষ রান্নাবান্নার দিকটা তদারক করছে। মেয়েরা ভিড় করে দরজায় দাঁড়িয়ে, ভেতরে ঢুকতে সাহস পাচ্ছে না কেউ।

www.MurchOna.com

ওঁদের আড়ালে দাঁড়িয়ে সামান্য ফাঁক দিয়ে অনি শনিবাবার পিঠটা দেখতে পাচ্ছে। হেমলতা মাধুরীকে বলেছেন অনিকে যেন শনিবাবার সামনে খুব একটা যেতে না দেওয়া হয়। কারণ তান্ত্রিক-মানুষকে বিশ্বাস নেই, ছোট ছেলেমেয়েদের প্রতি ওঁদের নাকি আগ্রহ থাকে। শোনার পর থেকে মাধুরী ছেলেকে আগলে আগলে রাখছেন।

হঠাৎ শনিবাবা টানটান হয়ে বসলেন। তারপর চোখ বুজে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। ঘরের সবাই অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকাতেই বাজখাঁই গলায় তিনি ডাকলেন, সরিৎশেখর!'

সরিৎশেখর চমকে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

শনিবাবা বললেন, 'এত অমঙ্গলের ছায়া কেন? এত শত্রু কেন তোমার?'

উত্তরে সরিৎশেখর কোন রকমে বললেন, 'সে কি!'

শনিবাবা বললেন, 'এর মধ্যেই ওরা কাজ শুরু করে দিয়েছে। এভাবে চললে খুব শীঘ্র তোমার অঙ্গহানি হবে। আমি বাড়িতে ঢুকতেই অনুভব করেছিলাম কেউ একজন খুশী হল না।'

সরিৎশেখর হাত জোড় করে বললেন, 'আমি তো জেনেশুনে কোন অন্যায় করিনি, বাবা—আপনি দেখুন।'

শনিবাবা বললেন, 'এই বাড়ি বাঁধতে হবে। তোমার একটা কুলোয় চারটে প্রদীপ, চার পাত্র দুধ, চারটে ফল আর চারটে জবাফুল তুলসীপাতার ব্যবস্থা কর এক্ষুনি!' কথা শেষ হওয়া মাত্র সরিৎশেখর দরজায় দাঁড়ানো মেয়েদের দিকে তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে হুমমড় করে মেয়েরা ছুটলো জিনিসগুলোর ব্যবস্থা করতে। মোটামুটি সবই পূজোর ব্যাপারে আনা ছিল। কয়েক মিনিটের মধ্যে সরিৎশেখর কুলোটাকে শনিবাবার সামনে ধরলেন। সেদিকে একবার চোখ বুলিয়ে শনিবাবা মাটিতে রাখা তাঁর লাল ঝুলিটা থেকে একটা কাঠের বাকস বের করলেন। কাঠের বাক্সের ডালাটা সন্তর্পণে খুলতে সরিৎশেখর দেখতে পেলেন তার মধ্যে দু'ইঞ্চিটাক লম্বা চারটে ফণাতোলা গোখরা সাপ রয়েছে। কুচকুচে কালো ইস্পাতের তৈরী সাপগুলোর ফণার ডগা খুব ছুঁচলো। চট করে জ্যান্ত বলে ভুল হয়। শনিবাবা সেগুলো বের করে কুলোর উপর রাখলেন। তারপর বললেন, 'এঁরা তোমার বাড়ি রক্ষা করবে। এই কুলোটাকে মাথার ওপর নিয়ে তুমি বাইরে চল। এদের প্রতিষ্ঠা করতে হবে।'

সম্মোহিতের মত সরিৎশেখর কুলো মাথায় তুলে নিলেন। মেয়েরা সঙ্গে সঙ্গে দরজা ছেড়ে দিল। মাধুরী ছেলেকে আড়াল করে সরে দাঁড়ালেন। প্রথমে শনিবাবা, তাঁর পেছনে কুলো মাথায় সরিৎশেখর, পুরোহিত মশাই, মহীতোষ, সাধুচরণ লাইন দিয়ে ঘর থেকে বেরুলেন। যেতে যেতে শনিবাবা বললেন, 'একটা কোদাল আনতে বল কাউকে।' কথাটা শুনে দূরে দাঁড়ানো প্রিয়তোষ একছুটে কোদাল নিয়ে এল।

শনিবাবা প্রথমে গেলেন বাড়িটার পূর্ব-দক্ষিণ কোণে। তারপর কি ভেবে বাগান পেরিয়ে একদম বাউন্ডারীর কোণায় চলে এসে ইঙ্গিতে প্রিয়তোষকে মাটি খুঁড়তে বললেন। প্রিয়তোষ যখন অনেকটা গর্ত করে ফেলেছে তখন তিনি গম্ভীর গলায় 'মা' 'মা' বলে ডেকে উঠে সরিৎশেখরের কুলো থেকে প্রথমে একটা সাপকে সযত্নে গর্তের ভেতর বসিয়ে দিলেন। তারপর নৈবেদ্যর মত প্রদীপ, ফল, ফুল একটা করে তার সামনে সাজিয়ে তিনি নিজের হাতে মাটি চাপা দিতে লাগলেন। মাটি সমান হয়ে গেল বললেন, 'সাত দিন যেন কেউ এখানে পা না দেয়। যে দেবে তার মৃত্যু অনিবার্য।'

একে একে বাড়ির আর তিনটে কোণে সাপ প্রতিষ্ঠা করা হয়ে গেলে হঠাৎ হাওয়া উঠল বেশ। গাছের ডালপালাগুলো শব্দ করে দুলতে লাগল। শনিবাবা একবার আকাশের দিকে মুখ করে কিছু দেখলেন, তারপর সরিৎশেখরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বেঁচে গেলি।'

পূজো শুরু হতে নিমন্ত্রিতদের আসা শুরু হয়ে গেল। সরিৎশেখরের নির্দেশে পূজো শেষ না হলে খাওয়া-দাওয়া হবে না। বৃষ্টি আসতে পারে যে-কোন মুহূর্তে, তাই ঢাকা লম্বা বারান্দায় খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। পূজো করতে করতে শনিবাবা অদ্ভুত রহস্যময় হয়ে উঠেছেন। মাঝে মাঝে অদৃশ্য কাউকে ধমক দিচ্ছেন, হাসছেন, আর ছেলেমানুষদের মত অভিমান করছেন। শেষে চন্দনকাঠে আগুন জ্বালালেন তিনি। পুড়ছে কাঠ, অদ্ভুত সুগন্ধযুক্ত ধোঁয়া বেরুচ্ছে তা থেকে। হঠাৎ ঝুলি থেকে কিছু একটা বের করে তাতে ছুঁড়লেন শনিবাবা। সঙ্গে সঙ্গে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। শনিবাবা সরিৎশেখরকে

www.MurchOna.com

বললেন, 'এবার অগ্নি আমায় আকর্ষণ করবে। তোমরা আমাকে ধরে রাখবে।' কথাটা বলে শনিবাবা উঠে দাঁড়িয়ে সেই বস্তুটি আরো ঐ আগুনে ছড়িয়ে দিয়ে 'মা' 'মা' বলে ডাকতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে আগুনের শিখা বাড়তে লাগল। ক্রমশ তা বিশাল আকার ধারণ করে শনিবাবার মাথা ছাড়িয়ে উঠে গেল। আর তখনি শনিবাবার সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপতে লাগল। খুব আলতো করে সরিৎশেখর শনিবাবাকে স্পর্শ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন, হঠাৎ মনে হল শনিবাবাকে কে যেন সামনের দিকে টানছে প্রচন্ড জোরে। এক সময় তিনি নিজে যেন আর শনিবাবাকে ধরে রাখতে পারবেন না বলে মনে হল। ওঁর অবস্থা দেখে পুরোহিত মশাই উঠে এসে হাত লাগালেন। শনিবাবা তখন অনর্গল সংস্কৃত শব্দ সহযোগে মাকে ডেকে যাচ্ছেন। ওঁর শরীরের উত্তাপে যেন সরিৎশেখরের হাত পুড়ে যেতে লাগল। শেষ পর্যন্ত কেউ যেন পলতে কমানোর মত আগুনটাকে কমিয়ে দিতে শনিবাবার কাঁপুনিটা থেমে গেল। শনিবাবার কাঁপুনিটা যে ইচ্ছাকৃত নয় এটুকু বুঝতে পারছিলেন সরিৎশেখর। কোন মানুষকে ধরে রাখলে সেটা বোঝা যায়।

পূজো শেষ হয়ে গেলে অনেকক্ষণ আচ্ছন্ন হয়ে রইলেন সরিৎশেখর। অঙ্গহানি কেন হচ্ছিল তাঁর? অঙ্গহানি বলতে উনি কি বোঝালেন? শারীরিক কোন আঘাত, না কি কোন প্রিয়জনকে হারানো! আজীবন চা-বাগানের চাকরিতে থেকে ধর্মকর্ম কোনদিন করেননি তিনি—জ্যোতিষচর্চা অথবা এ ধরনের ভবিষ্যৎ-বক্তাদের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র আস্থা নেই। এখন তাঁর যে বয়েস সেখানে এলে বেশীর ভাগ বাঙালীরা দীক্ষা নেয়। সরিৎশেখরের চিন্তা তার ধার দিয়েও যায় না। এমন কি হেমলতা যখন সেই কুড়ি-বাইশ বছরে তাঁর কাছে এসে বলল যে সে দীক্ষা নিতে চায়—ভীষণ অস্বস্তিতে পড়েছিলেন তিনি। বালবিধবা মেয়েকে পুনর্বিবাহ দেবার মত পরিবেশ চা-বাগানে ছিল না। হেমলতা সেটাকে পাপ বলে মনে করত। ফলে অনুমতি দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু দীক্ষা নিয়ে হেমলতার কি হয়েছে। মাঝে মাঝে জয়গুরু বলা ছাড়া তিনি আর কোন পরিবর্তন দেখতে পাননি।

শনিবাবাকে দেখে তাঁর প্রথমে ভক্তি জাগেনি। কিন্তু ক্রমশ এই অনুভব তাঁকে আচ্ছন্ন করেছে যে লোকটি তাঁর চাইতে আলাদা জাতের। মানুষের স্তর বলে যদি কিছু থাকে, শনিবাবা সেদিক দিয়ে তাঁর চেয়ে এগিয়ে আছেন। হোমের সময় তিনি শনিবাবাকে স্পর্শ করে বিদ্যুতের স্বাদ পেয়েছেন। সরিৎশেখরের মনে তান্ত্রিকদের সম্পর্কে একটা প্রচ্ছন্ন মোহ কোথাও লুকিয়েছিল, শনিবাবাকে দেখে সেটা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। অথচ শনিবাবাকে আলাদা করে প্রশ্ন করে তিনি উত্তর পেলেন না অঙ্গহানি বলতে কি বোঝাচ্ছেন। এমন কি পূজো-আর্চ্চা শেষ হয়ে গেলে শনিবাবা যখন কিঞ্চিৎ বিশ্রাম নিচ্ছেন মাটিতে গড়িয়ে তখনও তিনি নিরুত্তর থাকলেন।

শনিবাবা এখানে রাত্রিবাস করবেন না। সন্ধ্যের ট্রেনেই ফিরে যাবেন। বাইরে মহীতোষ পরিতোষ খাওয়া-দাওয়ার তদারকি করছে। সাধুচরণকে অন্যান্য বয়স্ক লোকের সঙ্গে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। শনিবাবা শুধু একগ্লাস দুধ আর একটা মিষ্টি খেয়ে ঠাকুরঘরের মাটিতে চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন। তাঁর শিষ্যটি পায়ের কাছে বসে পদসেবা করছে। পুরোহিত মশাই একটা হাতপাখা নিয়ে বাতাস করছেন তাঁকে। পাশে বসে সরিৎশেখর খুব নম্র গলায় আবার প্রশ্নটি তুললেন। শনিবাবা হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে তাঁর দিকে বিশাল লাল চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। সে দৃষ্টির সামনে সরিৎশেখরের খুব অস্বস্তি হতে লাগল। হঠাৎ শনিবাবা বললেন, 'এই পৃথিবীতে তোমার সবচেয়ে প্রিয়জন কে সরিৎশেখর?'

খুব ধীরে নিজের অজ্ঞাতেই সরিৎশেখর বললেন, 'প্রিয়জন!'

'হ্যাঁ! যাকে তুমি নিজের পরেই ভালবাস!'

'আমার—!' সরিৎশেখর কথাটা শেষ করতে পারলেন না।

'তাকে আমার সামনে নিয়ে এস।'

সরিৎশেখর বাইরে এলেন। হই হই করে খাওয়া-দাওয়া চলছে। প্রিয়তোষ খাবারের ঝুড়ি নিয়ে দৌড়ে গেল। মহীতোষ পরিবেশন তদারকি করছে। মেয়েদের দিকে হেমলতা আর মাধুরী ঘোরাঘুরি করছে। ছেলে-মেয়ে-বউমার মুখের দিকে তাকালেন তিনি—এরা সবাই তাঁর প্রিয়জন। এই মুহূর্তে বড় ছেলে পরিতোষের কথা তাঁর মনে পড়ল—অঙ্গহানি তো হয়েই গেছে। হঠাৎ দেখলেন পেয়ারা গাছটার তলায় অনি একা দাঁড়িয়ে, গাছের ডালের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে। ধীরপায়ে নেমে এলেন তিনি। দাদুকে দেখে অনি হাসল। নাতির কাঁধে হাত রাখলেন সরিৎশেখর, 'কি করছ দাদু?'

'একটা নীলরঙের পাখি এই মাত্তর উড়ে গেল!' অনির মুখ উজ্জ্বল।

www.MurchOna.com

'খেয়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'আমার সঙ্গে এস। বাবা তোমাকে ডাকছেন।' সরিৎশেখর নাতিকে নিয়ে ঘরমুখো হলেন। কথাটা শুনেই অনি আড়ষ্ট হয়ে গেল। হেমলতার কথা সে শুনেছে। শনিবাবার কাছে নিয়ে যাচ্ছে দাদু অথচ পিসীমা বারণ করেছেন। শনিবাবাকে দেখলেই তার ভয় লাগে। বুক টিপ টিপ করতে লাগল তার। সরিৎশেখর নাতির অবস্থাটা বুঝতে পেরে বললেন, 'ভয় কি। উনিও তো মানুষ, তোমার কোন ক্ষতি করবেন না। আর আমি তো আছি।'

দাদুর শরীরের সঙ্গে লেপ্টে অনি হাঁটতে লাগল। দৃশ্যটা প্রথমে মাধুরীর নজরে পড়ল। তিনি কয়েক পা এগিয়ে হেমলতাকে বললেন। ওঁরা সবাই অবাক হয়ে দেখলেন অনিকে নিয়ে পুজোর ঘরে ঢুকে সরিৎশেখর দরজা ভেজিয়ে দিলেন ভেতর থেকে।

কাঁচের জানলা ভেতর থেকে বন্ধ, দরজা ভেজানো, ফলে ঘরটার আলো কম, কেমন অস্পষ্ট লাগল অনির। কিন্তু শনিবাবাকে ও স্পষ্ট দেখতে পেল। চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন। বিশাল ভুঁড়ি নিঃশ্বাসের তালে তালে দুলছে। গলার রুদ্রাক্ষের মালা একপাশে নেতিয়ে পড়েছে। ওর সেই শিষ্য পা টিপে যাচ্ছে, পুরোহিত মশাই পাখা হাতে মাথার কাছে বসে ওদের দিকে তাকালেন। অনি দেখল শনিবাবার চোখ বোঁজা। ওরা যে ঘরে ঢুকল যেন টেরই পেলেন না।

সরিৎশেখর নাতিকে পাশে নিয়ে মাটিতে বসলেন। অনি অবাক হয়ে দেখল দাদুর মুখটা কেমন পাল্টে যাচ্ছে। ঝাড়িকাকু যখন কোন অন্যায় করে দাদুর সামনে দাঁড়াত তখন ও রকম মুখ করত। শনিবাবার শরীর থেকে মাত্র হাত তিনেক দূরে বসে ওর ভয়-ভয় ভাবটা হঠাৎ চলে গেল। বরং শনিবাবার শরীরের ওঠা-নামা দেখতে দেখতে ওর বেশ মজা লাগছিল এখন। সরিৎশেখর বললেন, 'ওকে এনেছি!'

শনিবাবা চোখ খুললেন, 'এনেছ! তোমার প্রিয়জন তাহলে এই! কে হয় তোমার?'

সরিৎশেখর বললেন, 'আমার নাতি।'

শনিবাবা বলেলন, 'আর নাতি আছে?'

সরিৎশেখর উত্তর দিলেন, 'না। এ আমার দ্বিতীয় পুত্রের একমাত্র সন্তান। প্রথম পুত্র বিবাহ করে নি এবং আমার সঙ্গে সম্পর্ক নেই।'

শুয়ে শুয়ে শনিবাবা হাত নেড়ে অনিকে ডাকলেন, 'এদিকে এস।'

ডাকের মধ্যে এমন একটা সহজ ভাব ছিল যে অনির একটুও ভয় লাগল না। ও স্বচ্ছন্দে উঠে এসে কাঁছে দাঁড়াতেই পিছন থেকে দাদু ওকে প্রণাম করতে বললেন। হাত নেড়ে নিষেধ করলেন শনিবাবা, 'না, তুমি আমার সামনে বস। কেউ শুয়ে থাকলে কক্ষনো তাকে প্রণাম করবে না। নাম কি?'

বসতে বসতে অনি উত্তর দিল, 'অনিমেষ।'

একগাল হাসলেন শনিবাবা, 'বীর, মানুষ আমার নহি তো মেষ। অনিমেষ মানে জান?'

ঘাড় নাড়ল অনি, 'স্থির, শান্ত।'

শনিবাবা বললেন, 'যার নিমেষ নেই, দেবতা। আবার মাছকেও অনিমেষ বলা হয় জান?' তোমার বয়স কত?'

পেছন থেকে সরিৎশেখর বললেন, 'সাত।'

শনিবাবা বললেন, 'আমার দিকে তাকাও।'

অনি শনিবাবার মুখের দিকে তাকাতেই চোখাচোখি হয়ে গেল। অনি হঠাৎ টের পেল ওর শরীর কেমন হয়ে যাচ্ছে, ও যেন নড়তে-চড়তে পারছে না অথচ সব কিছু বুঝতে দেখতে পারছে। শনিবাবার চোখের মধ্যে ওগুলো কি? নিজের চোখ বন্ধ করতে গিয়েও পারল না অনি।

শনিবাবা বললেন, 'সরিৎশেখর! তোমার এই নাতি বংশছাড়া, যৌবন এলে একে আর তোমাদের মধ্যে পাবে না। এর জন্য মায়া আর বাড়িও না। এই ছেলে যতটা নরম হৃদয়ের ততটাই নির্দয়। তবে হ্যাঁ, এ যদি তোমার সবচেয়ে প্রিয়জন হয় তবে তোমার আর অঙ্গহানির সম্ভাবনা নেই। জন্ম থেকে এ প্রতিরোধ শক্তি নিয়ে এসেছে।'

www.MurchOna.com

সরিৎশেখর ফিসফিস করে বললেন, 'ভবিষ্যৎ?'

'কেউ বলতে পারে না সরিৎশেখর, কারণ সেটা প্রতিমুহূর্তের আবর্তনে পাল্টে যেতে পারে, অতীত স্থির থাকে চিরকাল তাই সেটা বলা যায়। তবে মনে হয়, ও বিদ্বান হবে কিন্তু আঠারো বছর বয়সে রাজনৈতিক কারণে ওকে জেলে যেতে হতে পারে। যদি তাই যায় তাহলে আমি আর কিছু বলতে পারব না। কিন্তু একটা জিনিস বলছি, এর জীবনে বহু নারী আসবে, নারীদের কাছে ও চরম দুঃখ পাবে, নারীদের জন্য কর্মভ্রষ্ট হবে আবার কোন কোন নারীর জন্য ও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে। সরিৎশেখর, একে তুমি কোন কাজে বাধা দিও না কখনো।' কথাগুলো একটানা বলে চোখ বন্ধ করলেন শনিবাবা। তারপর স্থির হয়ে গেলেন। পুরোহিত মশাই-এর ইঙ্গিতে সরিৎশেখর উঠে এসে অনিকে বাইরে নিয়ে এলেন। অনির মনে হয়, অনেকক্ষণ বাদে একটা অন্ধকার ঘর থেকে সে আলোয় এল।

কাজকর্ম সারতে বিকেল হয়ে এল। সকাল থেকে টুপটাপ হালকা চালে যে বৃষ্টিটা খেলা করে যাচ্ছিল, দুপুরের পর সেটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ব্যান্ডেজ জড়ানোর মত আকাশটা মেঘে ঢাকা রইল। এখনও এখানে শীত পড়েনি। মাত্র ত্রিশ মাইলের ফারাকে স্বর্গছেঁড়া আর জলপাইগুড়ির মধ্যে প্রকৃতিদেবী দুরকম চেহারা নিয়ে বিরাজ করেন। ভোরের দিকে একটু হিম হয়। কাল রাত্রে মেঝেতে যারা বিছানা করে শুয়েছিল শেষরাত্রে তারা তাই তড়িঘড়ি উঠে পড়েছে। এবার পূজা কার্তিকের কিছুটা পেরিয়ে। মনে হচ্ছে কালীপূজোর অনেক আগেই শীত পড়ে যাবে। কাল রাত্রে আকাশে মেঘ ছিল, আজ হিমেল হাওয়া দিচ্ছে। মাধুরী অনিকে সোয়েটার পরিয়ে দিয়েছেন। আকাশ দেখে কে বলবে এটা শরৎকাল, কদিন বাদেই পুজো।

শনিবাবা বিকেলের ট্রেনে শিষ্য সমেত ফিরে গেলেন। জলো হাওয়া লাগলে টনসিল ফুলবে বলে অনিমেষকে স্টেশনে নিয়ে যাননি সরিৎশেখর। ওঁরা ফিরতে ফিরতে মেঘে মেঘে প্রায় সন্ধে হয়ে গেল। অনি আজ সারাদিন মায়ের কাছাকাছি। শনিবারা ওর সম্বন্ধে যা ভবিষ্যৎ-বাণী করেছেন তা এখন সবাই জেনে ফেলেছে। হেমলতা ঠাট্টা করে বলেছেন, 'বাবার তো দুটো বিয়ে ছিল, এ ছোঁড়াকে যদি মেয়েমানুষ ধরে কটা বিয়ে করে কে জানে।' মাধুরী চাপা গলায় বলেছিলেন, 'ঐটুকুনি ছেলের সামনে এসব কথা কেন যে ওঁরা বললেন!'

হেমলতা বলেছিলেন, 'ভীমরতি গো ভীমরতি। নাতি নাতি করে বাবা হেদিয়ে গেলেন। তুমি জান না এই কটা মাস আমাকে সব সময় পিটপিট করেছেন যেন অনির কোন কষ্ট না হয়। তুমি হাসছ যে!'

মাধুরী বলেছিলেন, 'আপনার ভাই বলে, আপনিই নাকি ওকে বেশী প্রশ্রয় দেন!'

হেমলতা কিছু বললেন না প্রথমটা, তারপর আস্তে আস্তে বলেছিলেন, 'কিন্তু জেলে যাবার কথাটা শুনে অবধি ভাল লাগছে না আমার। হ্যাঁগো, লোকটা সত্যিই সিদ্ধপুরুষ নাকি?'

কথাটা এক ফাঁকে মহীতোষকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন মাধুরী। সিগারেট খেতে ছাদে গিয়েছিলেন মহীতোষ। এখনও ছাদের অনেক কাজ বাকী। চিলেকোঠার ঘরে প্লাস্টার হয়নি। ইঁটগুলো সিমেন্টের ভাঁজ গায়ে জড়িয়ে রয়েছে। ছাদ থেকে তিস্তা নদীর দিকে চোখ পড়তেই অবাক হয়ে গেলেন মহীতোষ। এত জল বেড়েছে যে ওপার দেখা যাচ্ছে না। জলের রঙ এই এত দূর থেকে কেমন কালচে কালচে লাগছে। এমন সময় অনিকে নিয়ে মাধুরী ছাদে এলেন। ন্যাড়া ছাদে ছেলেকে একা ছাড়তে চাননি মাধুরী। এসে স্বামীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আর তখনি অনির কথাটা, জেলে যাবার কথাটা বললেন তিনি। মহীতোষ কথাটা শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন, 'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, এসব কেউ বিশ্বাস করে। শনিবাবা বোধহয় ভুলে গিয়েছেন যে, দেশ স্বাধীন হয়ে গিয়েছে। এখন আর আঠারো বছর বয়সে কাউকে জেলে যেতে হবে না।'

মাধুরী বললেন, 'কিন্তু এতবড় সিদ্ধপুরুষ—'

মহীতোষ হাসলেন, 'কত বড়?'

মাধুরী ভ্রূকুটি করলেন, 'সবতাতে ঠাট্টা ভাল লাগে না। দুম করে উনি ছেলেটার নামে এ সব বলবেনই বা কেন?'

মহীতোষ বললেন, 'কারণ উনি বাবাকে কব্জা করতে চান। না হলে বাবার প্রিয়জনকে আনতে বলতেন না। আমাদের চৌদ্দপুরুষ কেউ রাজনীতি করেনি—অনি খামোকা জেলে যেতে যাবে কেন? যত্ত সব!'

www.MurchOna.com

মাধুরী বললেন, 'মনটা খারাপ হয়ে গেল!'

মাধুরীর মুখটা খুব বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। অনিকে এক হাতে জড়িয়ে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। সেদিকে তাকিয়ে মহীতোষ বললেন, 'তা দেশ যখন উদ্ধার হয়ে গিয়েছে ও নিশ্চয় চুরি ডাকাতি করে বা নারীঘটিত ব্যাপারে জেলে যাবে—শনিবাবা মেয়েদের সঙ্গে ওর সম্পর্কের কি কথা যেন বললেন?'

মাধুরী ভ্রুকুটি করে সরে দাঁড়াতে গেলেন, 'কি যে সব ছাইপাঁশ বল!' ঘুরে দাঁড়াবার মুহূর্তে ওঁর মাথাটা কেমন করে উঠল। ভিজে ছাদের ওপর পা যেন স্থির থাকছে না। সারাদিন খুব পরিশ্রম গিয়েছে, হেমলতার নিষেধ শোনেননি। খাওয়া-দাওয়ার ঠিক ছিল না, আজ, অবেলায় খেয়ে অম্বল হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ চোখে অন্ধকার দেখলেন।

অনি এতক্ষণ হাঁ করে বাবা-মায়ের কথা শুনছিল, এখন ঘাড়ে মায়ের দুই হাতের প্রচন্ড চাপ পড়তে চিৎকার করে উঠে দেখল মা পা পিছলে পড়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ও মায়ের কোমর জড়িয়ে ধরতে গেল। পেটে চাপ পড়তে মাধুরী চিৎকার করে ছাদের ওপর উপুড় হয়ে পড়লেন। মহীতোষ দৌড়ে এসে স্ত্রীকে আঁকড়ে ধরলেন, 'কি হল, পড়ে গেলে কেন?' চোখের সামনে ওঁকে পড়ে যেতে দেখে হতভম্ব হয়ে পড়েছিলেন প্রথমটা। মারাত্মক কিছু ঘটে গেছে একটা এই রকম বোধ হতে মাধুরীর মুখটা তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কষ্ট হচ্ছে?'

মাধুরী ঘাড় নাড়লেন, 'না।' কিন্তু তাঁর মুখ দেখে মহীতোষ উঠলেন। দরদর করে ঘামছেন মাধুরী। স্ত্রীকে ছাদের ওপর শুইয়ে দিয়ে ছেলেকে বললেন, 'যা, শিগগির পিসীমাকে ডেকে আন।' মাধুরীর চেতনা ছিল, তিনি হাত নেড়ে নিষেধ করতে না করতে অনি এক লাফে ছাদ থেকে চিলেকোঠার সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এল।

পাতলা অন্ধকার নেমে এসেছে বাড়িটার ওপর, ছাদে এতক্ষণ বোঝা যায়নি। নিচে নামতেই অনি দেখল পিসীমা ছোটঘরের বারান্দায় লণ্ঠনগুলো জড়ো করেছেন। ও চিৎকার করে উঠল, 'পিসীমা তাড়াতাড়ি এসো—মা কেমন করছে!' চিৎকারটা হঠাৎ কান্না হয়ে যেতে হেমলতা চমকে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। লণ্ঠন পড়ে রইল, তিনি দুদ্দাড় করে অনির দিকে ছুটে এলেন। সরিৎশেখর সবে ষ্টেশন থেকে এসে পাঞ্জাবি খুলে হাতপাখার বাতাস খাচ্ছিলেন, অনির চিৎকার শুনে তিনিও হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন।

হেমলতা তাঁর ভারী শরীর নিয়ে অনির কাছে এসে দেখলেন ছেলের মুখ সাদা হয়ে গেছে ভয়ে, 'তোর মা কোথায়, কি হয়েছে?'

অনি কথা বলতে পারছিল না, আঙুল দিয়ে ছাদটা দেখিয়ে দিল। এক পলক ওপর দিকে তাকিয়ে হেমলতা গজগজ করতে করতে ছাদের সিঁড়ির দিকে ছুটলেন, 'আঃ, এই সন্ধেবেলায় আবার ছাদে উঠল কেন! এত করে বললাম পেটের বাচ্চা নড়াচাড়া করছে যখন, তখন খাটাখাটুনি করো না, তা শুনবে আমার কথা!'

সরিৎশেখর দ্রুত এসে অনিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছে দাদু?"

অনি কেঁদে ফেলল, 'মা পড়ে গেছে!'

সরিৎশেখর আর দাঁড়ালেন না। অনি দাদুর পেছনে পেছনে ছাদে ছুটল।

বৃষ্টিটা এতক্ষণ থমকে ছিল, বেশ আবার ছোট ছোট ফোঁটা পড়া শুরু হল। এ এক অদ্ভুত ধরনের বৃষ্টি। মেঘ ডাকছে না, সামান্য হাওয়াও নেই, আকাশ চিরে ঝলকে ওঠা বিদ্যুৎতের দেখা নেই। তবু বৃষ্টি পড়ছে, থমথমে মেঘগুলো নিঃশব্দে গলে গলে পড়ছে। মহীতোষ বোকার মত স্ত্রীর পাশে বসেছিলেন, দিদিকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন। হেমলতা কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছে?'

যন্ত্রণায় মাধুরীর চোখ বোজা ছিল, হেমলতার গলা শুনে কিছু বলতে গিয়ে না পেরে মাথা নাড়লেন। মহীতোষ বললেন, 'হঠাৎ মাথা ঘুরে গেছে।' কথাটা শেষ হতে না হতে মাধুরীর শরীরটা কাঁপতে লাগল। তারপর প্রচন্ড যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার জন্য শরীর মোচড়ানো শুরু হল। সারা শরীর ওর ঘামে ভিজে যাচ্ছে, তার উপর বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে এখন। বেশীক্ষণ এভাবে থাকলে ভিজে একসা হয়ে যাবে।

www.MurchOna.com

হেমলতা কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ভাইকে বললেন, 'ওকে নিচে নিয়ে চল।' মহীতোষ একটু বিব্রত হয়ে পড়লেন। দিদিকে ডাকতে পাঠিয়ে তিনি মাধুরীকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মাধুরীর শরীর এমনিতেই ভারী, এখন যেন আরো ওজন বেড়েছে। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নিয়ে যাওয়া খুব সহজ নয়, ওঁর পক্ষে অসম্ভব।

মহীতোষ বললেন, 'তুমি একটা দিক ধরো, চিলেকোঠার দিকে নিয়ে যাই, বৃষ্টিতে ভিজবে না।' হেমলতা বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলেন মাধুরীকে একা মহীতোষের পক্ষে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না, তাই দুজনে ধরাধরি করে চিলেকোঠার ঘরে নিয়ে এলেন। সিঁড়িটা এখানে চট করে ছাদে উঠে আসেনি। সিঁড়ি শেষ হবার পর খানিকটা সমতল জায়গাকে ঘরের মতো ঢেকে ছাদের শুরু। মাধুরীকে সেখানে রাখা হল। এটুকু আনতেই হেমলতা টের পেলেন যে ওকে নিচে নিয়ে যাওয়া বোকামি হত, সামান্য নাড়াচাড়ায় ওর কষ্ট যে অনেক গুণ বেড়ে যাচ্ছে এটা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না।

যৌবন আসতে না আসতে বিধবা হয়েছিলেন হেমলতা। স্বামী ছাড়া তাঁর, মুখ চোখ ভাল করে মনে ধরার আগেই এক রাত্তির অসুখে মরে গেল লোকটা। তারপর এতগুলো বছর শুধু পার করে দেওয়া, এক রাত্তির জন্য নারী হওয়া যাঁর ভাগ্যে ঘটেনি, মা হবার কোন প্রশ্নই তো ওঠে না। স্বর্গছেঁড়ার নির্জন চা-বাগানে বসে সরিৎশেখর মেয়ের আবার বিয়ে দেবার কথা ভাবতেন। বিদ্যাসাগর মশাই অত চেষ্টা করলেন, হয়তো কলকাতা শহরে অহরহ বিধবা-বিবাহ হচ্ছে কিন্তু স্বর্গছেঁড়ার লোকজন ব্যাপারটা চিন্তা করতে পারে না। এমন কি হেমলতাও। স্ত্রীকে দিয়ে মেয়েকে বলিয়েছিলেন, শুনে হেমলতা বলেছিলেন, 'ছি!' আর কথা বাড়াননি সরিৎশেখর। বিয়ের সময় ভাল করে কাপড় পরতো না যে, জীবনে আর ড্রেস করে শাড়ি পরা হল না তাঁর। একেবারে সরুপাড় সাদা শাড়ি অঙ্গে উঠল। বয়স যত বাড়ছে তত ছোট হতে হতে নরুনে ঠেকেছে। ছোটমা যখন স্বর্গছেঁড়ায় এল তখন হেমলতার বয়স বড়জোর আট। সেই বয়স থেকে হাত পোড়ানো শুরু হয়েছে। মহীতোষ বা পরিতোষকে নাইয়ে খাইয়ে দেবার জন্য আর কোন লোক ছিল না। সে ছিল এক রকম। ছোটমা আসার পর হেমলতা চট করে অনেক বড় হয়ে গেলেন। বছর ঘোরার আগেই ছোটমা সন্তান-সম্ভবা হলেন। স্বর্গছেঁড়ার চৌহদ্দিতে তখন ভাল ডাক্তার নেই। নতুন ডাক্তারবাবু তখনও আসেননি। একজন কম্পাউন্ডার কোনরকমে কাজ চালাচ্ছেন। আর তখন লোকজনই বা কত ছিল, এক আঙুল যদি বা ফুরোয়! সরিৎশেখর চেয়েছিলেন বউকে বাপের বাড়ি পাঠাবেন। কিন্তু সেই নদীয়ায় নিয়ে যাওয়া আর হল না। ছোট বউ-এর বাড়ির লোকজন আসব আসব করে শেষ পর্যন্ত এল না। কুলি লাইনের এক বুড়ি যে নাকি মদেসিয়াদের দাই-এর কাজ করে, হেমলতাকে সঙ্গে নিয়ে আঁতুড়ঘরে ঢুকল। সরিৎশেখরের পক্ষে সম্ভব নয় ভেতরে যাওয়া, তিনি বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মেয়েকে নির্দেশ দিতে লাগলেন। হেমলতা প্রথম সন্তান জন্ম দেখলেন। একটু ভয় ছিল, প্রথমটা, কিন্তু বাড়ি তৈরী করার নিষ্ঠা নিয়ে পরপর কাজগুলো করে গেলেন। ছোটমার প্রথম সন্তান আঁতুরঘরেই মারা গিয়েছিল। ছোটমা যতটা না কেঁদেছেন, হেমলতা বোধ হয় অনেক বেশী। তখনও তাঁর বিয়ে হয়নি। বিয়ের পর পরিতোষ জন্মালো। সেদিন আর বুড়ী ধাই ছিল না। হেমলতা একাই সব দিকে সামলেছেন। রান্না করে সবাইকে খাইয়েছেন, কাপড় ছেড়ে আঁতুড়ঘরে গিয়েছেন, সময় এলে নাড়ি কেটেছেন। এমন কি সেদিন অনি যখন হল, তখন তো ডাক্তারবাবু ছিলেন কিন্তু হেমলতাকে ছাড়া চলেনি। অনি হয়েছিল দুপুরে। সরিৎশেখর ঘরের চেয়ারে বসে ঘড়ির ওপর নজর রেখে মাঝে মাঝে উঁচু গলায় জিজ্ঞাসা করছেন। বার বার করে বলছেন ঠিক জন্মমুহূর্তে যেন হেমলতা তাঁকে জানান। শিশুর মত ছটফট করছেন সরিৎশেখর। তারপর যখন হেমলতার খুশীর চিৎকার তাঁর কানে এল 'ছেলে হয়েছে', তখন সরিৎশেখরকে দেখে কে! এক হাতে ঘড়ি নিয়ে লাফাচ্ছেন তিনি, 'একটা বেজে পনের মিনিট—পাঁজিতে লিখেছে মাহেন্দ্রক্ষণ—শঙ্খ বাজাও শঙ্খ বাজাও, দুর্গা দুর্গা।'

এখন চিলেকোঠার ঘরে মাধুরীকে শুইয়ে দিয়ে মুখ তুলতেই হেমলতা সরিৎশেখরকে দেখতে পেলেন। উদ্বেগ মুখে নিয়ে উঠে আসছেন তড়িঘড়ি। চোখোচোখি হতে হেমলতা খুব সাধারণ গলায় বললেন, 'তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকুন, মাধুর বাচ্চা হবে।'

www.MurchOna.com

সরিৎশেখর থমকে দাঁড়ালেন। বউমার বাচ্চা হবে তিনি জানতেন, কিন্তু তার তো সময় হয়নি। কোন গোলমাল হল না তো? বোকার মত বললেন, 'সে কি! তার তো দেরি আছে!'

কোনদিকে না তাকিয়ে হেমলতা বাবাকে বললেন, 'সেসব আপনি বুঝবেন না। তাড়াতাড়ি যান!'

মেয়ের মুখের দিকে এক পলক তাকিয়ে থেকে সরিৎশেখর তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেলেন। মহীতোষ ব্যাপারটা এইরকম দাঁড়াবে ভাবতে পারেননি। এখনও তো মাস দুয়েক দেরি আছে। হঠাৎ ওঁর খুব ভয় হল। মাধুরীর যদি কিছু হয়ে যায়। কোন কথা না বলে মহীতোষ সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন, দরকার হলে ওকে হসপিটালে নিয়ে যেতে হবে। হেমলতা দেখলেন মাধুরী ছটফট করছে। কি করবেন বুঝতে না পেরে মুখ তুলতেই দেখলেন অনি সিঁড়ির মুখে গাল চেপে করুণ চোখে মায়ের দিকে তাকিয়ে আছে। বোধ হয় ওপরে উঠে আসতে সাহস পাচ্ছে না। হেমলতা হেসে বললেন, 'যা বাবা, তাড়াতাড়ি নিচ থেকে একটা বালিশ আর চাদর নিয়ে আয়।' কাজ করতে পেরে অনি যেন বেঁচে গেল।

কোনমতে বিছানা করে মাধুরীকে শুইয়ে দিয়ে হেমলতা বললেন, 'অনি, তুই মায়ের কাছে বোস আমি গরম জল করি গে!' পিসিমা চলে গেলে অনি খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। বাইরে এখন বেশ বৃষ্টি পড়ছে। ছোট বাড়ি থেকে চাদর-বালিশ আনতে গিয়ে ও একটু ভিজেছে। অন্য সময় মা নিশ্চয় বকত, এখন কিছু বলছে না। মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ওর কান্না পাচ্ছিল। মা যে খুব কষ্ট পাচ্ছে এটা ও বুঝতে পারছিল।

পিসীমা তখন দাদুকে বলল মায়ের বাচ্চা হবে। বাচ্চা হলে এত কষ্ট পেতে হয় কেন? মায়ের মুখটা একদম সাদা হয়ে গিয়েছে। ও মায়ের পাশে এসে সন্তর্পণে বসে পড়ল। এখন কাছে-পিঠে কেউ নেই, কারো গলা শোনা যাচ্ছে না। চিলোকোঠার দরজাটা আলো আসার জন্যে অথবা ভুলে খোলা রয়েছে। অনি এখান থেকে বৃষ্টি পড়া দেখতে পেল। জলের ছাঁট ঘরের মধ্যে সামান্যই আসছে। অনির খুব ইচ্ছে হল মায়ের মুখে হাত বোলাতে। ঠিক সেই সময় মাধুরী চোখ খুললেন। অনি দেখল মাধুরীর চোখের কোণে দু ফোঁটা জল টলমল করছে। মাধুরী একবার দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ালেন, তারপর মাথা ঘুরিয়ে ঘরটাতে চোখ বোলালেন। মায়ের চোখে জল দেখতে পেয়ে অনি ফুঁপিয়ে উঠল। মাধুরী খুব ধীরে ধীরে একটা হাত তুলে ছেলের কোলের ওপর রাখতেই অনি মায়ের বুকের ওপর ভেঙে পড়ল। অনেকক্ষণ চুপচাপ ছেলেকে বুকের মধ্যে রেখে মাধুরী বললেন, 'হ্যাঁরে বোকা, কাঁদছিস কেন?'

ফিসফিসিয়ে অনি বলল, 'তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে না?'

'আমার কষ্ট হলে তোর খারাপ লাগে, না রে!'

অনি ঘাড় নাড়ল। মাধুরী আস্তে আস্তে বললেন, 'আমি যদি না থাকি তুই আমাকে ভুলে যাবি না তো!'

অনি দুই হাতে মাকে আঁকড়ে ধরে কেঁদে উঠল শব্দ করে। মাধুরী কেমন ঘোরের মধ্যে বললেন, 'আমি যদি না থাকি তুই একা একা আকাশের দিকে তাকিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলিস, আমি ঠিক শুনতে পাব। অনি, আমি তোকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারব না রে।'

অনি কোন কথা বলতে পারছিল না, ওর ঠোঁট দুটো থর থর করে কাঁপছিল। মাকে ও রকম করে কথা বলতে ও কোনদিন শোনেনি। মা কেন, ওকে ছেড়ে চলে যাবে! বাচ্চা হলে কি কাউকে চলে যেতে হয়! ও দেখল মাধুরী একটানা কথা বলে কেমন নিস্তেজ হয়ে গেছেন, অনেক দূর দৌড়ে এলে যেমন হয় মায়ের বুক তেমনি ওঠানামা করছে। হঠাৎ ও মায়ের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে গেল। মাধুরী যেখানে শুয়ে আছেন তার নিচ দিকটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। এটা কি সত্যি রক্ত? কোত্থেকে এত রক্ত এল? মায়ের তো কোথাও কেটে যায়নি। এর আগে কতবার তরকারি কুটতে গিয়ে মায়ের হাত বঁটিতে কেটে গিয়ে রক্ত পড়েছে কিন্তু সে তো কয়েক ফোঁটা মাত্র। অনি আস্তে আস্তে উঠে মায়ের পায়ের কাছে এসে দাঁড়াল। কুঁজো ভেঙে গেলে যেমন জল গড়িয়ে যায় তেমনি একটা মোটা লাল ধরা চলে যাচ্ছে কোণার দিকে। মায়ের পায়ের গোড়ালি সেই স্রোতটা থেকে সরিয়ে দিতে গেল অনি আর তখনি ওর আঙুল চটচটে লাল হয়ে গেল। মাধুরী চোখ খুলে দেখলেন ছেলে চোখের সামনে আঙুল নিয়ে দেখছে। চিৎকার করে উঠলেন, 'ওরে মুছে ফেল, তোর হাত থেকে রক্ত মুছে ফেল।' কিন্তু ক্রমশ কথা বলার শক্তিটা চলে যাচ্ছিল ওঁর। চোখের সামনে সব ঝাঁপসা হয়ে আসছে। অনি ঝাপসা—মহীতোষ ঝাপসা—দু-চোখে এত জল থাকে কেন?

www.MurchOna.com

এই সময় সিঁড়িতে কয়েক জোড়া শব্দ পেল অনি। একটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে যেন দম আটকে যাচ্ছিল ওর, হঠাৎ মনে হল ডাক্তারবাবু এসে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে। হেমলতা একটা বড় লণ্ঠন নিয়ে আগে উঠে এলেন। ছাদের এই ঘরটা এতক্ষণে আবছা হয়ে এসেছে। হেমলতার পিছনে পিছনে একজন বৃদ্ধ, সরিৎশেখর, মহীতোষ ব্যাগ হাতে নিয়ে উঠে আসতে দেখল অনি। ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল সবাই, হ্যারিকেনের আলোয় রক্তস্রোত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। বৃদ্ধ লোকটি বললেন, 'ব্লিডিং হচ্ছে বলেননি তো!'

হেমলতা বললেন, 'আমি একটু আগে নিচে গেলাম, তখনো দেখিনি।' অনি বুঝতে পারল এই লোকটিই ডাক্তার, কারণ তৎক্ষণাৎ তিনি মাধুরীর পাশে বসে একটা হাত তুলে নিয়ে নাড়ি দেখতে লাগলেন। তারপর খুব গম্ভীর মুখে বললেন, 'আপনারা নিচে চলে যান।' সরিৎশেখর অনিকে এক হাতে আঁকড়ে ধরে নিচে নেমে গেলেন।

মহীতোষ খানিক ইতস্তত করে ব্যাগটা মেঝেতে রাখতে হেমলতা বললেন, 'গরম জলের সসপ্যানটা এনে দে শিগগীর।'

মহীতোষ নিচ থেকে জল ওপরে নিয়ে এসে দেখল সরিৎশেখর অনিকে জড়িয়ে ধরে চুপচাপ সিঁড়ির শেষ ধাপে বসে আছেন। ছেলেকে দেখে সরিৎশেখর বললেন, 'হাসপাতালে রিমুভ করা যাবে?'

ছোট ঘর থেকে আনা লণ্ঠনটা নামিয়ে মহীতোষ ঘাড় নাড়লেন, 'জানি না। করতে হলে এখনি করা দরকার। সেনপাড়ার দিকটায় তিস্তার জল ঢুকে পড়েছে।'

সরিৎশেখর বললেন, 'এ তো প্রতি বছরই হয়।'

মহীতোষ বললেন, 'দেখলেন না মাইকে আনাউন্স করছে। মনে হচ্ছে এবার খুব ভোগাবে।'

কথাটা শেষ করে মহীতোষ দেখলেন প্রিয়তোষ দরজায় দাঁড়িয়ে। এঁদের দেখেই সে চেঁচিয়ে উঠল, 'ফ্ল্যাড আসছে, সামনের মাঠটা জলে ডুবে গেছে। চটপট মালপত্র ছাদে তোল।'

মহীতোষ তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে শুনলেন ওঁদের উঠোনে বাগানে জল শব্দ করছে। এতক্ষণ খেয়াল ছিল না, হঠাৎ ঠান্ডা বাতাস লাগতে টের পেলেন ওঁর সমস্ত জামাকাপড় ভিজে চুপসে গেছে, সরিৎশেখরেরও এক অবস্থা। অন্ধকারে এতক্ষণ যেটুকু দেখা যাচ্ছিল আর তাও দেখা যাচ্ছে না। ঝিম ঝিম বৃষ্টি পড়ছে আর হঠাৎ সমস্ত পৃথিবী ধাঁধিয়ে দিয়ে বিদ্যুৎ চমকে উঠতেই মহীতোষ দেখলেন ঘোলাজলের স্রোত উঠোনময় কিলবিল করছে।

বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে মহীতোষ দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন, 'বন্যা এসে গেছে, এখন তো নিয়ে যাওয়ার কোন প্রশ্ন ওঠে না।'

প্রিয়তোষ বলল, 'কি হয়েছে?"

মহীতোষ বললেন, 'তোর বউদির পড়ে গিয়ে ব্লিডিং হচ্ছে, অবস্থা সিরিয়াস।'

প্রিয়তোষ বলল, 'সে কি! কখন?'

সরিৎশেখর বিরক্তিচাপা গলায় বললেন, 'বাড়িতে কতক্ষণ থাক যে এসব খবর রাখবে? যাও জিনিসগুলো যাতে জলে না ডোবে দেখগে যাও।'

মহীতোষ একবার ওপরের দিকে তাকিয়ে জলের মধ্যে গেলেন। অন্ধকারে চলতে কষ্ট হচ্ছে, প্রিয়তোষ ওঁর পিছনে। ছোট ঘরে তখন পায়ের পাতার ওপর জল। কি নেওয়া যায় কি নেওয়া যায় ভাবতে না পেরে আবিষ্কার হল অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। দ্রুত জল বাড়ছে। হাঁটুর কাছটা যখন ভিজে গেল তখন মহীতোষ টর্চটা খুঁজে পেলেন। খাটের অনেকটা এখন জলের তলায়। লেপ তোশক নিয়ে যাবার কোন মানে হয় না। মেঝেয় রাখা সুটকেসগুলোর ওপর জল বয়ে যাচ্ছে। সেগুলোকেই টেনে-টেনে খাটের ওপর রাখা হল। ভিজে গেছে সব। সরিৎশেখরের টাকাপয়সা আলমারিতে আছে, অদ্দুর জল উঠবে না নিশ্চয়ই। ঘরটাকে সামলে কিছু শুকনো কাপড়চোপড় আর গায়ের চাদর নিয়ে ওঁরা বেরিয়ে এলেন। আসবার সময় মহীতোষ মাধুরীর সুটকেসটা তুলে নিলেন। মহীতোষের টাকা এই সুটকেটে আছে। সুটকেসটা এর মধ্যে ভিজে ঢোল হয়ে গেছে।

নতুন বাড়ির বারান্দায় ইঞ্চি কয়েক নিচে জল। মহীতোষ ছাদের সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়াতে দেখলেন সরিৎশেখর ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলছেন। হ্যারিকেনের আলোয় দেওয়ালে ওঁদের ছায়া

www.MurchOna.com

কাঁপছে। ছেলেকে দেখে সরিৎশেখর কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 'আমি কিছু ভাবতে পারছি না মহী, ভগবান এ কি করলে!'

মহীতোষ ডাক্তারবাবুর দিকে তাকালেই তিনি বললেন, 'হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারলে একটা চেষ্টা করা যেত। কিন্তু যা অবস্থা—জল শুনলাম বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছে!' মহীতোষ ঘাড় নাড়লেন।

'হয়ে গেল তাহলে!' ডাক্তারবাবু ছটফট করে উঠলেন, 'ভোরের আগে কোন বার জল কমে না। এইজন্যই আমি আসতে চাইছিলাম না। এখন আমি বাড়ি যাই কি করে। অন্ধকারে জল ভেঙে যেতে কোথায় পড়ব—ইস!'

মহীতোষ বললেন, 'ডাক্তারবাবু, আপনি চলে গেলে ওকে নিয়ে আমরা—না, আপনার যাওয়া চলবে না। আপনি ওকে দেখুন, আমি আপনার বাড়িতে খবর দিয়ে আসছি।'

কথাটা শেষ হতেই প্রিয়তোষ' আমি খবর দিয়ে আসি' বলে অন্ধকারে ছুটে বেরিয়ে গেল। সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ডাক্তারবাবু বললেন, 'আমি আর দেখে কি করব! চোখের সামনে মেয়েটা চলে যাচ্ছে আমি ফ্যালফ্যাল করে দেখছি। ভগবানকে ডাকুন।'

সরিৎশেখর বললেন, 'মিসক্যারেজ হয়েছে বললেন, বাচ্চাটা—'

'সেটা বেরুলে তো বুঝতে পারা যেত। এতগুলো ইঞ্জেকশন দিলাম, রক্ত বন্ধ করা যাচ্ছে না!' বিড়বিড় করে বকতে বকতে ডাক্তারবাবু ওপরে উঠে গেলেন।

এখন এখানে শুধু ঝোড়ো বাতাস ছাড়া কোন শব্দ নেই। বাইরে তিস্তার জল নতুন বাড়ির বারান্দার গায়ে ধাক্কা লেগে যে শব্দ তুলছে তাও বাতাসে চাপা পড়ে গেছে। মহীতোষ পাথরের মত দাঁড়িয়ে। সরিৎশেখর নাতিকে দুহাতে জড়িয়ে ওপরের দিক মুখ করে বসে আছেন সিঁড়িতে। লণ্ঠনের আলোয় দেওয়ালে পড়া তাঁদের ছায়াগুলো নিয়ে বাতাস উদ্ভট ছবি এঁকে এঁকে যাচ্ছে। সময় এখন খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগুচ্ছে। যে কোন মুহূর্তে ওপর থেকে কোন শব্দ ভেসে আসবে এই রকম একটা আশঙ্কায় দুটো শরীর কাঁটা হয়ে রয়েছে। দাদুর বুকের ওপর মাথা রেখে অনি অনেকক্ষণ ধরে দুপদুপ বাজনা শুনছিল। এতক্ষণ যে সব কথাবার্তা এখানে হয়ে গেল তার প্রতিটি শব্দ ওর কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। মা আর থাকবে না! ডাক্তারবাবু ওদের ভগবানকে ডাকার কথা বললেন, কিন্তু কেউ ডাকছে না কেন? অনির মনে পড়ল স্বর্গছেঁড়ায় এক বিকেলবেলায় হেমলতা ওকে বলেছিলেন সব চেয়ে বড় ভগবান হল মা। অনি সমস্ত শরীর দিয়ে মনে মনে মাকে ডাকতে লাগল। চোখ বন্ধ করে নিঃশব্দে 'মা, মা' উচ্চারণ করতে করতে অনি দেখতে পেল মাধুরী ওর কাছে এসে দুহাতে ওকে জড়িয়ে ধরেছেন। মায়ের গায়ের সেই গন্ধটা বুক ভরে নিতে নিতে ও শুনতে পেল পিসীমা সিঁড়ির মুখে এসে বলছেন, 'অনিকে একটু ওপরে নিয়ে আসুন।'

কথাটা শুনে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল অনি। অন্ধকারে সিঁড়িগুলো লাফ দিয়ে পেরিয়ে এসে পিসীমার মুখোমুখি হয়ে গেল ও। অনিকে দেখে হেমলতা দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন। অনি বুঝতে পারল পিসীমা কাঁদছেন। কয়েক পা এগিয়ে হেমলতা আবার থমকে দাঁড়ালেন। অনির মাথাটা ওঁর প্রায় কাঁধ-বরাবর। অনি শুনতে পেল কেমন কান্না-কান্না গলায় পিসীমা ওকে বলছেন, 'অনি বাবা, আমার সোনাছেলে, তোমার মা এখন ভগবানের কাছে চলে যাচ্ছেন, যাওয়ার আগে তোমাকে দেখতে চাইছেন।' হুহু করে কেঁদে ফেললেন হেমলতা।

অনি বলল, 'মা-ই তো ভগবান। তবে মা কার কাছে যাচ্ছে?'

ফিসফিস করে হেমলতা বললেন, 'আমি জানি না বাবা, তুমি কোন কথা বলো না, বেশী কেঁদো না, তাহলে মা'র যেতে কষ্ট হবে।' পিসীমার বারণ তিনি নিজেই মানছিলেন না।

মা শুয়ে আছেন চুপচাপ। ওঁর শরীর নড়ছে না। ডাক্তারবাবু মাটিতে বাবু হয়ে বসে আছেন। হেমলতা অনিকে এগিয়ে দিলেন সামনে, 'মাধু, অনি এসেছে দ্যাখ।'

চোখের পাতা নাচল, পুরো খুলল না। অনি দেখল মায়ের চোখের কোল জলে ভরে গেছে। অনি মাধুরীর মুখের পাশে মুখ নিয়ে ডাকল, 'মা, মাগো!'

মাধুরী ঘোরের মধ্যে বললেন, 'অনি, বড় কষ্ট হচ্ছে রে।'

ফুঁপিয়ে উঠল অনি, 'মা, মাগো।'

www.MurchOna.com

মাধুরী ফিসফিস করে বললেন, 'আমি তোর সঙ্গে থাকব রে, তুই জেলে গেলেও তোর সঙ্গে থাকব।' অনি পাগলের মত মায়ের বুকে মুখ চেপে ধরে ফোঁপাতে লাগল। অনেকক্ষণ পরে বাইরের বৃষ্টির শব্দ, হাওয়ার শব্দ ছাপিয়ে হেমলতার বুকফাটা চিৎকার কানে আসতে তিনি অনি মায়ের বুক থেকে মাথা সরিয়ে অবাক হয়ে দেখল পিসীমা আর বাবা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কাঁদছে। ওর পাশ দিয়ে দুটো পা দ্রুত ছাদের দিকে চলে গেল। পিছন থেকে অনি দেখল দাদু এই বৃষ্টির মধ্যে এই অন্ধকারে ছাদে হেঁটে যাচ্ছেন।

মায়ের দিকে তাকাল অনি। স্বর্গছেঁড়ায় অনেক রাত্রে ঘুম ভেঙে ও মাধুরীকে এমনি ভাবে শুয়ে থাকতে দেখত। ঘুমিয়ে পড়লে মাধুরী সহজে জাগতে চাইতেন না। ভীষণ বাথরুম পেয়ে গেলে অনি মায়ের গায়ে চিমটি কাটতো। তখন মাধুরী ধড়মড় করে উঠে বসতেন। অনি বুঝতে পারছিল আর মা উঠে বসবে না। মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অনি চিৎকার করে কেঁদে উঠল।

মাঝরাতেই জল নেমে গিয়েছিল। ভোরের আলো ফুটতে চারধার একটা অদ্ভুত দৃশ্য নিয়ে জেগে উঠল। সমস্ত শহরটার ওপর কয়েক ইঞ্চি পলি পড়ে গেছে। সূর্যের আলো পড়ায় চকচক করছে সেগুলো। ভেসে আসা মৃত গরু-ছাগল আটকে গেছে এখানে সেখানে। তিস্তার জল করলার মধ্যে ঢুকে যাওয়ায় নিচু জায়গাগুলো এখনো জলের তলায়। শ্মশানটা শহরের একপ্রান্তে, মাসকলাইবাড়ির কাছে। উঁচু জায়গা বলে সে অবধি জল পৌঁছয়নি। লোকজন যোগাড় করে এই পাঁকের ওপর দিয়ে হেঁটে শ্মশানে আসতে দুপুর হয়ে গেল। ছোট ঘরের অনেক জিনিসপত্র গেলেও খাটটা বেঁচেছে। সরিৎশেখর সেখানে সকাল থেকে শুয়ে রইলেন। কাল রাত্রে বৃষ্টিতে ভিজে সর্দিজ্বর হয়েছে ওঁর। বার বার বলছেন, 'আমার অঙ্গহানি ঠেকাতে পারলো না কেউ।'

মৃতদেহ নিয়ে যাবার লোকের অভাব হয় না। তারা সবাই হরিধ্বনি দিতে দিতে মাধুরীকে নিয়ে যাচ্ছিল। প্রিয়তোষ কাঁধ দিয়েছে। হেমলতা কাল রাত থেকেই সেই যে অনিকে জড়িয়ে ধরে বসেছিলেন মাধুরীর পাশে, একবারও ওঠেননি। কাঁদতে কাঁদতে অনি কখন তাঁর বুকে ঘুমিয়ে পড়েছে, আবার জেগেছে, হেমলতা পাথর। দেহ নিচে নামিয়ে খাটিয়া সাজিয়ে কেউ একজন ডাকল তাঁকে, "এয়োস্ত্রীকে যাবার সময় সিঁদুর পরিয়ে দিতে হয়, সিঁদুর নিয়ে আসুন।' ঠিক তখনি হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন হেমলতা, আমি চাইনি গো, কাল সকালে জোর করে আমাকে দিয়ে সিঁদুর পরালো ও আমি যে বিধবা, সেই পাপে মেয়েটা চলে গেল গো—।'

মহীতোষ কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'থাক, সিঁদুর পরাতে হবে না।'

সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠলেন সরিৎশেখর, ছোট ঘরের খাটে শুয়ে কান খাড়া করে সব কথা শুনছিলেন, 'খবরদার, আমার বাড়ির বউকে সিঁদুর না পরিয়ে বাইরে নিয়ে যাওয়া চলবে না।'

এখন সিঁদুর মাথায় মাধুরী শ্মশানে পৌঁছে গেলেন। ওদের থেকে খানিক দূরত্বে ছেলের হাত ধরে মহীতোষ হেঁটে এলেন। পলি জমা রাস্তায় হাঁটতে ছেলেটার কষ্ট হচ্ছে কিন্তু মুখে কিছু বলছে না। মহীতোষ কাল থেকে ছেলের সঙ্গে কথা বলেননি। এখন আসার সময় ভয় পাচ্ছিলেন অনি হয়তো মাধুরীকে নিয়ে কোন প্রশ্ন ওঁকে করবে। কিন্তু আশ্চর্য, অনি গম্ভীর মুখে হেঁটে এল। মহীতোষের মনে হল এক রাত্রে ছেলেটা অনেক বড় হয়ে গিয়েছে।

শ্মশানে ওরা যখন চিতা সাজাচ্ছিল তখন ছেলেকে জড়িয়ে ধরে চুপচাপ বসেছিলেন মহীতোষ। কাঁদতে ভয় করছিল অনির জন্যে। আজকে এই শ্মশানে আর কোন চিতা জ্বলছে না। একমাত্র যেটি সাজানো হচ্ছে সেটি মাধুরীর জন্য।

হঠাৎ অনি কেমন কাঠ-কাঠ গলায় বলল, 'মাকে ওরা শুইয়ে রেখেছে কেন?' মহীতোষ জবাব দিতে গিয়ে দেখলেন তাঁর গলা আটকে যাচ্ছে। অনেক কষ্টে বললেন, 'ভগবান কাউকে নিয়ে গেলে তাঁর শরীরটা পুড়িয়ে ফেলতে হয়।'

হঠাৎ একজন এগিয়ে এল ওঁদের দিকে, 'দাদা, আর দেরি করা ঠিক হবে না। মুখাগ্নি তো ও-ই করবে?' মহীতোষ ঘাড় নাড়লেন। ছেলেটি অনির হাত ধরল, 'এস তুমি।' তারপর অনিকে নিয়ে হাঁটতে বলল, 'মা তো চিরকাল থাকে না, আমারও মা নেই, বুঝলে?'

www.MurchOna.com

পর পর সুন্দর করে কাঠ সাজিয়ে মাধুরীকে শোয়ানো হয়েছে। মাধুরীর চুল খুব বড়, চিতার একটা দিক কালো করে ঢেকে রেখেছে। প্রিয়তোষ এসে অনির পাশে দাঁড়াল। অনি দেখল কয়েকজন পাটকাঠিতে আগুন ধরাচ্ছে। মাকে খুব শান্ত দেখাচ্ছে এখন। অনি, আমি তোমার সঙ্গে আছি। মা, মাগো। অনি ডুকরে কেঁদে উঠতে প্রিয়তোষ বলল, 'কাঁদিস না, অনি, কাঁদিস না।'

আগের ছেলেটি একগোছা পাটকাঠিতে আগুন জ্বালিয়ে এনে অনির সামনে ধরল, 'নাও, মায়ের মুখে আগুনটা একটু ছুঁইয়ে দাও।'

কথাটা শুনে আঁতকে উঠল ও। সদ্য জ্বালা আগুনের শিখাটা যদিও ছোট কিন্তু লকলক করছে। সেদিকে তাকিয়ে অনি বলে উঠল, 'আগুন দিলে মুখ পুড়ে যাবে না।'

কথাটা মহীতোষের কানে যেতে মহীতোষ ডুকরে কেঁদে উঠলেন। ছেলেটি আর দেরি করল না, অনির একটা হাত টেনে নিয়ে পাটকাঠির ওপর চেপে ধরে নিজেই জোর করে আগুনের শিখাটা মাধুরীর মুখে ছুঁইয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে আরো কয়েকটা শিখা চিতার আশেপাশে লকলক করে উঠল যেন। প্রিয়তোষ অনিকে সরিয়ে নিয়ে এল চিতার কাছে থেকে। ওকে ধরে উল্টোদিকে হাঁটতে লাগল সে। কয়েক পা হেঁটে অনি শুনতে পেল পেছন থেকে অনেকগুলো গলায় চিৎকার উঠছে, 'বল হরি, হরি বোল।'

হঠাৎ কাকার হাতের বাঁধন থেকে ছিটকে সরে গিয়ে অনি মায়ের চিতার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। দাউ দাউ করে অজস্র শিখা নিয়ে আগুন জ্বলছে। শব্দ হচ্ছে কাঠ পোড়ার। আগুন ক্রমশ দলা পাকিয়ে লাল হয়ে নাচতে শুরু করেছে। অনি আগুনের মধ্যে অস্পষ্ট একটা অবয়ব দেখতে পেল, যাকে মা বলে কিছুতেই চেনা যায় না।

যে ছেলেটি ওর হাত ধরে মুখাগ্নি করাল সে অনির দিকে এগিয়ে এল, 'তোমার হাতে কি লেগেছে? শুকিয়ে কালচে হয়ে আছে।'

নিজের হাতটা চোখের সামনে ধরতেই অনির মনে পড়ে গেল একটা লাল স্রোতের কথা, কাল রাত্রে মায়ের শরীর থেকে যেটা বেরিয়ে এসেছিল। কখন সেটা শুকিয়ে কালচে হয়ে গেছে, রক্ত বলে চেনা যায় না। হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল সে, কাঁদতে কাঁদতে বলল, মার রক্ত।

॥ ৩ ॥

তাঁকে প্রশ্ন করা হল, 'যিনি তোমাকে গর্ভে ধরেছেন, স্তন্যদান করে জীবন দিয়েছেন, তোমাকে জ্ঞানের আলো দেখিয়েছেন সেই তিনি আর যিনি মাতৃজঠর থেকে নির্গত হওয়া মাত্র তোমার জন্য জায়গা দিয়েছেন, তাঁর সংস্কৃতি তাঁর সংস্কার রক্তে মিশিয়ে দিয়েছেন এই তিনি—কাকে তুমি আপন বলে গ্রহণ করবে?' তিনি বললেন, 'দুজনকেই। কারণ একজনের সঙ্গে নাড়ির বাঁধন ছিন্ন হওয়া মাত্রই আর একজনের সঙ্গে নাড়ির বাঁধন যুক্ত হয়েছে। কিন্তু ছিন্ন না হলে যে যুক্ত হতো না। তাই দুজনেই আমার আপন।

তাঁকে বলা হল, 'যদি একজনকে ত্যাগ করতে বলা হয় তবে কাকে ত্যাগ করবে? তিনি বললেন, 'এই মাটি তো তাঁরও জননী। তাই এর জন্য জীবন দিলে তিনিই ধন্য হবেন। সে ত্যাগ মানে আরো বড় করে পাওয়া, সে ত্যাগেই আমার আনন্দ।'

সমস্ত ক্লাস চুপচাপ, নতুন স্যার একটু থামলেন, তারপর উদগ্রীব হয়ে থাকা মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সেই মায়ের পায়ে যখন লোহার বেড়ি পরিয়ে দিয়েছিল ইংরেজরা তখন তাঁর এমন কত দামাল ছেলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল দুঃখিনী মায়ের মুখে হাসি ফোটাতে। একবারে না পারলে বলেছিল, একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি। এই মা দেশমাতৃকা। তোমরা নতুন ভারতবর্ষের নাগরিক। আজ আমাদের মায়ের পায়ে বেড়ি নেইকো, অনেক রক্তের বিনিময়ে তিনি আজ মুক্ত কিন্তু এতদিনের শোষণে তিনি আজ রিক্তা, মলিন, শীর্ণা। তোমাদের ওপর দায়িত্ব তাঁর মুখে হাসি ফিরিয়ে আনবার। নাহলে তোমরা যাঁদের উত্তরাধিকারী তাঁদের কাছে মুখ দেখাতে পারবে না ভাই। ব্যাস, আজ এই পর্যন্ত।' টেবিলের ওপর থেকে ডাস্টার বই তুলে নিয়ে স্যার ক্লাস-রুম থেকে সোজা মাথায় বেরিয়ে গেলেন। তাঁর খদ্দরের পাঞ্জাবির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অনিমেষ বুঝতে পারেনি ওর সারা গায়ে কাঁটা

www.MurchOna.com

দিয়ে উঠেছে। এইসব কথা এই স্কুলে নতুন স্যার আসার আগে কেউ বলেনি। ব্যাপারটা ভাবলেই কেমন হয়ে যায় মনটা। নতুন স্যার বলেছেন, 'শিবাজীও একজন স্বাধীনতা আন্দোলনের যোদ্ধা ছিলেন। শিবাজীর কথা শুনলে মনের মধ্যে কিছু হয় না কিন্তু সুভাষচন্দ্র বসু যখন বলেন 'গিভ মি ব্লাড' তখন হৃৎপিন্ড দপদপ করে। এই ব্লাড শব্দটা উচ্চারণ করার সময় নতুন স্যার এমন জোর দিয়ে বলেন অনিমেষ চট করে সেই ছবিটা দেখতে পায়, নিজের আঙুলগুলোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে ও। ভীষণ কান্না পেয়ে যায়।

নতুন স্যার থাকেন হোস্টেলে। ওদের স্কুলের সামনে বিরাট মাঠ পেরিয়ে হোস্টেল। ক'দিনের মধ্যে অনিমেষের সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেল নতুন স্যারের। ওদের স্কুলের অন্যান্য টিচাররা দীর্ঘদিন ধরে পড়াচ্ছেন। ওঁরা নতুন স্যারের সঙ্গে ছাত্রদের এই মেলামেশা ঠিক পছন্দ করেন না। একমাত্র ড্রিল স্যার বরেনবাবুর সঙ্গে নতুন স্যারের বন্ধুত্ব আছে। ওঁরা দুজন এক ঘরে থাকেন।

অনিমেষের পড়ার চাপ পড়েছে বলে সরিৎশেখর ভোরে আর ওকে বেড়াতে যেতে বলেন না। কিন্তু এইটুকু ছেলের মধ্যে যে চাঞ্চল্য ছটফটানি থাকার কথা অনিমেষের মধ্যে তা নেই। সারাদিনই যখনই বাড়িতে থাকে তখনই মুখ গুঁজে বই পড়ে। বই পড়ার এই নেশাটা ওর মধ্যে ঢুকিয়েছিল প্রিয়তোষ। ঢুকিয়ে দিয়ে হাওয়া হয়ে গিয়েছে সে। সরিৎশেখরের জীবনে একটি আঘাত এই ছোট ছেলে। দিন-রাত বাড়ির বাইরে পড়ে থাকত, কখন যেত কখন আসত হেমলতা ছাড়া কেউ টের পেত না। রাগারাগি করতে করতে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন সরিৎশেখর। চাকরিবাকরি করে না, তার কোন সাহায্য হচ্ছে না, এছাড়া এই ছেলের বিরুদ্ধে ওঁর অভিযোগ করার অন্য কারণ নেই। অনি তখন সবে স্কুলে ভর্তি হয়েছে। বাড়ি এলে অনির সঙ্গে আড্ডা হত খুব। স্বর্গছেঁড়ায় ওর যে আকর্ষণের আভাস তিনি হেমলতার কাছে পেয়েছেন সেটা নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা ছিল। কিন্তু ও যে আর স্বর্গছেঁড়ায় যায় না, জোর করেও তাকে স্বর্গছেঁড়ায় পাঠাতে পারেননি ও কথাও তো সত্যি।

তারপর সেইদিনটা এল। তিন দিন বাড়ি আসেনি প্রিয়তোষ। সরিৎশেখর এখানে সেখানে ওঁকে খুঁজেছেন। যে ক'জন ওর সমবয়সী ছেলেকে ওর সঙ্গে ঘুরতে দেখেছেন তারাও ওর হদিস দিতে পারেনি। বিরক্ত চিন্তিত সরিৎশেখর ঠিক করেছিলেন প্রিয়তোষ এলে পাকাপাকি কথা বলে নেবেন ভদ্রভাবে সে বাড়িতে থাকতে পারবে কিনা।

তখন ওঁরা নতুন বাড়িতে উঠে এসেছেন। ছোট বাড়িটায় পুরোন জিনিসপত্রের গুদাম করে রাখা হয়েছে। মাঝখানের বড় ঘরটায় সরিৎশেখর একা শোন, লাগোয়া ঘরটায় হেমলতা। বাইরের দিকের ঘরটায় প্রিয়তোষ এবং অনিমেষ থাকত। অনিমেষকে সে বছরই প্রথম স্কুলে ভর্তি করা হয়েছে, খুব কড়া স্কুল। এ জেলার মধ্যে এই স্কুলের নামডাক সবচেয়ে বেশী। সরিৎশেখর নিজে গিয়ে ওকে ক্লাসে বসিয়ে এসেছেন। ভেবেছিলেন ক্লাসে ঢুকে ছেলেটা নিশ্চয়ই কান্নাকাটি করবে। কিন্তু অনি ওঁর চলে আসার সময় খুব গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল। অদ্ভুত পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে ছেলেটার। সেই জন্ম থেকে তিনি ওকে দেখছেন, ওর নাড়িনক্ষত্র জানা, কিন্তু মায়ের মৃত্যুর পর ছেলেটা রাতারাতি পাল্টে যাচ্ছে। বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে চুপচাপ ছাদে গিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে। প্রিয়তোষ ওর দিদিকে বলেছে রাতদুপুরে অনি নাকি জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে নিজের মনে কথা বলে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলেন সরিৎশেখর। কিন্তু অন্য সময় ও ভুলেও মায়ের কথা বলে না। হেমলতাকেও নিষেধ করে দিয়েছিলেন অনির কাছে মাধুরীর গল্প করতে। অনি একা একা নিজের মত করে বড় হোক—সরিৎশেখর এটাই চাইছিলেন।

মাধুরী বেঁচে থাকতে কাকার সঙ্গে অনির খুব একটা ভাব ছিল না। বরং কারণে অকারণে প্রিয়তোষ ওর উপর অত্যাচার করত। অনির কান দুটো প্রিয়তোষের আঙুলের বাইরে থাকার জন্য তখন প্রাণপণ চেষ্টা করত। মা মরে যাবার পর প্রিয়তোষের ব্যবহার একদম পাল্টে গেল।

নতুন স্যার তখন সদ্য স্কুলে এসেছেন। ওঁর কথাবার্তা, হাসি অনিমেষের খুব ভাল লাগছে। মাঝে মাঝে যখন খুব শক্ত কথা বলেন তখন অনিমেষরা বুঝতে পারে না। কিন্তু যখন দেশের গল্প করতে করতে নতুন স্যার জানতে পারলেন অনির মা নেই, অনি দেখল, ক্লাসের সমস্ত মুখগুলো ওর দিকে অবাক হয়ে চেয়ে আছে। যেন মা নেই ব্যাপারটা কেউ ভাবতে পারছে না। নতুন স্যার ওকে কাছে ডেকে আদর করে বললেন, 'মা নেই বলো না। আমাদের তো দুটো মা, একজন চলে গেলেন ঈশ্বরের

www.MurchOna.com

কাছে কিন্তু আর একজন মা তো রয়েছেন। তুমি তাঁর কথা ভাববে, দেখবে আর খারাপ লাগবে না। বঙ্কিমচন্দ্র বলে একজন বিরাট সাহিত্যিক ছিলেন, তিনি এই দেশকে মা বলেছিলেন, বলেছিলেন বন্দেমাতরম।'

প্রিয়তোষ সেই রাত্রে বাড়িতে ছিল। অনেক রাত জেগে কাকাকে বইপত্র পড়তে দেখত অনিমেষ। নিজের খাটে শুয়ে শুয়ে প্রিয়তোষকে নতুন স্যারের কথা বলল অনিমেষ। ভবানী মাস্টার, নতুন দিদিমণি যখন বন্দেমাতরম শব্দটা ওদের উচ্চারণ করিয়েছিলেন তখন শব্দটার মানেটা ও ধরতে পারেনি। নতুন স্যার ওকে সে রহস্য থেকে মুক্ত করেছেন। সব শুনে প্রিয়তোষ বলল, 'শালা কংগ্রেসী।'

এই প্রথম অনিমেষ কাকাকে গালাগাল দিতে শুনল। স্বর্গছেঁড়ায় বাজারের রাস্তায় অনেক মদেসিয়া মাতালকে এই শব্দটা ব্যবহার করতে শুনেছে ও। মাধুরীর শ্রাদ্ধের সময় নদীয়া থেকে অনির মামারা এসেছিলেন। হেমলতা বলেছিলেন ওঁরা হলেন মহীতোষের শালা। রেগে গেলে এই সম্বোধনটাকে কেন লোকে গালাগালি হিসেবে ব্যবহার করে বুঝতে পারে না অনিমেষ। আবার মদেসিয়াদের মুখে শুনতে যতটা না খারাপ লাগত এই মুহূর্তে কাকার মুখে খুব বিচ্ছিরি লাগল। কংগ্রেসী শব্দটা ও খবরের কাগজ থেকে জেনে গিয়েছিল। যেমন মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেস, জওহরলাল নেহরু কংগ্রেসী। দেশের জন্য যারা কাজ করে তারা কংগ্রেসী, তাদের মাথায় একটা সাদা টুপি থাকে। নতুন স্যারের মাথায় সাদা টুপি নেই, তাহলে তিনি কংগ্রেসী হবেন কি করে? আর যারা দেশের জন্য কাজ করে, দেশমায়ের জন্য জীবন দান করে তারা শালা হবে কেন? কিন্তু কাকার সঙ্গে তর্ক করা বা কাকার মুখে মুখে কথা বলতে সাহস পেল না অনিমেষ। কথা বলার সময় কাকার মুখ চোখ দেখেছিল ও, ভীষণ রাগী দেখাচ্ছিল তখন। কিন্তু কাকার কথা মেনে নিতে পারেনি, নতুন স্যারকে গালাগালি দিয়েছে বলে কাকার ওপর ওর ভীষণ রাগ হচ্ছিল। সেদিন মাঝরাতে অনির ঘুম ভেঙে গেলে দেখল কাকা বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছে। একটা বই ওর মাথার তলায় চাপা পড়ে দুমড়ে যাচ্ছে। হ্যারিকেনের আলোটা কমানো হয়নি। অনেক রাত অবধি আলো জ্বেলে রাখলে দাদু রাগ করেন, কেরোসিন তেল নাকি পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু অনি উঠে আলো নেবালো না, কাকাকে ডাকল না। দাদু যদি এখানে আসে বেশ হয়। জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকাল ও। একটা দুটো করে তারা গুনতে গুনতে আস্তে আস্তে সেগুলো মায়ের মুখ হয়ে গেল। অনি স্থির হয়ে অনেকক্ষণ মাকে দেখল, তারপর নিজের মনে বলল, 'মা, যাঁরা দেশকে ভালবাসতে বলে তাঁরা কি খারাপ?'

(না সোনা, কক্ষনো না)

'তাহলে কাকা কেন নতুন স্যারকে গালাগালি দিল?'

(কাকা রেগে গেছে তাই।)

'আমি যদি দেশকে ভালোবাসি তুমি খুশী হবে তো?'

(আমি তো তাই চাই সোনা।)

'মা তোমার জন্য বড় কষ্ট হয় গো' কথাটা বলতেই অনির চোখ উপচে জল বেরিয়ে এল আর সেই জলের আড়াল ভেদ করে অনি আর কিছুই দেখতে পেল না। অনি লক্ষ্য করেছে যখনই সে মায়ের সঙ্গে কথা বলে, কষ্টের কথা বলে, তখনই চোখ জুড়ে জল নেমে আসে আর সেই সুযোগে মা পালিয়ে যায়। চোখ মুছে আর খুঁজে পায় না সে।

ক'দিন কাকা বাড়িতে আসেনি। দাদু অনেক খুঁজেও ছোট কাকার খবর পাচ্ছেন না। জলপাইগুড়িতে হঠাৎ একটা মিছিল বেরিয়েছে। অনি দ্যাখেনি কিন্তু ক্লাসের বন্ধুদের কাছে শুনেছে সেটা নাকি কংগ্রেসীদের মিছিল নয়, তারা কংগ্রেসীদের গালাগালি দিচ্ছিল। পুলিশ নাকি খুব লাঠির বাড়ি মেরেছে। গোলমাল হবার ভয়ে স্কুল ক'দিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। সেই সময় খবরের কাগজ পড়ে সরিৎশেখর খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। বাড়িতে খুব শক্ত ইংরেজী কাগজ রাখতে আরম্ভ করলেন তিনি, ওতে নাকি অনেক বেশী খবর থাকে।

www.MurchOna.com

ক'দিন বাদে অনেক রাত্রে দরজায় টকটক শব্দ হতে অনিমেষের ঘুম ভেঙে গেল। কাকা না থাকলেও একা শুতো ও। হেমলতা আপত্তি করতে ও বলেছিল ওর ভয় করবে না। পিসীমার বা দাদুর ঘর থেকে জানলা দিয়ে আকাশ দেখা যায় না। শব্দ শুনে ও দেখল পাশের জানলার নীচে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। ভয়ে ও চোখ বন্ধ করতে যাচ্ছিল হঠাৎ চাপা গলায় নিজের নাম শুনতে পেয়ে বুঝল, কাকা এসেছে। চট করে উঠে গিয়ে দরজা খুলতে কাকা মুখে আঙুল দিয়ে ইশারা করে ওকে চুপ করতে বলল, তারপর ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিল। অনিমেষ দেখল এই কয়দিনে কাকার চেহারা ভীষণ খারাপ হয়ে গিয়েছে। পাজামা আর শার্ট খুব ময়লা, গাল ভর্তি ছোট ছোট দাড়ি গজিয়েছে, স্নান টান হয়নি বোঝা যায়। ঘরে এসে কাকা প্রথমে হ্যারিকেনটা বাড়িয়ে দিল, তারপর ওর খাটের তলা থেকে একটা টিনের স্যুটকেস টেনে বের করল। তালা খুলে ফেলতে দেখল, সামান্য কয়েকটা জামাকাপড় ছাড়া অনেকগুলো বই আর পত্রিকায় সেটা ভর্তি। কাকা ওর সঙ্গে কথা বলছে না, একমনে বইগুলো উল্টেপাল্টে দেখছে। তারপর অনেকক্ষণ দেখেশুনে কতগুলো বই আর পত্রিকা আলাদা করে বেঁধে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। চলে যেতে গিয়ে কি ভেবে আবার অনির কাছে ফিরে এসে অনির খাটের ওপর বসল কাকা। অনি দেখল, কাকার হাতের বান্ডিলের ওপরের পত্রিকাটার ওপর বড় বড় করে লেখা আছে—'মার্কসবাদী'। কাকা খুব ফিসফিস করে বলল, 'অনি, কেউ যদি আমার খোঁজে এখানে আসে তাহলে তাকে কক্ষনো বলবি না যে আমি এসে বইগুলো নিয়ে গেছি। বুঝলি?'

অনিমেষ ঘাড় নাড়ল, তারপর বলল, 'তুমি কেন চলে যাচ্ছ?'

কাকা বলল, 'ওদের পুলিশ আমাদের ধরে জেলখানায় নিয়ে যেতে চাইছে। আমাদের পার্টিকে ব্যান করে দিয়েছে ওরা। মুখে গণতন্ত্র গণতন্ত্র বলবে অথচ কাউকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেবে না।'

অবাক হয়ে অনি বলল, 'কারা?'

কাকা থেমে গেল প্রথমটা, তারপর হেসে বলল, 'ঐ বন্দেমাতরম পার্টি, কংগ্রেসীরা। তুই এখন বুঝবি না, বড় হলে যখন জানবি তখন আমার কথা বুঝতে পারবি।'

অনিমেষ বলল, 'কিন্তু নতুন স্যার বলেছেন কংগ্রেসীরা দেশসেবক।'

ঘৃণায় মুখটা বেঁকে গেল যেন, কাকা বলল, 'দেশসেবা? একে দেশসেবা বলে? ভিক্ষে করার নাম দেশসেবা! ইংরেজদের পা ধরে ভিক্ষে করে রাত্রের অন্ধকারে চোরের মত হাতে ক্ষমতা নিয়ে দেশসেবা হচ্ছে! আমরা বলেছি এ আজাদী ঝুটা হ্যায়। আমরা এই রকম স্বাধীনতা চাই না, যে স্বাধীনতা শোষণের হাত শক্ত করে। তাই ওরা আমাদের গলা টিপতে চায়। ওদের হাতে পুলিশ আছে, বন্দুক আছে কিন্তু আমাদের শরীরে রক্ত আছে—যাক, এ সব কথা এখন তুই বুঝবি না।'

আমাদের শরীরে রক্ত আছে। কথাটা শুনেই অনি নিজের আঙুলের দিকে তাকাল, তারপর ওর মনে পড়ল, 'গিভ মি ব্লাড', আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব। সুভাষচন্দ্র বসুর দুই রকম ছবি দেখেছে ও। একটা ছবিতে সাদা টুপি মাথায় আর একটা ছবিতে মিলিটারি জামা টুপিতে একটি হাত সামনের দিকে বাড়ানো। সুভাষচন্দ্র বসু কি কংগ্রেসী ছিলেন না? ও কাকার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে ফেলল, 'তোমরা কি সুভাষচন্দ্র বসুর লোক হয়েছ?'

অবাক হয়ে গেল প্রিয়তোষ, তারপর বলল, 'না, আমরা কম্যুনিস্ট। আমরা চাই দেশের গরীব বড়লোক থাকবে না, সবাই সমান, তাহলেই আমরা স্বাধীন হবো। আমি যাচ্ছি অনি, তুই কাউকে বলিস না আমি এসেছিলাম। আর মনে রাখিস এ আজাদী ঝুটা হ্যায়।'

খুব সন্তর্পণে যেমন এসেছিল তেমনি বেরিয়ে গেল প্রিয়তোষ। দরজা বন্ধ করে কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অনিমেষ। কাকা যেসব কথা বলে গেল তার মানে কি? আমরা কি স্বাধীন হইনি। নতুন স্যারের কথার সঙ্গে কাকার কথার কোথাও মিল নেই কেন? নতুন স্যার বলেছেন, স্বাধীনতা পাওয়ার পর আমরাই আমাদের রাজা। ইংরেজরা যে শোষণ করে দেশকে নিঃস্ব করে গেছে এখন আমাদের তার শ্রী ফিরিয়ে আনতে হবে। আর কাকা বলে গেল এ স্বাধীনতা মিথ্যে, তবে কি আমরা এখনও পরাধীন? কিছুই ঠাওর করতে পারল না অনিমেষ। সব কিছু কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ ও দেখল, কাকা তাড়াতাড়িতে বইপত্র নিয়ে যাবার সময় ভুল করে স্যুটকেস বন্ধ করেনি। পায়ে পায়ে

www.MurchOna.com

অনিমেষ স্যুটকেসটার কাছে এল। দুটো ধুতি, পাজামা, দুটো শার্ট রয়ে গেছে স্যুটকেসে। জামাকাপড় তুলতেই তলায় একটা পুরনো খবরের কাগজ। অনিমেষ দেখল, কাগজ জুড়ে একটা মানুষের ছবি, যার মাথাটা দেখা যাচ্ছে না। কৌতূহলী হয়ে কাগজটা তুলতে ও দেখল কাগজটা কাটা, ছবির মুখ নেই। একটা নীল কাগজ স্যুটকেসের তলায় সেঁটে থাকতে দেখল সে। কাগজটা বের করে আবার সব কিছু ঠিকঠাক রেখে স্যুটকেসটাকে খাটের তলায় ঢুকিয়ে দিল ও।

নীল কাগজটা খুলতেই সুন্দর করে লেখা কয়েকটা লাইন দেখতে পেল অনিমেষ। গোটা গোটা করে লেখা, কোন সম্বোধন নেই। লেখার শেষে নামটা পড়ে অবাক হয়ে গেল ও। তপুপিসী লিখেছে? কাকে লিখেছে? তাহলে শ্রীচরণেষু বা পূজনীয় নেই কেন? তপুপিসী তো কাকার চেয়ে অনেক ছোট। গুদামবাবুর বাড়িটার কথা মনে পড়ল। তপুপিসী কুচবিহারে পড়ত। চিঠিটা পড়া শুরু করল অনিমেষ। 'পৃথিবীতে চিরকাল মেয়েরাই ঠকবে এটাই নিয়ম, আমার বেলায় তার ব্যতিক্রম হবে কেন? আমি খুব সাধারণ মেয়ে, আমি সুন্দরী নই। তোমার ওপর জোর করব সে অধিকার আমার কোথায়? এখানে যখন ছিলে তখন তোমায় কিছুটা বুঝতাম। শহরে যাওয়ার পর তুমি কি দ্রুত পালটে গেলে। তোমার রাজনীতিই এখন সব, আমি কেউ নই। হঠাৎ মনে হল, তুমি তো আমাকে কোনোদিন কথা দাওনি, তোমাকে দোষ দিই কি করে! তুমি তো যৌবনের ধর্ম পালন করেছিলে। কি বোকা আমি। তাই তুমি যত ইচ্ছা রাজনীতি কর, আমি দায় তুলে নিলাম।—তপু।'

তপুপিসী কেন এই চিঠি লিখেছে বুঝতে পারছিল না অনিমেষ। কিন্তু তপুপিসী খুব দুঃখ পেয়েছে, কাকা রাজনীতি করে বলে তপুপিসীর খুব কষ্ট হয়েছে। রাজনীতি করা মানে কি? এই যে কাকা বাড়িতে থাকে না আজকাল, উস্কোখুস্কো হয়ে ঘুরে বেড়ায় চোরের মত একে কি রাজনীতি বলে? এ সব করলে কি আর তপুপিসীর সঙ্গে ভাব রাখা যায় না? কিন্তু তপুপিসী কেন লিখেছে আমি সুন্দরী নই? সারা স্বর্গছেঁড়ায় তপুপিসীর চেয়ে সুন্দরী মেয়ে তো কেউ নেই, এক সীতা ছাড়া। কিন্তু সীতা তো ছোট্ট। বড় হলে নাকি চেহারা পাল্টে যায়। বড় হবার পর সীতা তপুপিসীর মত সুন্দরী নাও হতে পারে। এমন সময় অনিমেষ শুনতে পেল একটি গাড়ি খুব জোরে এসে শব্দ করে বাড়ির সামনে থামল। তিন-চারটে গলায় কথাবার্তা জুতোর শব্দ দ্রুত চারধারে ছড়িয়ে পড়তে ও জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। প্রথমে বুঝতে পারেনি, শেষতক লক্ষ্য করল সার দিয়ে কিছু লোক দাঁড়িয়ে আছে। কি ব্যাপার বুঝতে না বুঝতে দরজায় প্রচন্ড জোরে আওয়াজ উঠল। আওয়াজটা ওর ঘরের দরজায়, দ্রুত হাতে কে শব্দ করছে, দরজা ভেঙে ফেলার যোগাড়। অনি কি করবে বুঝতে পারছিল না, এমন সময় সরিৎশেখরের গলা শুনতে পেল ও। শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে চিৎকার করছেন, 'কে? কে?' শব্দটা থেমে গেল আচমকা, একটা বাজখাঁই গলায় কেউ বলে উঠল, 'দরজা খুলুন, পুলিস।'

পুলিস! অনিমেষ কিছু বুঝতে পারছিল না সে কি করবে? পুলিস তাদের বাড়িতে আসবে কেন? ছেলেবেলা থেকে পুলিশ দেখলে ওর কেমন ভয় করে। সরিৎশেখরের চেঁচানি বন্ধ করে হয়ে গেল আচমকা। অনিমেষ শুনল দাদু উঠে তার নাম ধরে ডাকছেন। সে দেখল তার গলা শুকিয়ে গেছে, দাদুর ডাকে সাড়া দিতে পারছে না। বিদ্যাসাগরী চটিতে শব্দ করতে করতে ভেতরের দরজা খুলে দাদু এ ঘরে এলেন। ঘরের মধ্যিখানে আলো জ্বালিয়ে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দাদু খুব অবাক হলেন, 'কি হল, তুমি ঘুমোওনি?'

ঘাড় নেড়ে অনিমেষ বলল, 'পুলিস।'

সরিৎশেখর বললেন, 'আমি দেখছি, তুমি পিসীমার কাছে যাও।'

কথাটা শুনে অনিমেষ ভেতরের ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়াল। ঘরটা অন্ধকার, একদিকে পিসীমার ঘরে, অন্যদিকে দাদুর ঘরে যাবার দরজা। অনিমেষ শুনতে পেল পিসীমা বিড়বিড় করে 'জয় গুরু জয় গুরু' বলে যাচ্ছেন। অনিমেষ দরজার পাশে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে দেখল দাদু দরজা খুলে দিতেই হুড়মুড় করে কয়েকজন পুলিশ ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। প্রথমে যে এল তার হাতে রিভলভার। এই প্রথম সামনাসামনি একটা রিভলভার দেখল অনিমেষ। পুলিসরা ঘরে ঢুকে পড়তেই সরিৎশেখর ধমকে উঠলেন, 'কি ব্যাপার, এত রাত্রে আমার বাড়িতে আপনারা কেন এসেছেন, কি চান?'

রিভলভার হাতে পুলিসটা বলল, 'আপনার ছেলে কোথায়?'

sumon_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

সরিৎশেখর অবাক হলেন, 'ছেলে? ও, আমার বড় ছেলের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই!'

পুলিসটা বলল, 'ন্যাকামো করবেন না, আপনার ছোট ছেলে প্রিয়তোষের কথা জিজ্ঞাসা করছি।'

সরিৎশেখর ঘাড় নাড়লেন, 'জানি না।'

চিবিয়ে চিবিয়ে লোকটা বলল, 'জানেন না! এই বাড়ি সার্চ করো।'

কথাটা বলতেই অন্য পুলিসগুলো রিভলভার বের করে ঘরময় ছড়িয়ে পড়ে জিনিসপত্র উল্টেপাল্টে দেখতে লাগল। সরিৎশেখর দু হাত তুলে তাদের থামাতে গেলেন, 'আরে কি করছেন কি আপনারা? আমি কালই ডি সি-র সঙ্গে কথা বলব। আমাকে আপনারা অপমান করতে পারেন না। কি করেছে আমার ছেলে?'

প্রথম লোকটি বলল, 'বাপ হয়ে জানেন না ছেলে কম্যুনিষ্ট হয়েছে? দেশ উদ্ধার করছেন সব। সরকারের বিরুদ্ধে প্রচার করছেন। ওর নামে ওয়ারেন্ট আছে। কাজে বাধা দেবেন না, ওর বইপত্র আমরা দেখব। ও বাড়িতে এসেছে এ খবর আমরা পেয়েছি।'

সরিৎশেখর বললেন, 'আজ ক'দিন সে বাড়িতে নেই। আমি বলছি সে বাড়ি নেই। কিন্তু সে কম্যুনিস্ট হল কবে?'

লোকটি বলল, 'এই তো, বাপ হয়েছেন অথচ ছেলের খবর রাখেন না!'

সরিৎশেখর রেগে গিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'মুখ সামলে কথা বলবেন। জানেন সারা জীবন আমি কংগ্রেসকে সাহায্য করেছি। দরকার হলে এই জেলার মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করবেন। আমি কি ভাবছেন এখনও ব্রিটিশ আমল রয়েছে যে এই সব কথা বলবেন?'

পুলিস বলল, 'মশাই, আমল বদলায় আপনাদের কাছে, আমরা হুকুমের চাকর! আমাদের কাছে ব্রিটিশরাও যা এই কংগ্রেসীরাও তা, হুকুম করলেই তামিল করব। সবাই আমাদের সাহেব। যান, বেশী বকাবেন না, আমাদের সার্চ করতে দিন।'

অসহায়ের মত সরিৎশেখর ধপ করে অনিমেষের খাটে বসে পড়লেন। অনিমেষ শুনল, দাদু বিড়বিড় করছেন, 'প্রিয় কম্যুনিস্ট হয়েছে, কম্যুনিস্ট!' ততক্ষণে পুলিসগুলো ঘর তছনছ করে ফেলেছে। অনির বইপত্র ছত্রাকার, কাকার স্যুটকেসটা খালি হয়ে ঢং করে মাটিতে পড়ল। একটা লোক বলল, 'এ ঘরে কিছু নেই স্যার।'

প্রথম পুলিস বলল, 'পালাবে কোথায়? বাড়ি ঘেরাও করা আছে। অন্য ঘর দেখ!' পুলিসগুলোকে এদিকে আসতে দেখে অনিমেষ দৌড়ে পিসীমার ঘরে চলে এল। হঠাৎ ওর নজরে পড়ল হাতের মুঠোয় তপুপিসীর চিঠিটা রয়ে গেছে। এই চিঠিটা পেলে পুলিসরা নিশ্চয়ই কাকার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে! তপুপিসী তো লিখেছে কাকা রাজনীতি করে। অনিমেষের মনে হল, রাজনীতি করা মানে কম্যুনিষ্ট হওয়া। চিঠিটা লুকিয়ে ফেলা দরকার। কি করবে কোথায় রাখবে বুঝতে না পেরে সে চিঠিটাকে পেটের কাছে প্যান্টের ভাঁজের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে গেঞ্জিটা টেনে দিল। দিতেই সে দেখল হেমলতা তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। ঘরের এককোণে ঠাকুরের ছবির তলায় একটা ডিমবাতি জ্বলছে। হেমলতা নিজের বিছানার ওপর বাবু হয়ে বসে আছেন। চোখাচোখি হতে তিনি ওকে ইশারা করে ডেকে পাশে বসতে বললেন। অনি বসামাত্র একদল পুলিস টর্চ জ্বেলে ঘরে ঢুকে পড়ল। একজন ওদের মুখে টর্চ ফেলতে হেমলতা বললেন, 'চোখে আলো ফেলবেন না, কি চাই আপনাদের?'

একটা লোক খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে বলল, 'রাতদুপুরে জেগে বসে আছেন যে, প্রিয়তোষ কোথায়?'

হেমলতা সজোরে উত্তর দিলেন, 'রাতদুপুরে বাড়িতে ডাকাত পড়লে কেউ নাকে তেল দিয়ে ঘুমোয় না। আমার ভাই বাড়িতে নেই।'

লোকগুলো তন্নতন্ন করে ঘরের জিনিসপত্র ঘাঁটছিল। হেমলতা উঠে দাঁড়ালেন, 'খবরদার, আমার ঠাকুরের গায়ে কেউ হাত দেবেন না।'

যে লোকটা সেদিকে এগিয়েছিল সে হেমলতার মূর্তি দেখে থমকে গেল। পেছন থেকে একজন বলল, 'ছেড়ে দে, ঠাকুর-দেবতার সঙ্গে কম্যুনিস্ট পত্রিকা থাকে না।'

হঠাৎ একটা লোক অনিমেষের দিকে এগিয়ে এল গটগট করে, 'ওহে খোকাবাবু, তোমার নাম কি?'

www.MurchOna.com

অনিমেষ কোন রকমে বলল, 'অনিমেষ।'

লোকটি ওর চিবুক ধরতে অনিমেষের হাত পেটের কাছে চলে গেল সড়াৎ করে, 'এই যে মিঃ মেষ, প্রিয়বাবু তোমার কে হল বল তো?'

'কাকা।' মুখ উঁচু করে ধরে থাকায় অনিমেষের ঘাড়ে লাগছিল।

'কাকা! গুড। একটু আগে সে এখানে এসেছিল আমরা জানি, তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল?'

অনিমেষ কোনদিন মিথ্যে কথা বলেনি। মা বলেছেন, কখনো মিথ্যে কথা বলবে না। অনি এখন কি করবে? সত্যি কথা বললে কি কাকার খারাপ হবে? কাকা তো চলে গিয়েছে এখান থেকে, এই বাড়িতে কাকাকে খুঁজে পাবে না ওরা। তাহলে? সত্যি কথাটা বলে দেবে? লোকটা তখনও ওর মুখ এমন জোরে উঁচু করে রেখেছে যে ঘাড় টনটন করছে। লোকটা ধমকে উঠল, 'কি হল?'

অনিমেষ ফিসফিসিয়ে বলল, 'আঃ!'

লোকটা বলল, 'কি? না?' বলে অনিমেষের মুখটা ছেড়ে দিল, 'শালা বাড়িসুদ্ধ লোক ট্রেইন্ড হয়ে রয়েছে। বুঝলে মিত্তির, এই বাচ্চাটা যখন বড় হবে তখন এই প্রিয়তোষের চেয়ে থাইজেন্ড টাইমস ফেরোসাস হবে। ওই সব থিওরিটিকাল কম্যুনিস্টগুলো তখন পাত্তাই পাবে না। শালা এইটুকুনি বাচ্চাও কেমন ট্রেইন্ড লায়ার!' কথাগুলো বলে লোকগুলো অন্য ঘরে চলে গেল।

পাথরের মত বসেছিল অনিমেষ। হঠাৎ ওর খেয়াল হল পুলিসটা ওকে লায়ার বলল। লায়ার মানে মিথ্যুক। কক্ষনো না, ও মিথ্যুক নয়। ও কিছুই বলেনি, পুলিসটা নিজে নিজে মনে করে নিয়েছে। ও দৌড়ে পুলিসটার কাছে যেতে উঠে পড়তেই হেমলতা ওকে চট করে ধরে ফেললেন, 'কোথায় যাচ্ছিস?'

অনিমেষ ছটফট করছিল, 'ওরা আমাকে লায়ার বলে গালাগালি দিল। আমি কক্ষনো মিথ্যে বলি না। মা তাহলে রাগ করবে। বলো আমি কি মিথ্যুক?'

দু হাতে ওকে কাছে টেনে নিলেন হেমলতা, 'কাকু কি এসেছিল?'

ঘাড় নাড়ল অনি, 'হ্যাঁ, এসে বইপত্র নিয়ে গেছে।'

হেমলতা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি বই?'

অনি বলল, 'জানি না। তবে একটা বই-এর নাম মার্কসবাদী। আমাকে ছাড়, আমি ওদের সত্যি কথা বলে দিয়ে আসি, আমি লায়ার নই। মা বলে গেছে সত্যি বলতে।'

হেমলতা কেঁদে ফেললেন, 'অনি বাবা, যুধিষ্ঠিরও এক সময় মিথ্যে বলেছিলেন। কিন্তু তুমি তো বলনি, ওরা তোমার কথা ভুল বুঝেছে। আমার কাছে বসে তুমি মনে মনে মাকে ডাকো, দেখবে তিনি একটুও রাগ করেননি।'

সমস্ত বাড়ি তছনছ করে পুলিসের গাড়ি শব্দ করে ফিরে গেল। ওরা চলে গেলে বাড়িটা আচমকা নিস্তব্ধ হয়ে গেল যেন। কোথাও কোন শব্দ নেই, পিসীমার পাশে অনি গা-ঘেঁষে বসে, সরিৎশেখরের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। শুধু তিস্তার চরে একগাদা শেয়াল নিজেদের মধ্যে ডাকাডাকি শুরু করে দিল। এই রাত্রে, এখন, জলপাইগুড়ি শহরটা চুপচাপ ঘুমিয়ে। অনিমেষ প্রিয়তোষের কথা ভাবছিল, কাকা নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে নেই। কাকাকে খুঁজতে পুলিসরা চারধারে ছুটে বেড়াচ্ছে। কাকা তো কাউকে হত্যা করেনি কিন্তু পুলিসগুলোর মুখ দেখে মনে হল সেইরকম খারাপ কিছু কাকা করেছে। এখন কাকা কোথায়? কাকা যেন স্বর্গছেঁড়ায় পালিয়ে যাচ্ছে না? স্বর্গছেঁড়ায় কোনদিন পুলিস যায় না, কাকা সেটা ভুলে গেল কি করে!

এমন সময় শব্দ করে বাইরের দরজাটা বন্ধ হল। বিদ্যাসাগরী চটির আওয়াজটা এ ঘরের দরজায় এসে থামল! অনি তাকিয়ে দেখল দাদুর চোখে চশমা নেই, কেমন রোগা লাগছে মুখটা। অদ্ভুত শূন্য গলায় সরিৎশেখর বললেন, 'বুঝলে হেম, এই শুরু হল, আমাকে আরো যে কত দেখে যেতে হবে।'

হেমলতা খুব ধীরে জিজ্ঞাস করলেন, 'কি হয়েছে?'

চিৎকার করে উঠলেন সরিৎশেখর, 'তোমার ভাই কম্যুনিস্ট হয়েছে, আমার শুষ্টির পিন্ডি হয়েছে।'

হেমলতা বললেন, 'কম্যুনিস্ট? সে আবার কি?'

www.MurchOna.com

সরিৎশেখর বললেন, 'দেশ উদ্ধার করছেন, আমরা যে এতদিন পর স্বাধীনতা পেলাম তাতে বাবুদের মন উঠছে না, সারা দেশ তাতিয়ে বেড়াচ্ছেন। মেরে হাড় ভেঙে দেবে জওহরলাল। আমি এসব বরদাস্ত করব না, একটা মাতাল লম্পটকে তাড়িয়েছি, এটাও যেন কোনদিন বাড়িতে না ঢোকে। এই ছেলের জন্য এত রাত্রে আমাকে হেনস্তা হতে হল!'

হেমলতা বললেন, 'প্রিয় আবার কবে ওসব দলে ভিড়ল!'

সরিৎশেখর খেঁকিয়ে উঠলেন, 'তোমারই তো দোষ, নিজের ভাই কি করছে খেয়াল রাখতে পার না।'

হেমলতা উত্তেজিত হলেন, 'আমার ভাই কিন্তু আপনার তো ছেলে।'

সরিৎশেখর একটুও অপ্রস্তুত না হয়ে বলে চললেন, 'তখন যদি গুদামবাবুর মেয়েটার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিতাম তাহলে আর এই দুর্ভোগ হত না। তুমিই তো তখন খ্যাঁক খ্যাঁক করেছিলে।'

হেমলতা কোন জবাব দিলেন না। প্রিয়তোষের ব্যাপারটা তিনি বুঝতে পারছিলেন না ঠিক। কিন্তু গুদামবাবুর মেয়ে তপুকে বাড়ির বউ হিসেবে মাধুরীর পাশে তিনি ভাবতেই পারেন না।

এমন সময় সরিৎশেখর অনিমেষের দিকে তাকালেন, 'তুমি এত রাত্রে জেগে ছিলে কেন?'

অনিমেষ ভয়ে ভয়ে দাদুর দিকে তাকাল। রাগলে দাদুকে ভয়ংকর দেখায়। কি বলবে ভাবতে না ভাবতেই সরিৎশেখর ধমকে উঠলেন, 'কথা জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দাও না কেন? ভাগ্যিস হেমলতার একটা হাত ওর পিঠের ওপর ছিল নইলে সে কেঁদে ফেলত। সরিৎশেখর এবার সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রিয়তোষ কি এসেছিল?' চট করে ঘাড় নাড়ল অনিমেষ, 'হ্যাঁ।' প্রথম থেকেই এইরকম একটা সন্দেহ করেছিলেন সরিৎশেখর কিন্তু নাতির মুখের দিকে তাকিয়ে এখন হতবাক হয়ে গেলেন। পুলিস অফিসারটা যখন ধমকাচ্ছিল তখন অনিমেষ একথা স্বীকার করেনি তো! ঐটুকু শিশু—! সরিৎশেখর জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমাকে ডাকনি কেন?'

বিড় বিড় করে অনিমেষ বলল, 'আমাকে শব্দ করতে মানা করেছিল কাকা। আমার মন খারাপ লাগছিল।'

'কেন?'

'কাকার শরীর খুব খারাপ হয়ে গেছে, জামা-কাপড় ময়লা।'

'হুম। কি করল সে?'

'বইপত্র নিয়ে চলে গেল।'

'কি বই?'

"অনেক বই। একটার নাম মার্কসবাদী।'

'ও! সর্বনাশ তাহলে অনেক ভেতরে গেছে। কি বলল?'

'আমি সব কথা বুঝিনি, শুধু একটা কথা মনে আছে—এ আজাদী ঝুটা হ্যায়।'

'ছাই হ্যায়।' চিৎকার করে উঠলেন সরিৎশেখর, 'সব জেনে বসে আছে, আজাদীর তোরা কি বুঝিস রে! নেতাজীকে গালাগালি দিস, রবীন্দ্রনাথকে গালাগালি দিস, ক্ষুদিরাম বাঘা যতীন—এঁদের কথা ভুলে যাস—ননসেন্স।' হঠাৎ অনির দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'এসব একদম বাজে কথা, তুমি কান দিও না।'

নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে তাঁর মনে পড়ল ঐ বালকটি আঠারো বছর বয়সে জেলে যাবে। বুকের ভিতর দুরমুশ শুরু হয়ে গেল ওঁর—কি জানি—আজ রাত্রে তার বীজবপন হয়ে গেল কি না। ওর দিকে নজর রাখতে হবে, ওকে নিজের মত করে গড়তে হবে।

ঘাড় ঘুরিয়ে সরিৎশেখর দেখলেন পায়ে পায়ে অনিমেষ তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। ওর হাঁটার ধরন দেখে খুব অবাক হলেন সরিৎশেখর। খুব শান্ত গলায় নাতিকে ডাকলেন তিনি, 'কিছু বলবে?' ঘাড় নাড়ল অনিমেষ। তারপর সরিৎশেখরের একদম কাছে এসে পেটের ওপর প্যান্টের ভাঁজ থেকে সেই নীল চিঠিটা বের করে দাদুকে দিল। অবাক হয়ে চিঠিটা নিয়ে নিজের ঘরে গেলেন সরিৎশেখর, টেবিলের ওপর রাখা চশমাটা তুলে সেটা পড়লেন। অনেকক্ষণ বাদে ডাক এল অনিমেষের, 'তুমি এটা কোথায় পেলে?'

www.MurchOna.com

'কাকাবাবুর স্যুটকেসে।'
'পড়েছ?'
মাথা নাড়ল অনিমেষ, 'হ্যাঁ।'
চোখ বন্ধ করলেন সরিৎশেখর, 'কিছু বুঝেছ?'
ভয়ে ভয়ে অনি ঘাড় নাড়ল, 'না।'
'যাও। শুয়ে পড়। প্রিয়তোষ যদি আসে আমাকে না বলে দরজা খুলবে না।'
চলে যেতে যেতে অনিমেষ দেখল দাদু আলমারীর ভেতর চিঠিটা রেখে দিয়ে তালা বন্ধ করছেন। হঠাৎ অনির মনটা তপুপিসীর জন্য কেমন করে উঠল।

স্কুলের প্রথম বছরে অনিমেষের স্বর্গছেঁড়ায় যাওয়া হয়নি। মহীতোষ ওখানে অত বড় কোয়ার্টারে একা আছেন ঝাড়িকে নিয়ে। সে-ই রান্নাবান্না করে সংসার সামলায়। গরমের ছুটিতে বা পূজার সময় সরিৎশেখর ভেবেছিলেন নাতিকে পাঠাবেন কিন্তু মহীতোষই আপত্তি করেছেন। ওখানে গেলে মাধুরীর কথা বারংবার মনে হবে অনিমেষের। হেমলতার হয়েছে মুশকিল, হাজার দোষ করলেও ভাইপোকে বকামারা চলবে না, সরিৎশেখরের হুকুম। মহীতোষ দুদিন ছুটি থাকলেই শহরে চলে আসেন কিন্তু ছেলের সঙ্গে ইচ্ছে থাকলেও মিশতে পারেন না ঠিকমত। কোথায় যেন আটকে যায়। ঐটুকুনি ছেলে একা একা শোয়, একা একা বাগানে ঘোরে, কি গম্ভীর দেখায়। পড়াশুনায় রেজাল্ট ভালই হচ্ছে। হেডমাস্টারমশাই সরিৎশেখরকে বলেছেন, হি ইজ একসেপশনাল, অত্যন্ত লাজুক। জলপাইগুড়ি শহরে কম্যুনিস্ট পার্টির ব্যাপারে আর তেমন হইচই হচ্ছে না। কংগ্রেসের মিছিল বেরুচ্ছে ঘন ঘন। প্রিয়তোষের খবর পাওয়া যায়নি আর। মহীতোষের এক ক্লাসমেট জলপাইগুড়ি থানায় পোস্টেড হয়ে এল, সেও কোন খবর দিতে পারল না। পরিতোষ আসামে এক কাঠের ঠিকাদারের কাছে সামান্য মাইনেতে কাজ করছে এ খবর মহীতোষ পেয়েছেন। যে খবর এনেছে সে পরিতোষের বউকে নাকি দেখেছে। খবরটা বাবাকে জানাতে পারেননি মহীতোষ। বড়দার কথা শুনলেই বাবার মেজাজ চড়ে যায়।

হেমলতা জলপাইগুড়িতে আসার পর হঠাৎ যেন বুড়িয়ে যাচ্ছেন। প্রায়ই অম্বল হচ্ছে আজকাল, কিছু খেলে হজম হয় না ঠিক। সব কাজ শেষ করে খেতে খেতে চারটে বেজে যায়। সেই সময় অনিমেষ আসে। পিসীমার আলোচালের ভাত নিরামিষ তরকারি দিয়ে খেতে ও খুব ভালবাসে। সরিৎশেখরের সন্দেহ অনিমেষের সঙ্গে খাবার জন্যেই হেমলতার চারটের আগে খেতে বসা হয় না। অনেক বকাঝকা করেছেন কোন কাজ হয়নি। নিজের হাতে রান্না সেরে সরিৎশেখরকে খাইয়ে সমস্ত বাড়ি ঝেড়ে মুছে বাসন মেজে তবে নিজের নিরামিষ রান্না শুরু করবেন হেমলতা। একটু পিটপিটে স্বভাব আগেও ছিল, সরিৎশেখর লক্ষ্য করেছেন ইদানীং সেটা আরো বেড়েছে। চব্বিশ ঘন্টা জল ঘেঁটে ঘেঁটে দু'পায়ের আঙুলের ফাঁকে সাদা হাজা বেরিয়ে গেছে, অনিমেষের মুখে সরিৎশেখর সদ্য সেটা জানতে পারলেন। বিকেলে যখন ওরা মুখোমুখি খেতে বসে সে দৃশ্য বেশ মজার। পিঁড়িতে বাবু হয়ে বসে অনিমেষ, হেমলতা অত বড় ছেলেটাকে ভাত, তরকারী মেখে গোল্লা পাকিয়ে দিয়ে নিজে মাটিতে উবু হয়ে বসে খাওয়া শুরু করেন। প্রায় একই সংলাপ দিয়ে খাওয়া শুরু হয় রোজ, সরিৎশেখর চুরি করে শুনেছেন। অনিমেষ বলে, 'মাকে তুমি ফ্রক পরা দেখেছ?'

হেমলতা খেতে খেতে বলেন, 'পনের বছরের মেয়ে ফ্রক পরবে কি! তার বিয়ের আগের দিনও নাকি রান্নাঘরে ঢোকেনি। তোর দাদু যখন দেখতে গিয়েছিল তখন ওর বাবা খুব তুজ্জুং দিয়েছিল—এই রাধতে পারে সেই রাঁধতে পারে।'

'তারপর?'

'তারপর আর কি! বিয়ের পর আমি রেঁধে দিতাম আর তোর দাদু জানতো মাধুরী রেঁধেছে। তবে খুব চটপট শিখেছিল।'

'মা দেখতে খুব সুন্দরী ছিল, না?'

মুখটা খুব মিষ্টি ছিল তবে ভীষণ মোটা। হাত-টাতগুলো কি, এক হাতে ধরা যায় না। মাথায় চুল ছিল বটে, হাঁটুর নীচ অবধি নেমে আসতো। দু'হাতে চুল বাঁধতে হিমসিম খেতে হত। একদিন রাগ করে অনেকটা কেটে দিলাম।'

www.MurchOna.com

'মা মোটা ছিল?' অনিমেষের গলায় বিস্ময়।

'হুঁ। বাবার তো ঐরকম পছন্দ ছিল। আমার প্রথম মা'র নাকি পাহাড়ের মত শরীর ছিল। বিয়ের পর আমরা তোর মাকে নিয়ে খুব-ঠাট্টা করতাম। তারপর তুই হতে কেমন রোগা রোগা হয়ে গেল।'

তারপর অনেকক্ষণ চুপচাপ দুজনে কথা না বলে খেয়ে যায়। বিকেলে অনির এই তাত খাওয়াটা একদম পছন্দ করেন না সরিৎশেখর। কিন্তু মেয়ের জন্য কিছু বলতেও পারেন না। অনেক কিছু এখন মেনে নিতে হচ্ছে বাধ্য হয়ে। সরিৎশেখর বুঝতে পারছেন তাঁর পুঁজি দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। এতদিন চা-বাগানের চাকরিতে মাইনে ছাড়া বাড়িতে কোন উপার্জন করেননি। বিলাসিতা ছিল না তাই জমানো টাকার বেশির ভাগ দিয়ে এই বাড়িটা তৈরি করার পর হাতে যা আছে তাতে মাত্র কয়েক বছর চলতে পারে। এখনও তাঁর স্বাস্থ্য ভাল, ইচ্ছে করলে এই শহরে কোন দেশী চা-বাগানের হেড অফিসে একটা চাকরি জুটিয়ে নিতে পারেন কিন্তু আর গোলামী করতে প্রবৃত্তি হয় না। চা-বাগানের ইতিহাসে এতদিন পেন্সনের ব্যাপারটাই ছিল না। রিটায়ার করার পর অনেক লেখালেখি করে কলকাতা থেকে তাঁর জন্য পঁচাত্তর টাকার একটা মাসিক পেন্সনের অনুমতি আনিয়েছেন। সরিৎশেখরের ধারণা তাঁর চিঠির চেয়ে ম্যাকফার্সনের সুপারিশ বেশী কাজ করেছে। মেমসাহেব এখনও প্রতি মাসে তাঁকে চিঠি লেখেন ডিয়ার বাবু বলে। স্বর্গছেঁড়ার জন্য কষ্ট হয় তাঁর, সরিৎশেখরকে তিনি ভোলেননি—এইসব। টানা টানা হাতের লেখা। অনিমেষকে সে চিঠি পড়ান সরিৎশেখর। খামের ওপর ডাকঘরের ছাপ থেকে দেশটাকে নাতির কাছে উপস্থিত করতে চেষ্টা করেন। মিসেস ম্যাকফার্সন লিখেছিলেন তোমার গ্র্যান্ডসন যখন এখানে ব্যারিস্টারি পড়তে আসবে তখন সব খরচ আমার। সরিৎশেখর অনিমেষকে বিলেতে পাঠাবেন বলে যখন ঘোষণা করেন তখন সময়ের হিসাব তাঁর হারিয়ে যায়। পেন্সন পাবার পর চলে যাচ্ছে একরকম। তিনটে তো প্রাণী, এতবড় বাড়িটা খালি পড়ে থাকে। মহীতোষ তাঁকে টাকা পাঠাতে চেয়েছিলেন প্রতি মাসে, রাজী হননি তিনি। বলেছিলেন তাহলে ছেলেকে হোস্টেলে রাখ। আর কথা বাড়াননি মহীতোষ। টাকার দরকার হলে বাড়ি ভাড়া দিতে পারেন সরিৎশেখর। প্রচুর লোক আসছে ভাড়ার প্রস্তাব নিয়ে। এতগুলো ঘর খালি পড়ে আছে, কেউ এসে থাকবে তারও তো সম্ভাবনা নেই। তবু ভাড়া দেওয়ার কথা চিন্তাই করেন না সরিৎশেখর। এটা তাঁর এক ধরনের আনন্দ। কেউ ভাড়া চাইতে এলে তাকে মুখের ওপর না বলে দিয়ে মেয়ের কাছে এসে বলেন, 'বুঝলে হেম, এই যে বাড়িটা দেখছ—এই হল আমার আসল ছেলে, শেষ বয়সে এই আমাকে দেখবে।'

এখন প্রতি বছর তিস্তায় ফ্লাড আসে। যেমন ভাবে নিয়ম মেনে বর্ষা আসে শীত আসে তেমনি বন্যার জল শহরে ঢুকে পড়ে। নতুন বাড়িতে ওঠার পর জল আর জিনিসপত্র নষ্ট করার সুযোগ পায় না। শুধু প্রতি বছর সরিৎশেখরের বাগানের ওপর পলিমাটির স্তরটা বেড়ে যায়। এখন নদী দেখলে সরিৎশেখর বুঝতে পারেন দু-একদিনের মধ্যে বন্যা হবে কিনা। এমন কি তিস্তা যখন খটখটে শুকনো, সাদা বালির চরে হাজার হাজার কাশগাছ বাতাসে মাথা দোলায়, যখন ওপারের বার্নিশঘাট অবধি জলের রেখা দেখা যায় না, ভাঙা ট্যাক্সিগুলো সারাদিন বিকট শব্দ করে তিস্তার বুকে ছুটে বেড়ায়, সেইরকম সময়ে একদিন হঠাৎ মাঝরাত্রে বোমা ফাটার মত শব্দ ওঠে তিস্তার বুকে আর সরিৎশেখর বিছানায় শুয়ে শুয়ে নিশ্চিত হয়ে যান কাল ভোরে বেড়াতে গিয়ে দেখতে পাবেন তিস্তার শুকনো বালি রাতারাতি ভিজে গেছে। বিকেল নাগাদ ভুস করে জল উঠে স্রোত বইতে শুরু করবে। চোখের উপর এই শহরটার চরিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছে! চোখের উপর অনিকে বড় হয়ে উঠতে দেখেছেন। পড়াশুনায় ভাল ছেলেটা, পড়ার কথা কখনো বলতে হয় না। আজ অবধি কারোর কাছ থেকে কোনরকম নালিশ শুনতে হয়নি ওর বিরুদ্ধে। কিন্তু ভীষণ লাজুক অথবা গম্ভীর হয়ে থাকে ছেলেটা। এই বয়সে ওরকম মানায় না। জোর করে বিকেলে স্কুলের মাঠে পাঠাচ্ছেন ওকে, খেলাধুলা না করলে শরীর ঠিক থাকবে কি করে! ক্রমশ মাথা চাড়া দিচ্ছে ওর শরীর, এই সময় ব্যায়াম দরকার।

অনিমেষ শুনেছিল দাদু সেকালে ফার্স্ট ক্লাশ অবধি পড়েছিলেন। কলেজে যাননি কোনদিন। কিন্তু এত ভাল ইংরেজী বুঝিয়ে দিতে পারেন যে ওদের স্কুলের রজনীবাবু অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। একবার প্রতিশব্দ লিখতে বলেছিলেন রজনীবাবু। অনিমেষ বাড়িতে এসে দাদুকে জিজ্ঞাসা করতে একটা শব্দের

www.MurchOna.com

পাঁচটা প্রতিশব্দ পেয়ে গেল। রজনীবাবুর মুখ দেখে ক্লাসে বসে পরদিন অনিমেষ বুঝতে পেরেছিল তিনি নিজেও অতগুলো জানতেন না। ছোট ডিকশনারিতে অতগুলো না পেয়ে রজনীবাবু ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কোত্থেকে ও এসব লিখেছে? অনিমেষের মুখ থেকে শুনে রজনীবাবু বিকেলে এসে দাদুর সঙ্গে আলাপ করে গিয়েছিলেন। ম্যাকফার্সন সাহেব দাদুকে একটা ডিক্‌শনারী দিয়েছিলেন যার ওজন প্রায় দশ সের হবে, অনিমেষ দু'হাতে কোনক্রমে এখন সেটাকে তুলতে পারে। রজনীবাবু মাঝে মাঝে এসে সেটা দেখে যান।

শেষ পর্যন্ত কিছুই চেপে রাখা গেল না। সরিৎশেখর যতই আড়াল করুন মহীতোষের বিয়ের আঁচ এ বাড়িতে লাগতে আরম্ভ করল। মহীতোষ নিজে আসছেন না বটে কিন্তু তাঁর হবু শ্বশুরবাড়ির লোকজন নানারকম কথাবার্তা বলতে সরিৎশেখরের কাছে না এসে পারছেন না। সরিৎশেখর সকালে বাজারে গিয়ে একগাদা মিষ্টি নিয়ে আসেন, কখন কে আসে বলা যায় না। হেমলতা তা দিয়ে অতিথি আপ্যায়ন করেন। মেয়ের বাড়ি থেকে যাঁরা আসেন তাঁরা অনিকে দেখে একটু অস্বস্তির মধ্যে থাকেন সেটা অনি বেশ টের পায়। দাদু পিসীমা ওকে মুখে কিছু না বললেও ও যে ব্যাপারটা জেনে গেছে সেটা বুঝতে পেরে গেছেন। অনির ধারণা ছিল বিয়ে হলে খুব ধুমধাম হয়, অনেক আত্মীয়স্বজন আসে, কিন্তু ওদের বাড়িতে কেউ এল না। শুধু এক বিকেলে সাধুচরণ এক বৃদ্ধ ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে সরিৎশেখরের কাছে এলেন। ওঁদের সাজগোজ দেখে কেমন সন্দেহ হল অনিমেষের, পা টিপে টিপে ও দাদুর ঘরের জানলার কাছে এসে কান পাতল। সাধুচরণ বলছিলেন, 'সব ঠিকঠাক আছে, এবার আপনাকে যেতে হয়।'

সরিৎশেখর বললেন, 'সন্ধ্যে সন্ধ্যে বিয়েটা হয়ে যাবে আশা করি, আমি আবার আটটার মধ্যে শুয়ে পড়ি।'

বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললেন, 'হ্যাঁ, সন্ধ্যেবেলাতেই বিয়ে; আপনি খাওয়া-দাওয়া সেরে তাড়াতাড়ি ফিরতে পারবেন।'

সরিৎশেখর বললেন, 'খাওয়া-দাওয়া? না বেয়াই মশাই, আমি তো খেতে পারব না। আমাকে এ অনুরোধ করবেন না।'

বৃদ্ধ বললেন, 'সে কি? তা কখনো হয়?'

সরিৎশেখর বললেন, 'হয়। আমার বাড়িতে আমার নাতি আছে যাকে আমরা এই বিয়ের কথা জানাইনি। তাকে বাদ দিয়ে কোন আনন্দ-উৎসবে আহার করতে অক্ষম।'

বৃদ্ধ বললেন, 'কিন্তু তাকে তো আপনি নিজেই নিয়ে যেতে চাননি।'

সরিৎশেখর বললেন, 'ঠিকই। ঐ অনুষ্ঠানে ওর উপস্থিতি কি কারো ভালো লাগবে? তাছাড়া একজনকে যখন এনেছিলাম তখন অনেক আমোদ-আহ্লাদ করেছি তবু তাকে কি রাখতে পারলাম! ওসব কথা যাক। পাত্রের পিতা হিসেবে আমার কর্তব্যটুকু করতে দিন, এর বেশী কিছু বলবেন না।'

অনি শুনল দাদু গলা চড়িয়ে ডাকছেন, 'হেম, হেম।' রান্নাঘর থেকে সাড়া দিতে দিতে পিসীমা এ ঘরের দরজা অবধি এসে থেমে গেলেন, 'কি বলছেন?'

'আমি চললাম, সেই হারটা দাও তো।'

'ঐ তো, আপনার ড্রয়ারের মধ্যে আছে। কিন্তু আপনি জামা-কাপড় পাল্টালেন না? এরকম ময়লা পাঞ্জাবি পরে লোকে বাজারে যায়, বরকর্তা হয়ে যায় নাকি!'

অনি ড্রয়ার খোলার আওয়াজ পেল। তারপর শুনল দাদু বলছেন, 'আমি আটটার মধ্যে ফিরে আসব। অনিকে বলো ও যেন আমার জন্য অপেক্ষা করে, একসঙ্গে খাব।'

পায়ের শব্দ পেতেই অনি দ্রুত সরে এল। আড়ালে দাঁড়িয়ে ও দেখল সাধুচরণ আর সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে দাদু বাইরে বেরিয়ে এলেন। পিসীমার গলায় 'দুর্গা দুর্গা' শুনতে পেল সে। সাধুচরণ ও সেই ভদ্রলোকের পাশে দাদুকে একদম মানাচ্ছে না। লংক্লথের ময়লা পাঞ্জাবি, হাঁটুর নিচ অবধি ধুতি, লাঠি হাতে দাদু ওঁদের সঙ্গে হেঁটে গলির বাঁক পেরিয়ে গেলেন। দরজা বন্ধ করে পিসীমা ডাকলেন 'অনি, অনিবাবা।'

www.MurchOna.com

সঙ্গে সঙ্গে অনিমেষ সোজা হয়ে দাঁড়াল। দাদু কোথায় যাচ্ছেন সেটা বুঝতে পেরে ওর অসম্ভব কৌতূহল হতে লাগল। চট করে এপাশ ওপাশ দেখে নিয়ে বারান্দায় ছেড়ে রাখা চটিজোড়া এক হাতে তুলে ও লাফ দিয়ে ভেতরের বাগানে নেমে পড়ল।

বাড়ির পেছন দিয়ে দৌড়ে ও যখন গলির মুখে এসে দাঁড়াল ততক্ষণে সরিৎশেখররা টাউন ক্লাব ছাড়িয়ে গেছেন। দূর থেকে তাঁদের দেখতে পেয়ে নিশ্চিন্তমনে হাঁটতে লাগল ও। এখন প্রায় শেষ-বিকেল। টাউন ক্লাবের মাঠে ফুটবল খেলা চলছে। রাস্তাটায় লোকজন বেশী, নিরাপদ দূরত্বে অনিমেষ হাঁটছিল। সাধুচরণ একটা রিকশা দাঁড় করিয়ে কি বলতে সরিৎশেখর ঘাড় নাড়লেন। অনিমেষ জানে দাদু রিকশায় উঠবেন না। শরীর ঠিক থাকলে দাদুকে রিক্‌শায় ওঠানো সহজ নয়। অবশ্য এখন যদি দাদু রিকশায় উঠতেন তাহলে অনিমেষ কিছুতেই আর নাগাল পেত না। রিক্‌শায় না ওঠার জন্য সময় সময় ওর দাদুর ওপর খুব রাগ হতো, কিন্তু এখন এই মুহূর্তে ওর খুব ভাল লাগল। দাদুর সঙ্গে হেঁটে তাল রাখতে পারছেন না সাধুচরণ। সঙ্গের ভদ্রলোকটি প্রায় দৌড়চ্ছেন। বড় বড় পা ফেলে চলেছেন সরিৎশেখর লাঠি দুলিয়ে। সাধুচরণকে ও কোনদিন দাদু বলতে পারল না। এর জন্য অবশ্য হেমলতা অনেকটা দায়ী। প্রথম থেকেই সাধুচরণকে ভালভাবে দেখেননি হেমলতা। নিজের মেয়েকে যে কষ্ট দেয়, সে মেয়ে মরে গেলে তো কষ্ট পাবেই না—এটা তো জানা কথা কিন্তু তা বলে পাঁচজনকে বলে বেড়াবে, অর্ধমুক্তি হল আমার। বাকি অর্ধেকটা যেন স্ত্রীর মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে। হেমলতা কোনদিন ওকে কাকা জ্যাঠা বলতে পারেননি। সেটাই রপ্ত করেছিল অনি। সামনাসামনি কিছু বলত না কিন্তু আড়াল হলেও পিসীমার মত নাম ধরে বলা অভ্যাস করে ফেলল।

ঝোলনা পুল পার হয়ে করলা নদীর ধার দিয়ে ওদের থানার দিকে যেতে দেখে অনি দূরত্বটা বাড়িয়ে দিল। এখানে রাস্তাটা অনেকখানি সোজা, চট করে ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকালে ও ধরা পড়ে যাবে। ঝোলনা পুলে উঠতে ওর বেশ মজা লাগে। দুটো মোটা তারের ওপর পুলটা বাঁধা, বেশ দোলে। নিচে করলা নদীর জল কচুরিপানায় একদম ঢাকা পড়ে আছে। এখনো সন্ধ্যে হয়নি। দাদুদের ওপর চোখ রেখে পুলের মাঝামাঝি এসে নতুন স্যারের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। পুলের তারের জালে হেলান দিয়ে নতুন স্যার দাঁড়িয়ে আছেন। ওঁকে দেখে নতুন স্যার হাসলেন, 'কোথায় যাচ্ছ অনিমেষ?'

কি বলবে বুঝতে না পেরে অনি বলল, 'বেড়াতে।'

'ও, তোমাদের এই নদীটাকে আমার খুব ভালো লাগে, জানো! কেমন চুপচাপ বয়ে চলে যায়। অথচ এর নাম কেন একটা তেতো ফলের নামে রাখল বল তো?' নতুন স্যার বললেন।

অনি দেখছিল দাদুরা খুব দ্রুত দূরে চলে যাচ্ছেন। কিছু বলা দরকার তাই বলল, 'করলা খেলে তো রক্ত পরিষ্কার হয়।'

'গুড!' খুব খুশী হলেন নতুন স্যার, 'এই নদী শহরের দূষিত রক্ত পরিষ্কার করছে। এককালে এসব জায়গায় দেবী চৌধুরানী নৌকো নিয়ে বেড়াতেন। ইংরেজদের সঙ্গে ওঁর খুব যুদ্ধ হয়েছিল। তিস্তার পাড়ে এখনও নাকি একটা কালী-মন্দির আছে সেটা শুনেছি ওঁরই প্রতিষ্ঠিত। তুমি দেবী চৌধুরানীর নাম শুনেছ?'

অনি ঘাড় নাড়ল, 'না।'

নতুন স্যার বললেন, 'ঠিক আছে, তোমাকে পরে একদিন ওঁর কথা বলব। আজ বরং তোমাকে একটা বই দিই। এটা চিরকাল তোমার কাছে রেখে দেবে।' অনি দেখল নতুন স্যার তাঁর কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে একটা বই বের করে ওর দিকে এগিয়ে দিচ্ছেন। বইটার মলাটে পাগড়ি পরা একজন মানুষের মুখ যাকে দেখলে মারোয়াড়ী দোকানদার বলে মনে হয়। আর ওপরে লেখা রয়েছে আনন্দমঠ, নিচে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। নতুন স্যার বললেন, 'ইনি হলেন আমাদের সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র। আর এই বই হল ভারতের স্বাধীনতার বীজমন্ত্র বন্দেমাতরমের উৎস। এই বই না পড়লে দেশকে জানা যাবে না, আমাদের ইতিহাসকে জানা যাবে না।'

বইটা থেকে মুখ তুলে অনি দেখল থানার রাস্তায় দাদুদের কাউকে দেখা যাচ্ছে না। করলার ওপর আবছায়া সন্ধ্যার কোন ফাঁকে চুঁইয়ে নেমে এসেছে। হঠাৎ কোন কথা না বলে বই বগলে করে ও দৌড়তে লাগল। নতুন স্যার অবাক হয়ে ওকে কিছু বললেন কিন্তু সেটা শোনার জন্য সে দাঁড়াল না।

www.MurchOna.com

রাস্তাটা বাঁধানো নয়, একরাশ ধুলো উড়িয়ে ও থানার পাশে এসে দাঁড়াতেই ঢং ঢং করে পেটা ঘড়িতে শব্দ হতে লাগল। এখান থেকে রাস্তা দুই ভাগ হয়ে গিয়েছে। কোন রাস্তা দিয়ে দাদু গিয়েছেন কি করে বোঝা যাবে? হঠাৎ খেয়াল হল সেদিন দাদু হোটেলের কথা বলছিলেন। থানার ওপাশে কি একটা হোটেলের সাইনবোর্ড দেখেছিল ও একদিন। সেদিকেই পা চালাল অনি।

এখন সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে। রাস্তায় তেমন আলো নেই। দুই একটা রিক্শা ছাড়া লোকজন কম যাওয়া-আসা করছে। থানার সামনে দুটো সিপাই বন্দুক ঘাড়ে করে দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। একা সন্ধ্যেবেলায় এইদিকে কখনো আসেনি ও। আনন্দমঠটা দুহাতে চেপে ধরে সামনে দিয়ে হেঁটে এল অনি। সামনেই একটা বিরাট বটগাছ, তার তলায় ভুজাওয়ালার দোকান। অনি গাছের তলায় চলে এল। এদিকে আলো নেই একদম, শুধু ভুজাওয়ালার দোকানের সামনে একটা গ্যাস পাইপ জ্বলছে। সেই আবছায়া অন্ধকারে দাঁড়িয়ে অনি দেখল বেশ কিছু লোক হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। একটা কালো রঙের গাড়ির সামনের সিটে দাদু বসে আছেন। দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর মধ্যে সাধুচরণ ছাড়া স্বর্গছেঁড়ার মনোজ হালদার, মালবাবুকে দেখতে পেল ও। একটু বাদেই অনি অবাক হয়ে দেখল কয়েকজন লোক মহীতোষকে দুপাশে ধরে হোটেলের সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে আনছে। বাবাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে এখন। এক হাতে টোপর, ধুতি কুঁচিয়ে ফুলের মত অন্য হাতে ধরা, কপালে চন্দনের ফোঁটা, পাঞ্জাবিটা কেমন চকচক করছে আলোয়। বাবা এসে গাড়ির পিছনে উঠে বসলেন। সাধুচরণ আর সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক মালবাবুকে নিয়ে গাড়িতে উঠলেন। গাড়িটা কিন্তু হুস করে চলে যেতে পারল না। কারণ গাড়ির সামনে ধুতি পাঞ্জাবি পর লোকজন হেঁটে যেতে লাগল পথ চিনিয়ে। সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে অনি গাড়িটাকে প্রায় ওর সামনে দিয়ে যেতে দেখল। দাদু গম্ভীরভাবে বসে আছেন। বাবা হেসে মালবাবুকে কি বলছেন। মুখ ফেরালেই ওরা ওকে দেখে ফেলতে পারতেন। দেখতে পেলে কি বাবা ওকে বকতেন? হঠাৎ ওর মনে পড়ল বাবার এইরকম পোশাক-পরা একটা ছবি স্বর্গছেঁড়ার বাড়িতে মায়ের অ্যালবামে আছে। মা বলতেন, বিয়ের ছবি। আনন্দমঠ জড়িয়ে ধরে অনি চুপচাপ গাড়ির খানিক পেছনে হাঁটতে লাগল।

গলির মুখটায় বেশ ভিড়, গাড়ি ঢুকল না। তিন-চারটে গোরা মতন মেয়ে শাঁখ বাজাতে বাজাতে এসে বাবাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে নিয়ে গেল, তারপর ভিড়টা সিনেমা হলে ঢোকার মত গলির ভেতর চলে গেল। এখন চারিদিকে বেশ অন্ধকার। এ রাস্তায় আলো নেই, শুধু বিয়েবাড়ি বলে গলির মুখে একটা হ্যাজাক ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। অনির খুব কৌতূহল হচ্ছিল ভিতরে গিয়ে দেখতে সেখানে কি হচ্ছে! বাবা যখন মাকে বিয়ে করতে গিয়েছিল তখনও কি এইরকম ভিড় হয়েছিল? এইরকম আলো দিয়ে মায়েদের বাড়ি সাজানো হয়েছিল? মা বেঁচে থাকলে বাবা আর বিয়ে করতে পারতো না এটা বুঝতে পারে অনি। কিন্তু এখন, এই একটু আগে বাবাকে যখন মেয়েরা গাড়ি থেকে নামিয়ে নিয়ে গেল তখন তো একদম মনে হল না বাবার মনে কষ্ট আছে। বউ মরে গেলে যদি আবার বিয়ে করা যায় তো পিসীমা কেন বিয়ে করেনি? পিসীমা তো আবার শাড়ি পরে মাছ খেতে পারতো। আজন্ম দেখা পিসীমার চেহারাটায় ও মনে মনে শাড়ি সিঁদুর পরিয়ে হেসে ফেলল, দ্যুৎ, পিসীমাকে একদম মানায় না। ঠিক ওইসময় ও শুনতে পেল কে যেন ওর দিকে এগিয়ে আসতে আসতে জিজ্ঞাসা করছে, 'কি চাই খোকা? এখানে দাঁড়িয়ে কি করছ?'

অনিমেষ কি বলবে মনে মনে তৈরি করতে না করতে লোকটা এসে দাঁড়াল সামনে, 'নেমন্তন্ন খেতে এসেছ তো এখানে দাঁড়িয়ে কেন? ভেতরে যাও।'

লোকটা ওর পিঠে হাত রেখে বলছে, ভেতরে যাও। এখন তো ও বেশ সহজে যেতে পারে। কিন্তু বাবা,—দাদু—অনিমেষ এক পা এগিয়ে আবার থমকে দাঁড়াল।

'কি হল, দাঁড়ালে কেন? যাও।' লোকটা কথাটা শেষ করতেই ওর মনে হল এবার এক ছুটে পালিয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু ততক্ষণে একটা সন্দেহ এসে গেছে লোকটার মনে, 'তোমার নাম কি? কোন বাড়িতে থাক?'

'আমি এখানে থাকি না।' অনিমেষ বলল।

'কোন পাড়ায় থাক? কার সঙ্গে এসেছ?'

www.MurchOna.com

'আমি নেমন্তন্ন খেতে আসিনি।' অনিমেষ প্রায় কেঁদে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে লোকটার চেহারা পালটে গেল, 'তাহলে এখানে ঘুরঘুর করছিস কেন? চুরিচামারির ধান্দা, অ্যাঁ? যা ভাগ।' অনিমেষ দেখল লোকটা চড় মারার ভঙ্গীতে একটা হাত উপরে তুলেছে। নিজেকে বাঁচাবার জন্য সরে যেতে না যেতেই লোকটা খপ করে ওর হাত ধরল, 'তোর হাতে এটা কি! বই! কোত্থেকে মেরেছ বাবা!' প্রায় ছোঁ মেরে বইটা কেড়ে নিয়ে লোকটা বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে উচ্চারণ করল, 'আনন্দমঠ, অ্যাঁ? ধান্দাটা কি?'

'আমার বইটা দিন!' অনিমেষ কোনরকমে বলল।

'অ্যাই চোপ। যা পালা এখান থেকে।' লোকটা তেড়ে উঠতে পেছনে থেকে আর একটা গলা শোনা গেল, 'কি হয়েছে শ্যামসুন্দর? চেঁচাচ্ছ কেন?'

'আরে এই ছোকরা তখন থেকে ঘুরঘুর করছে, এ পাড়ায় কোনদিন দেখিনি।' লোকটা মুখ ফিরিয়ে বলল।

'খুব সাবধান। আজকাল চোর-ডাকাতের দল এইসব বাচ্চা ছেলেকে পাঠিয়ে খবরাখবর নেয়।' অনিমেষ দেখল একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক ওদের দিকে এগিয়ে আসছে।

হঠাৎ মাথা গরম হয়ে গেল ওর। শ্যামসুন্দর নামে লোকটা কিছু বোঝার আগেই ও ঝাঁপিয়ে পড়ে হাত থেকে আনন্দমঠটা ছিনিয়ে নিল। এত জোরে লাফিয়ে উঠেছিল অনিমেষ যে শ্যামসুন্দর ব্যালেন্স রাখতে না পেরে ঘুরে মাটিতে পড়ে গিয়ে 'ওর বাপরে বাপ' বলে চিৎকার করে অনিমেষকে জড়িয়ে ধরতে গেল। বেটাল হয়ে অনিমেষ মাটিতে পড়তে পড়তে কোনরকমে শ্যামসুন্দরের মুখে একটা পেনালটি শট কষিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। অনিমেষকে ছেড়ে দিয়ে নিজের মুখ দুহাতে চেপে 'ডাকাত ডাকাত' বলে শ্যামসুন্দর চেঁচাচ্ছে আর সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক হঠাৎ গলা ফাটিয়ে একটা বিকট শব্দ তুলতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে গলির ভিতরে অনেকগুলো গলায় হৈ হৈ আওয়াজ উঠল। অনিমেষ দেখল পিল পিল করে লোকজন বেরিয়ে আসছে গলি দিয়ে। আর দাঁড়াল না অনিমেষ, এক হাতে বইটা সামলে প্রাণপণে ছুটতে লাগল সামনের রাস্তা ধরে। কেউ পালিয়ে গেছে এটা বুঝতে পেরে শোরগোল বেড়ে গেল। বেশ কয়েকজন তার পিছনে ছুটে আসছে। কি করবে বুঝতে না পেরে ও একটা অজানা অন্ধকার গলির ভেতর ঢুকে পড়ল। এতদূর দৌড়ে এসে ওর হাঁপ ধরে যাচ্ছিল, মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস নিতে নিতে ও বুঝতে পারছিল আর পালাতে পারবে না। সামনে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ কিছু একটায় পা জড়িয়ে ও ছিটকে রাস্তায় পড়ে গেল। ওর মনে হল ডান পায়ের বুড়ো আঙুলটা ফেটে চৌচির হয়ে গেছে, একটা অসহ্য যন্ত্রণা পাক খেয়ে উঠছে পা বেয়ে। চুপচাপ শুয়ে থাকতে থাকতে ও টের পেল পেছনে কোন পায়ের শব্দ নেই। কোন গলা ভেসে আসছে না। তাহলে কি ওরা আর পেছনে পেছনে আসছিল না? ও কি বোকার মত ভয়ের চোটে দৌড়ে যাচ্ছিল? একটু একটু করে সাহস ফিরে আসতে শরীর ঠান্ডা হল, বুকের ভিতর ধুকধুকুনিটা কমে এল। অনিমেষ উঠে বসে নিজের বুড়ো আঙুলে হাত দিতেই আঙুলগুলো চটচটে হয়ে গেল। গরম ঘন বস্তুটি যে রক্ত তা বুঝতে কষ্ট হচ্ছিল না। আঙুলের চটচটে অনুভূতিটা হঠাৎ ওকে কেমন আচ্ছন্ন করে ফেলল। একা এই অন্ধকারে মাটিতে বসে মাধুরীর মুখটা দেখতে পেয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল অনিমেষ।

পায়ের গোড়ালির উপর ভর করে কয়েক পা হেঁটে আসতে ও একসঙ্গে অনেকগুলো আলো দেখতে পেল। আলোগুলো খুব উজ্জ্বল নয়, পর পর লাইন দিয়ে কিছুটা দূরে চলে গেছে। কাছাকাছি অনেকগুলো গলা শুনতে পেল সে। বেশির ভাগ গলাই মেয়েলি, কেউ হাসছে, কেউ গান গাইছে। এইরকম গলায় কোন মেয়েকেও হাসতে শোনেনি কোনদিন। ওকে দেখে মেয়েগুলো মুখের কাছে আলো তুলে ধরল। অবাক চোখে অনিমেষ দেখল পর পর অনেকগুলো মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে সার দিয়ে। কেমন সব সাদা সাদা মুখ আর তাতে পড়েছে লণ্ঠন, কুপির আলো। যেন নিজেদের মুখ অনিকে দেখানোর জন্য ওরা আলোগুলো তুলেছে। একটা মেয়েলি গলায় চিৎকার উঠল, 'এ যে দেখি কেষ্টঠাকুর, নাড়ুগোপাল, ননী খাবার ইচ্ছে হয়েছে বুঝি?'

সঙ্গে সঙ্গে আলোগুলো নিচে নেমে এল, 'ওমা, এ যে দেখছি পুঁচকে ছেলে। আমি ভাবলাম নাগর এল বুঝি।'

খিলখিল করে হেসে উঠল একজন, 'এগুলো হল ক্ষুদে শয়তান, বুঝলে দিদি একটু সুড়সুড়ি উঠেছে কি এসে হাজির।

'ঝ্যাঁটা মার, ঝ্যাঁটা মার।'

www.MurchOna.com

'আঃ থামো তো, রাম না বলতেই রামায়ণ গাইছ'। অনিমেষ দেখলে একটা লম্বা মতন মেয়ে লণ্ঠন হাতে ওর দিকে এগিয়ে এল, 'এই ছোঁড়া, এখানে এসেছিস কেন?'

'আমি আর আসব না।' অনিমেষ তাড়াতাড়ি বলে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে হাসির রোল ছড়িয়ে পড়ল, 'কান ধরে বলতে বল রে।'

মেয়েটি এক হাত কোমরে রেখে অন্য হাতে হ্যারিকেন ধরে আবার বলল, 'কিন্তু এসেছিস কেন? জানিস না এ মহল্লার নাম বেগুনটুলি, এখানে আসতে নেই! নাকি জেনেশুনে এসেছিস?'

ঘাড় নাড়ল অনিমেষ, তারপর বলল, 'আসতে নেই কেন?'

মেয়েটি কি বলতে গিয়ে থেমে গেল, তারপর একটু নরম গলায় জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কোন স্কুলে পড়?'

হঠাৎ তুই থেকে তুমিতে উঠে গেলে অনিমেষের কেমন অস্বস্তি হতে লাগল, 'জেলা স্কুলে।'

বলতে বলতে ও যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে ফেলল। মেয়েটি বলল, 'কি হয়েছে, অ্যায়সা করছ কেন?'

অনিমেষ পা-টা তুলে ধরতেই মেয়েটি মুখে হাত চাপা দিয়ে প্রায় চিৎকার করে উঠল, 'ওমা, এ যে দেখছি রক্তগঙ্গা ছুটছে, ক্যায়সা হল?'

অনিমেষ দেখল আরো একজন এগিয়ে এসে মুখ বাড়িয়ে ওর পা দেখছে। একজন বলল, 'ছেড়ে দে, এই সন্ধ্যেবেলায় আর ঝামেলা বাড়াস না।'

কে একজন জড়ানো গলায় গান গাইতে গাইতে এদিকে আসছে দেখে সবাই হৈ হৈ করে আবার বাতি নিয়ে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। প্রথম মেয়েটি সেদিকে একবার দেখে একটু ইতস্তত করে এক হাত অনিমেষের পিঠের ওপর রেখে বলল, 'তুমি আস্তে আস্তে আমার কামরায় উঠে এস তো।'

একটু এগোলেই সার দেওয়া মাটির ঘর দেখতে পেল অনিমেষ। তারই একটায় মেয়েটি ওকে নিয়ে ঢুকল। ঘরের মধ্যে লণ্ঠনটা রেখে মেয়েটি ওকে বসতে বলল। আসবাব বলতে একটা তক্তাপোশ, তার ওপর বিছানা করা। দুটো বালিশ, কোন পাশবালিশ নেই। দেওয়ালে একটা ভাঙা আয়না ঝোলানো, একদিকে দড়িতে কিছু জামাকাপড় এলোমেলোভাবে টাঙানো। ওকে বসতে বলে মেয়েটি তক্তাপোশের তলা থেকে একটা টিনের স্যুটকেস টেনে বের করে তা থেকে অনেকটা পাড় ছিঁড়ে নিয়ে এসে বলল, 'দেখি, গোড় বাড়াও!' ওর খুব সঙ্কোচ হচ্ছিল মেয়েটি পা ধরায় কিন্তু হঠাৎ ওর মনে হয় মেয়েটি খুব ভাল। এত ভাল যে তার কাছে আসতে নেই কেন? তপুপিসীর চেয়ে বেশী বড় হবে না মেয়েটি কিন্তু সাজগোজ একদম অন্যরকম। এরা কারা? এই যে এত মেয়ে একসঙ্গে রয়েছে, সন্ধ্যেবেলায় আলো নিয়ে ঘুরছে কি জন্যে? এটা কি কোন হোস্টেল? ওদের স্কুলে যেমন ছেলেদের বোর্ডিং আছে তেমন কিছু? কিন্তু মেয়েরা এত চেঁচিয়ে হাসবে কেন? ওর মনে পড়ে গেল হেমলতা ওকে যে অপ্সরাদের গল্প বলেছিলেন তারাও তো এইরকম হাসি গান নিয়ে থাকে, দরকার হলে ভগবানদের সভায় গিয়ে নেচে আসে। এরা কি নাচ জানে? দ্যুৎ অপ্সরারা দারুণ সুন্দরী হয়, এরা তো কেমন কালো কালো। হঠাৎ ডান পায়ের বুড়ো আঙুলে চাপ লাগতেই অনিমেষের নজর পায়ের দিকে চলে এল। ও দেখল ওর পায়ের ওপর ইয়া লম্বা একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয়ে গেছে। ওদের ড্রিল স্যার খুব সুন্দর করে ব্যাণ্ডেজ বাঁধার যে কায়দাটা ওদের শিখিয়ে দিয়েছেন এই মেয়েটা নিশ্চয়ই সেটা জানে না।

'কি, আর দরদ লাগছে?' মেয়েটি গিঁট বেঁধে ওর পা কোল থেকে নামিয়ে দিল। ঘাড় নেড়ে 'না' বলে অনিমেষ উঠে দাঁড়াতেই ওর মনে হল কি একটা যেন ওর কাছে নেই। কি নেই বুঝতে না পেরে ও নিজের হাতের দিকে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠল অনিমেষ। ও যখন দৌড়ে এই গলির মুখে আসে তখনও বইটা তার হাতে ধরা ছিল এটা স্পষ্ট মনে আছে। কারণ ঐ সময় ওর কুঁচকির কাছে কি একটা কামড়াতে ও বইটা হাতজোড়া হয়েছিল বলে একটুও চুলকোতে পারেনি। তাহলে নিশ্চয়ই অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে ও যখন আছড়ে পড়েছিল তখন বইটা ছিটকে গিয়েছে। গোড়ালির ওপর ভর করে ও প্রায় দৌড়ে বাইরে আসছিল কিছু না বলে। মেয়েটি চট করে ওর হাত ধরে বলল, 'চলতে পারবে তো?'

www.MurchOna.com

দ্রুত ঘাড় নাড়ল অনিমেষ, 'হ্যাঁ' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে এল। মেয়েটি খুব অবাক হচ্ছিল ওর এইরকম পরিবর্তনে, লণ্ঠন হাতে পেছন পেছন খানিকটা এসে চেঁচিয়ে বলল, 'আরে শোন, সামালকে যাও।' ততক্ষণে অনিমেষ অনেকটা দূর চলে গেছে। কিন্তু গলিটার মধ্যে এত অন্ধকার কেন? যে জায়গাটায় ও আছাড় খেয়ে পড়েছিল সে জায়গাটা যে ছাই বোঝা যাচ্ছে না কোথায়। পা দিয়ে রাস্তাটা হাঁটকে দেখতে লাগল ও অন্ধের মতন। নতুন স্যার বলেছেন, এই বই না পড়লে দেশকে জানা যাবে না, আমাদের ইতিহাস জানা যাবে না। এই অন্ধকারে অনিমেষ কোথাও বইটার অস্তিত্ব খুঁজে পেল না একা একা। ঠিক এই সময় অন্ধকার ফুঁড়ে একটা চিৎকার উড়ে এল, গলাটা ক্যানকেনে, 'কে রে এখানে ঘুরঘুর করে, ট্যাঁকখালির জমিদারের পো নাকি, বাপের বাসী বিয়ে দেখার বড় সাধ, না রে, যা বেরো এখান হতে।' চারপাশ তাকিয়ে অনিমেষ কাউকে দেখতে পেল না। এই অন্ধকার গলিতে কাউকে দেখা অসম্ভব। অথচ ওর মনে হচ্ছে এই কথাগুলো যে বলল সে যেন স্পষ্ট তাকে দেখতে পাচ্ছে। কেমন সিরসির করতে লাগল ওর। এখান থেকে এক দৌড়ে ও বড় রাস্তায় চলে যেতে পারে। কিন্তু বইটা? ধীরে ধীরে ও পেছন দিকে তাকাল। একটা আলো পেলে হত, কেউ যদি একটা আলো দিত ওকে!

গোড়ালিতে ভর করে ও আবার ফিরে এল। ওকে দেখে একজন শিস দিয়ে উঠল, 'আ গিয়া মেরা জান—খিলাও দো খিলি পান।' আর একজন বলে উঠল, 'হায় কপাল, এ ছোঁড়ার দেখছি জোয়ার এসেছে, তুই যত ওকে ঘরে ফেরত পাঠাবি, কবুতরী, ও তত এখানে ঘুরঘুর করবে দ্যাখ।'

অনিমেষ দেখল সেই মেয়েটি লণ্ঠন হাতে দ্রুত ওর দিকে এগিয়ে এল। তাহলে এর নাম কবুতরী? বেশ সুন্দর নাম তো। ওর কাছে এসে কবুতরী বলল, 'ফিন চলে এলে, ঘর যাও।' এখন ওর কথার মধ্যে বেশ একটা ঝাঁজ টের পেল অনিমেষ। সেই নরম ভাবটা নেই। মুখ ঘুরিয়ে ও আবার গলিটার দিকে তাকাল—একদম ঘুটঘুট করছে। ওর কাছে আলো চাইলে কি খুব রেগে যাবে? কবুতরী সেটা লক্ষ্য করে বলল, 'ডর লাগছে নাকি? আসতে ডর নেই, যেতে ডর! চল, আমি যাচ্ছি। ফির কভি এখানে আসবি না।' লণ্ঠনটা এক হাতে ধরে অন্য হাতে অনিমেষকে টানতে টানতে কবুতরী হাঁটতে লাগল। কয়েক পা এগোতেই বাঁ দিকের রকে চোখ যেতে চমকে উঠল অনিমেষ। একটা বুড়ী শুকনো মুখ ফোকলা দাঁতে হাসছে। তার চোখ দুটো খুব বড়, সমস্ত চামড়া ঝুলছে। দুটো শুকনো পায়ের ফাঁকে মুন্ডুটা ঝোলানো যেন, উবু হয়ে বসে আছে। বোধ হয় কেউ সরিয়ে না দিলে নড়তে পারে না। হ্যারিকেনের আলো ওর মুখ থেকে সরে যাবার আগেই ক্যানকেনে গলায় বেরিয়ে এল মুখ থেকে, 'ক্যারে, বিয়ে দেখলি? অ্যাঁ?'

বুকের ভিতর হিম হয়ে যায় আচমকা। হাঁটতে হাঁটতে কবুতরী বলল, 'ডরো মৎ। ও বহুৎ ভল বুড়ী আছে, আমাদের দেখ ভাল করে।' হোঁচট খাওয়ার জায়গাটায় এসে অনিমেষ দাঁড়িয়ে পড়ল। লণ্ঠনের আলো গলির ভিতর নাচতে নাচতে যাচ্ছে, ব্যাকুল চোখে ও চারধারে খুঁজতে লাগল। সব জায়গায় আলো যাচ্ছে না, বইটা কত দূরে যেতে পারে? কিছুদূর এগিয়ে থমকে দাঁড়াল কবুতরী, 'কি হল, খাড়া হয়ে গেলে কেন?' আর ঠিক তখনই ও দেখতে পেল রাস্তার পাশে নর্দমার গায়ে নরম পাঁকের ভিতর বর্শার মত গেঁথে আছে বইটা। একছুটে অনিমেষ বইটাকে তুলে নিল। টপটপ করে কয়েক ফোঁটা কাদামাখা জল গড়িয়ে পড়ল নিচে, তলার দিকটা কাদায় ভিজে কালো হয়ে গিয়েছে। নতুন স্যার কি বলবেন ওকে? হাত দিয়ে মলাটের কাদা মুছতে গিয়ে কাগজটা আরো কালো হয়ে গেল। আলোটা বেড়ে গেলে ও দেখল কবুতরী পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, 'কি ঢুঁড়ছ? কার কিতাব?'

অনিমেষ বলল, 'আমার। পড়ে গিয়েছিল এখানে। কাদা লেগে গেছে।'

লণ্ঠনটা নামিয়ে রেখে কবুতরী হঠাৎ বইটা টেনে নিল। উবু হয়ে বসে মলাটের ওপর পাগড়ী মাথায় বঙ্কিমচন্দ্রের ছবিটা খানিকক্ষণ দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'নাম কি এই কিতাবের?'

অনিমেষ বলল, 'আনন্দমঠ।' বইটা খুলে পাতাগুলো ওল্টাতে ওল্টাতে কবুতরী বলল, 'জাদা নষ্ট হয়নি। শেষ পাতায় কিছুটা কাদা ছিল, আঙুল দিয়ে সেটাকে মুছতে খানিকটা দাগ হয়ে গেল। বইটা ফেরত দিয়ে কবুতরী জিজ্ঞাসা করল, 'এখন সাফ করলে আরো খারাপ হয়ে যাবে। শুখা হয়ে গেলে সাফ করো।'

www.MurchOna.com

শেষ পাতাটা খোলা ছিল বইটার। ওপরের কাদার দাগের নীচে শেষ লাইনটা জলে অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অনিমেষ হ্যারিকেনের স্বল্প আলোয় অনেকটা চেষ্টা করে লাইনটা পড়ে ফেলল—'বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল।

লাইনটার মানে ও কিছুতেই বুঝতে পারল না।

দাদুর সঙ্গে চলে আসার পর আর স্বর্গছেঁড়ায় যায়নি অনিমেষ। মহীতোষ এর মধ্যে অনেকবার এসেছেন জলপাইগুড়িতে। প্রত্যেকবারই স্ত্রীকে নিয়ে এসেছেন, রাত্রে থাকেন নি কখনো, বেলায় বেলায় চলে গিয়েছেন।

হেমলতা বলেছিলেন, 'মা না বলতে পারিস তুই, নতুন মা বলে ডাকিস, অনি। আমিও তাই বলতাম। হাজার হোক মা তো।' ওরা এলে ধারেকাছে থাকত না অনি। প্রথম দিকে কেমন একটা অস্বস্তি, পরে লজ্জা-লজ্জা করত। অথচ ওঁরা আসবেন ছুটির দিক দেখে যখন অনিকে বাড়িতে থাকতেই হয়। মহীতোষ বাড়ি এসে বেশির ভাগ সময় তাঁর বাবার সঙ্গেই গল্প করেন, চা-বাগানের বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ নেন। সেই সময় তার স্ত্রী রান্নাঘরে হেমলতার পাশে বসে গিয়ে থাকে। মেয়েটির বয়স অল্প এবং হেমলতা প্রথম আলাপেই বুঝে গিয়েছিলেন একদম মারপ্যাঁচ নেই মেয়েটার মধ্যে। এই একটা ব্যাপারে সাধুচরণ সত্যি কথা বলেছিলেন, মেয়েটির স্বভাবের সঙ্গে মাধুরীর যথেষ্ট মিল আছে। চিবুকের আদলটায় তো মাধুরী বসানো, সেইরকমই হাবভাব। তবে মাধুরী একটু ফরসা ছিল এই যা। প্রথম কদিন তো একদম কথাই বলেনি। হেমলতা তিনবার জিজ্ঞাসা করলে একবার উত্তর পান। সে সময় কি কারণে মহীতোষ এদিকে এসেছিলেন, হেমলতা তাঁকে ডেকে বললেন, 'ও মহী, তোর বউ-এর বোধ হয় আমাকে পছন্দ হয়নি, আমার সঙ্গে একদম কথা বলে না?'

মহীতোষ উত্তর দেননি কিছু, চুপচাপ চলে গিয়েছিলেন ঘর থেকে। তাঁর চলে যাওয়া বুঝতে পেরে খুব আস্তে আস্তে অথচ দ্রুত নতুন বউ বলে উঠেছিল, 'আমার ভয় করে।'

'ভয়! ভয় কেন?' অবাক হয়েছিলেন হেমলতা।

মাথা নিচু করে নতুন বউ বলেছিল, 'আমি যদি দিদির মত না হই!'

ব্যাস। সঙ্গে সঙ্গে জল হয়ে গেলেন হেমলতা। মহীতোষের বিয়ে করাটা উনি একদম পছন্দ করেননি সেটা সবাই জানে। নতুন বউ এলে একটা দূরত্ব রেখে গেছেন এই কয়দিন, কখনো অনিকে বলেননি কাছে আসতে। এক সেই প্রথমদিন ওঁরা যখন জোড়ে এলেন, বউ এসে তাঁকে প্রণাম করল, কানে দুল দিয়ে আশীর্বাদ করলেন যখন তখন সরিৎশেখর অনিকে ধরে দাঁড়িয়েছিলেন। ছেলেটা আগাগোড়া মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে থেকে ওঁদের প্রণাম করে চলে গেল। শ্বশুরের সামনে তখন নতুন বউ একমাথা ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে। এখন এই মেয়েটার কথা শুনে বুকটা কেমন করে উঠল হেমলতার। মাধুরীর মুখটা ভাবতে গিয়ে কাঁপুনি এল শরীরে। কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'তোমার নামটা আমার একদম ভাল লাগে না বাপু, আমি তোমাকে কিন্তু মাধুরী বলে ডাকব।'

সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠে ওঁর দিকে তাকিয়েছিল নতুন বউ। হেমলতা দেখেছিলেন দুটো বড় বড় চোখ ওঁর দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রয়েছে। সেদিকে তাকিয়ে হেমলতা দেখলেন একটু একটু করে জল গড়িয়ে এসে চোখের কোণায় জমা হচ্ছে। খুব বড় একটা অন্যায় করে ফেলেছেন বুঝতে পেরে গেছেন ততক্ষণে। সরিৎশেখর চিরকাল তাঁকে বকাবকি করেছেন পেট-আলগা বলে, মনে যা আসে মুখে তা না বললে স্বস্তি পান না হেমলতা। এই মেয়েটাকে মাধুরী বলে ডাকলে মনটা শান্ত হবে ভেবেই কথাটা বলেছিলেন।

খপ করে নতুন বউ-এর হাতটা ধরলেন হেমলতা, 'রাগ করলি ভাই, আমি তোকে সত্যি বলছি, দুঃখ দিতে চাইনি।'

নতুন বউ-এর তখন গলা ধরে গেছে, 'আপনি আমাকে যা খুশি ডাকুন।'

হেমলতা বললেন, 'দেখি তোর একটা পরীক্ষা নিই : কাল রাত্রে পায়েস করেছিলাম। অনির জন্য একবাটি সরপাতা হয়ে আছে। ওটা নিয়ে ছেলেটাকে খাইয়ে আয় দেখি। বেলা হয়ে গেল।'

কথার নেশায় হেমলতা কখন টপ করে যে তুইতে নেমে এসেছেন নিজেই বুঝতে পারেন নি। বয়স ছোট কাউকে যদি ভাল লেগে যায় তাহলে তাকে তুই না বললে একদম সুখ হয় না তাঁর।

www.MurchOna.com

ঘরের কোণায় মিটসেফের ভিতর পায়েসের বাটিগুলো চাপা দেওয়া আছে। আগের সন্ধ্যেবেলায় রাঁধা পায়েস এক-একটা বাটিতে ঢেলে রেখে দেন হেমলতা। নাড়াচাড়া না হওয়ায় বাটিগুলোতে পায়েস জমে গিয়ে পুরু সর পড়ে যায়। সরিৎশেখরের ভালবাসার জিনিসের মধ্যে এখন এই একটা জিনিস টিমটিম্ করে বেঁচে রয়েছে। ভাল দুধ পাওয়া যায় না এখানে, স্বর্গছেঁড়ায় যখন পায়েস রান্না হত সাত বাড়ির লোক টের পেত। কালানোনিয়া চালের গন্ধে চারধার ম-ম করত। সরিৎশেখর নিজেই এক জামবাটি পায়েস দু বেলা খেতেন। দাদুর এই সখটা পেয়েছে নাতি, পায়েস খেতে বড় ভালবাসে ছেলেটা।

আজ মহীতোষরা আসবেন বলে প্রত্যেকের জন্য আলাদা বাটিতে পায়েস রেঁধে রেখেছেন হেমলতা। সকালে দেখছেন সেগুলো জমে গিয়েছে বেশ। বিভিন্ন সাইজের বাটি আছে মিটসেফে। নতুন বউ উঠে দাঁড়ালে তিনি মিটসেফটা ওকে দেখিয়ে দিলেন। বুক সমান মিটসেফের দরজা খুলে নতুন বউ সেদিকে তাকাতেই হেমলতা আড়চোখে দেখতে লাগলেন। অনির মন অল্পে ভরে না, ছোট বাটিতে পায়েস দিলে চেঁচামেচি করবেই। নতুন বউ কোন বাটিটা তোলে দেখছিলেন তিনি, মন বোঝা যাবে। দেওয়ার হাতটা টের পাওয়া যাবে। মেয়েটার বুদ্ধি আছে, মনে মনে খুশি হলেন হেমলতা। বড় তিনটে বাটির একটাকে বের করে আনল নতুন বউ, ছোট দুটোতে হাত ছোঁয়াল না। যাক, অনিটার কখনো কষ্ট হবে না। চামচটাও মনে করে নিল।

হেমলতা বললেন, 'বড় বাড়িতে রয়েছে ও, তুই গিয়ে ভাল করে আলাপ করে পায়েস খাইয়ে আয়।' এক পা হেঁটে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল নতুন বউ। কিছু একটা বলব বলব করে যেন বলতে পারছিল না। সেটা বুঝতে পেরেই যেন হেমলতা বললেন, 'কি হল, আরে বাবা নিজের ছেলের কাছে যাচ্ছিস, লজ্জা কিসের! অনি বড় ভাল ছেলে, মনটা খুব নরম। নে যা, আমি আর বকবক করতে পারছি না, উনুন কামাই যাচ্ছে।'

ভেতরের বারান্দায় সরিৎশেখর মহীতোষের সঙ্গে বসেছিলেন। ঘাড় ঘুরিয়ে নতুন বউকে দেখলেন সরিৎশেখর। একমাথা ঘোমটা, আঁচলের তলায় কিছু একটা ঢেকে নিয়ে উঠোন পেরিয়ে আসছে। ওকে দেখলেই চট করে মাধুরীর কথা মনে পড়ে যায়। মাধুরীও ঘোমটা দিত তবে এতটা নয়। সে মেয়েকে পছন্দ করে এনেছিলেন তিনি, তাঁর পছন্দের জিনিস বেশীদিন টেঁকে না। ছেলের দিকে তাকালেন, মহীতোষও বউকে দেখছে। একটু গলা ঝেড়ে নিয়ে বললেন, 'মেয়েটাকে ওর বাপের কাছে নিয়ে যাও না কেন? প্রত্যেকবারেই দেখতে পাই এখানে এসেই ফিরে যাচ্ছ।'

হঠাৎ এ ধরনের কথার জন্য তৈরী ছিলেন না মহীতোষ। কিছু একটা নিয়ে স্ত্রীকে ওদিকে যেতে দেখে অবাক হয়েছিলেন তিনি। এই প্রথম এ বাড়িতে ওকে নিয়ে কোন কাজ করাচ্ছে দিদি। কিন্তু কার কাছে যাচ্ছে? ওখানে তো অনি থাকে। ছেলের সঙ্গে এখন ভাল করে কথা হয় না তাঁর, কেমন অস্বস্তি হয়। স্ত্রীকে অনির কাছে যেতে দেখে হঠাৎ খুব আরাম বোধ হচ্ছিল। এই সময় বাবার প্রশ্নটা কানে যেতে কি বলবেন বুঝতে না পেরে কান চুলকে বললেন, 'যেতে চায় না ও।'

ভ্রু কুঁচকালেন সরিৎশেখর, 'সে কি! না না, এ ঠিক কথা নয়। তোমারই উদ্যোগ হওয়া উচিত, এক শহরে বাড়ি, তার মা বাবা কি ভাবছেন বল তো!'

সরিৎশেখর নিজে কখনো ছেলের শ্বশুরবাড়িতে যান না, অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও যেতে পারেন না। মহীর বিয়ের রাত্রে বাড়ি ফিরে তাঁর যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল সে কথা কাউকে বলা হয়নি, এমন কি হেমলতাকেও নয়। নাতির মুখের দিকে চেয়ে সেদিন তিনি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

নতুন বউ এদিকটায় কখনো আসেনি। বিরাট বারান্দা পেরিয়ে সার দেওয়া ঘরগুলোর কোনটায় অনিমেষ আছে বুঝে উঠতে সময় লাগল তার। দরজাটা ভেজানো ছিল। হঠাৎ তার মনে হল শরীর অবশ হয়ে যাচ্ছে, হাতে কোন সাড় নেই। এ বাড়িতে যেদিন প্রথম এসেছিল সেদিনও এ রকম মনে হয়নি। এতবড় একটা ছেলে যাঁর তাঁকে বিয়ে করতে কখনই ইচ্ছে হয়নি তার, তবু বিয়েটা হয়ে গেল। আর বিয়ের পর ইস্তক অহরহ যার নাম শুনছে ও, সে হল এই ছেলে। মহীতোষের কথাবার্তায় বুঝতে পেরেছে ছেলের মন জয় করতে মহীতোষ স্ত্রীকে যেন পরোক্ষভাবে নির্দেশ দিচ্ছেন। কিন্তু সেটা কি করে হয়। আজ অবধি জেনেশুনে কোন মন জয় করার চেষ্টা ওকে করতে হয়নি। সেটা কি করে করতে হবে মহীতোষ তাকে শিখিয়ে দেয়নি কিন্তু। ভেজানো দরজাটা ঠেলল নতুন বউ।

www.MurchOna.com

বাবা এবং নতুন মা এসেছেন জানতে পেরে অনি চুপচাপ করে বসেছিল। পিসীমার নির্দেশমত ও মনে মনে নতুন মা শব্দটাকে অনেকখানি রপ্ত করে নিয়েছে কিন্তু ব্যবহার করেনি। দূর থেকে কয়েকবার নতুন মাকে ও দেখেছে। এর আগে ওঁরা যখন এসেছেন তখন দুপুরের খাওয়ার সময় বাবা আর দাদুর পাশে বসে খেতে খেতে মাথা নিচু করে আড়চোখে দেখেছে, একটা রঙিন শাড়ি রান্নাঘরের দরজার অনেকটা আড়ালে দাঁড়িয়ে রয়েছে। খাওয়ার সময় বসে থাকাটা অত্যন্ত খারাপ লাগে অনির। বাবা যেন না বললে নয় এরকম দু'একটা প্রশ্ন করেন। কত তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করতে পারবে সেই চেষ্টা চালিয়ে যায় অনি। পিসীমা পরিবেশন করে বলে স্বস্তি পায় ও। এতদিন যা মনে হয়নি আজ ওঁরা যখন রিক্শা থেকে নামলেন তখন অনি খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল। বাথরুমে টিনের বালতিতে ওর জামাকাপড় জলে ভিজিয়ে দিয়ে নিজের ঘরে আসছিল পড়তে, এমন সময় রিক্শাটা বাড়ির সামনে এসে থামে। মহীতোষ রিক্শাওয়ালাকে পয়সা দিচ্ছিলেন যখন তখন নতুন মা রিক্শা থেকে নেমে ঘোমটা ঠিক করে বাড়ির দিকে তাকাল। তার তাকানোর ভঙ্গিটা অনিকে কেমন চমকে দিল। ওর মনে যেটুকু আছে, মাধুরী এইরকম ভাবে তাকাতেন। এক ছুটে নিজের ঘরে চলে গিয়েছিল অনি, কেউ ওকে লক্ষ্য করেনি।

কালকের পড়া হয়ে গিয়েছিল। খুব একটা আটকে না গেলে ও পড়া বুঝতে সরিৎশেখরের কাছে যায় না। এমনিতে দাদু খুব ভাল কিন্তু পড়াতে গেলেই চট করে এমন রেগে যান যে অনিকে অবশ্যই চড়-চাপড় খেতে হয়। সে সময় ওঁর চেহারাই অন্যরকম হয়ে যায়। একটা সাধারণ ইংরেজী শব্দ অনি কেন বুঝতে পারছে না এই সমস্যাটা এত প্রবল হয়ে ওঠে যে সেটা সমাধান করতে প্রহার ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সামনের বছর থেকে মাস্টার রাখবেন মহীতোষ। সরিৎশেখরকে এ রকম বলতে শুনেছে ও। পিসীমাকে অনি বলেছে যদি মাস্টার রাখতেই হয় তাহলে নতুন স্যারকে যেন রাখা হয়।

অনি দেখল দরজাটা খুলে গেল, এক হাতে বাটি নিয়ে নতুন মা দাঁড়িয়ে আছে। চোখোচোখি হতে মুখ নিচু করল অনি। এ ঘরে কেন এসেছে নতুন মা? ও তো কাউকে বিরক্ত করতে যায়নি। যেন কিছুই দ্যাখেনি এই রকম ভঙ্গী করে অনি সামনে খুলে রাখা একটা বই-এর দিকে চেয়ে থাকল।

'পায়েসটা খেয়ে নাও।' বড়দের মতন নয়, একদম ওদের মত গলায় কথাটা শুনতে পেল অনি। অবাক হয়ে তাকাল ও। পায়েস খেতে ওর খুব ভাল লাগে কিন্তু জ্ঞান হওয়া অবধি রান্নাঘরের বাইরে ভাতের সকড়ি এ বাড়িতে কাউকে আনতে দ্যাখেনি। পিসীমা এ ব্যাপারে ভীষণ খুঁতখুঁতে। জামা-কাপড় না ছেড়ে পায়খানায় গেলে চিৎকার করে পাড়া মাত করে দেন। পায়েস শোয়ার ঘরে বসে খেতে দেবেন, এ একেবারেই অবিশ্বাস্য। হয় পিসীমা জানেন না, নতুন মা না বলে নিয়ে এসেছে। উলটো ব্যাপারটা কিছুতেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করল না অনিমেষের। খুব আস্তে ও বলল, 'আমি শোবার ঘরে পায়েস খাই না।'

থতমত হয়ে গেল নতুন বউ। কথাটা ওর একদম খেয়াল হয়নি, আসার সময় দিদিও বলে দেয়নি। এইটুকুনি ছেলে যে এতটা বিচক্ষণের মত কথা বলতে পারে ভাবতে পারেনি সে, শুনে লজ্জা এবং অস্বস্তি হল। মাথায় বেশ লম্বা ছেলেটা, গড়ন অবিকল মহীতোষের মত। মুখটা খুব মিষ্টি, চিবুকের কাছে এমন একটা ভাঁজ আছে যে দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে। এই ছেলে, এত বড় ছেলের মা হতে হবে, বরং দিদি হতে পারলেও সবচেয়ে খুশি হত।

চেষ্টা করে হাসল নতুন বউ, তারপর ঘরটা দেখতে দেখতে অনির পাশে এসে দাঁড়াল, 'ঠিক বলেছ, আমার ছাই মাথার ঠিক নেই। যেই শুনলাম তুমি পায়েস খেতে ভালবাস ঠিক চলে এলাম। একবারও মনে হল না যে এটা রান্নাঘর না, এখানে সকড়ি চলে না। তা এসেছি যখন তখন এক কাজ করা যাক, আমি হাতে ধরে থাকি তুমি চামচ দিয়ে তুলে তুলে খাও।' পায়েসে গাঁথা চামচসুদ্ধ বাটিটা অনির সামনে ধরল নতুন বউ। সেদিকে তাকিয়ে অনির জিভে জল প্রায় এসে গেল, কি পুরু সর পড়েছে। কিন্তু কেউ বাটি ধরে থাকবে আর তা থেকে ও খাবে এ রকম কোনদিন হয়নি। হঠাৎ ও নতুন বউ-এর দিকে তাকিয়ে বললে, 'তোমরা বাঙাল, না?'

হকচকিয়ে গেল, নতুন বউ, 'মানে?'

পায়েসের দিকে তাকিয়ে অনি বলল, 'পিসীমা বলেন, বাঙালরা সকড়ি-টকড়ি মানে না!'

www.MurchOna.com

খিলখিল করে হেসে ফেলল নতুন বউ। হাসির দমকে সমস্ত শরীর কাঁপছে তার। এই বাড়িতে আসার পর এই প্রথম সে বিয়ের আগের মত হাসতে পারছে। অনির খুব মজা লাগছিল। নতুন মা একদম তপুপিসীর মত করছে। কোন রকমে হাসির দমক সামলে নতুন বউ বলল, 'ঘটি ঘটি ঘটি, বাঙাল বললে চটি।' তারপরেই হঠাৎ গলার স্বর পালটে প্রশ্ন করল, 'তুমি আমার ওপর খুব রাগ করেছ, না?"

মাথা নিচু করল অনি। সেই রাত্রে বাড়িতে ফিরে বারান্দায় দাঁড়ানো সরিৎশেখরকে সে রেগে মেগে যে সব কথা বলেছিল তা কি বাবা জানেন? বাবা জানলেই নতুন বউ জানবে। পিসীমা তো কোনদিন অনির সঙ্গে ও ব্যাপারে কথা বলেননি। কিন্তু অনি জানে পিসীমা সব শুনেছিলেন। আবার বউ-এর দিকে ও পূর্ণচোখে তাকাল। শরীর দেখে খুব বড় বলে একদম মনে হয় না। একটুও ভারিক্কি দেখাচ্ছে না কিন্তু এখন যেভাবে ঠোঁট টিপে হাসছে চট করে মায়ের কথা মনে পড়ে যায়। অনি বলল, 'আমি তোমাকে চিনি না, খামোকা রাগ করতে যাব কেন?'

এক হাতে পায়েসের বাটিটা তখনও ধরা, অন্য হাত অনির চেয়ারের পেছনে রাখল নতুন বউ, 'আমাকে তুমি কি বলে ডাকবে?'

একটু ভেবে অনি বলল, 'তুমি বল?'

'তোমাকে কেউ বলে দেয়নি?'

'হুঁ, বলেছে। পিসীমা বলেছে 'নতুন মা' বলতে।'

খুব ফিসফিস করে শব্দটা উচ্চারিত হতে শুনল অনি।

'তোমার নতুন মা বলে ডাকতে ভাল লাগবে তো?'

অনির কেমন অস্বস্তি হচ্ছিল। কথাবার্তাগুলো এমনভাবে হচ্ছে যে, অন্য একটা অনুভূতির অস্তিত্ব টের পাচ্ছিল সে।

'অনি, আমাকে তুমি ছোট মা বলে ডাকবে? আমি তো চিরকাল নতুন থাকতে পারব না।'

ঘাড় নাড়ল অনি। নতুন মার চেয়ে ছোট মা অনেক ভাল। মায়ের কথা মনে করিয়ে দেবার জন্যেই যেন ছোট মা বলা।

'তাহলে এই পায়েসটা খেয়ে ফেল।' চামচটা এগিয়ে দিল ছোট মা।

হেসে ফেলল অনিমেষ, 'যদি না খাই?'

কপট নিঃশ্বাস ফেলল ছোট মা, 'কি আর করা যাবে। ভাবব আমার কপাল এইরকম। তোমাকে তো আর বকতে পারব না।'

'কেন? মায়েরা তো বকে।'

'হুঁ, ঠিকই তো। আগে তোমাকে খুউব ভালবাসি, না হলে বকব কি করে। এখন থেকে আমরা কিন্তু বন্ধু হলাম, ঠিক তো?'

ঘাড় নাড়ল অনি, ওর খুব মজা লাগছিল।

'বন্ধু হলে কিন্তু সব কথা শুনতে হয়, বিশ্বাস করতে হয়। আমার আজ অবধি একটাও বন্ধু ছিল না। তুমি আমার বন্ধু হলে।'

হাত বাড়িয়ে চামচটা ধরল সে, পুরু সরের চাদর কেটে এক চামচ পায়েস তুলে মুখে পুরতে পুরতে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি খেয়েছ?'

একগাল হেসে ছোট মা বলল, 'কেন?'

'পিসীমা দারুণ পায়েস রাঁধে, খেয়ে দেখো।' নিশ্চিত বিশ্বাসে বলল অনি, 'মাও এত ভাল পারত না।'

নতুন বউ-এর সঙ্গে অনির ভাব হয়ে গিয়েছে জানতে পেরে মহীতোষ সবচেয়ে খুশি হলো। হেমলতার মনটা ব্যবহারে বোঝা যায়, নতুন বউ-এর ওপর তাঁর টান বেড়ে গেছে। সরিৎশেখরকে চট করে বোঝা মুশকিল। হেমলতা দুপুরে খাওয়ার সময় পাখার হাওয়া করতে করতে অনেকবার নতুন বউ-এর সঙ্গে অনির ভাবের কথা তুলেছেন। সরিৎশেখর হাঁ-না করেননি। চিরকালই আত্মীয়স্বজনদের

www.MurchOna.com

সঙ্গে তাঁর একটা আড়াল রাখা সম্পর্ক আছে, মনে কি হচ্ছে বোঝা যায় না। মহীতোষ বিয়ের রাত থেকে এ ব্যাপারে একটা কথাও তাঁর মুখ থেকে বের হয়নি।

এবার মহীতোষরা ফিরে যাবার পর বেশ কিছুদিন আসতে পারলেন না। চা-পাতা তোলা হচ্ছে। এখন ফ্যাক্টরীতে দিনরাত মেশিন চলছে। রবিবারেও সময়-অসময়ে ডাক পড়ে। এখন স্বর্গছেঁড়া ছেড়ে কোথাও যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। অ্যানুয়াল পরীক্ষার পর অনির স্কুল এখন ছুটি। কিন্তু নতুন স্যার ওদের প্রত্যেকদিন স্কুলে যেতে বলেছেন। রোজ দুটো থেকে স্কুলের মাঠে মহড়া হচ্ছে। ছাব্বিশে জানুয়ারি আসছে। নতুন স্যার বলেছেন আমরা জন্মেছি পনেরই আগস্ট আর আমাদের অন্নপ্রাশণ হবে ছাব্বিশে জানুয়ারি।

ঠিক এই সময় এক দুপুরে অনি সেজেগুজে বেরুচ্ছে, ডাকপিয়ন চিঠি দিয়ে গেল। শীতের এই দুপুরে পশ্চিমে সূর্য চলে গেলে সরিৎশেখর পেছন-বারান্দায় ইজিচেয়ার পেতে শুয়ে থাকেন রোদে গা ডুবিয়ে। ডাকপিয়ন ওঁর হাতে চিঠিটা দিয়ে গেল। খামের ওপর ঠিকানা পড়ে তিনি চিৎকার করে ডাকলেন, 'দাদুভাই, তোমার চিঠি।'

ভেতরের কলকাতায় বাসন মাজছিলেন হেমলতা। এখনও স্নান হয়নি তাঁর, জল লেগে পায়ের হাজা জ্বলছে, বার বার চিৎকার শুনে হাত থামিয়ে বললেন, 'ওমা, অনিকে আবার কে চিঠি দিল!'

ঘর থেকে বেরিয়ে চিৎকার শুনে দাঁড়িয়ে পড়েছিল অনিমেষ। আজ অবধি তাকে কেউ চিঠি দেয়নি। চিঠি দেবার মত বন্ধু তার কেউ নেই।

অবশ্য ওর ঠিকানা স্কুলের অনেকের কাছে আছে। স্কুল বন্ধ হবার সময় যারা বাইরে যায় তারা পছন্দমত ছেলের ঠিকানা নিয়ে যায়। কিন্তু কোনবার চিঠি দেয়নি কেউ তাকে। বিশু আর বাপী যেন কেমন হয়ে গিয়েছে। ওরা কোনদিন তাকে চিঠি দেয়নি। বেশ একটা উত্তেজনা বুকের ভেতর নিয়ে অনিমেষ বারান্দায় দাদুর কাছে গেল। ইজিচেয়ারে শুয়ে আছেন সরিৎশেখর, এক হাত ওপরদিকে তোলা, তাতে একটা মোটা নীল খাম ধরা। খামটা নিয়ে একছুটে ভিতরে চলে এল ও, এদিক ওদিক চেয়ে সোজা বাগানে নেমে গেল। সুপারিগাছে বসে একজোড়া ঘুঘু সমানে ডেকে যাচ্ছে। পেয়ারাতলায় এসে খামটা খুলতেই মিষ্টি একটা গন্ধ পেল সে। চট করে মায়ের কথা মনে পড়ে গেল ওর। মার শরীর থেকে ঠিক এরকম গন্ধ বেরুত। মার একটা খুব বড় সেন্টের শিশি ছিল। এই চিঠি যে লিখেছে সেও কি সেই সেন্ট মাখে! খামের ওপর লেখাটা দেখল ও। গোটা গোটা মুক্তোর মত অক্ষরে তার নাম লেখা দাদুর কেয়ার অফে। নীল আকাশের চেয়ে নীল খামটা সন্তর্পণে খুলতেই ভাঁজ করা কাগজ হাতে উঠে এল। চিঠির বুক চিরে চারটে ভাঁজের রেখা চারদিকে চলে গিয়েছে। চিঠির তলায় চোখ রাখল অনি, 'আমার স্নেহাশিষ জানিও। ইতি, আশীর্বাদিকা, তোমার ছোট মা।' উত্তেজনাটা হঠাৎ কমে এল অনির। জানা হয়ে গেলে কোন কিছু নতুন থাকে না। উত্তেজনার জায়গায় কৌতূহল এসে জুড়ে বসল। চিঠিটা পড়ল সে, 'স্নেহের অনি। এই পত্র পাইয়া নিশ্চয়ই খুব অবাক হইয়াছ। এখানে আসিয়া শুধু তোমার কথা মনে পড়িতেছে। তুমি নিশ্চয়ই জান এই সময় তোমার পিতার চাকরিতে ছুটি থাকে না, তাই আমাদের জলপাইগুড়ি যাওয়া হইতেছে না। তাই বলি কি, তোমার যখন পাসের পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে তখন আমার নিকট চলিয়া আসিও। এখনও তো আমার বন্ধু, বন্ধুর নিকট বন্ধু আসিবে না?

তোমাকে লইয়া আমি নদীর ধারে বেড়াইব। শুনিয়াছি নদী বন্ধ হইবে, উহা কি জিনিস আমি জানি না। কুলগাছে প্রচুর কুল ধরিয়াছে। তুমি জানিয়া খুশি হইবে কালীগাইএর একটি নাতনী হইয়াছে। রং সাদা বলিয়া নাম রাখিয়াছি ধবলি। বাড়িতে এখন এত দুধ হইতেছে যে খাইবার লোক নেই। তুমি আসিলে আমি তোমাকে যত ইচ্ছা পায়েস খাওয়াইব। জানি দিদির মত ভাল হইবে না।

গতকাল এখানকার স্কুলের ভবানী মাস্টার আমাদের বাড়িতে আসিয়াছিলেন। তোমাদের স্কুল এই বৎসর হইতে নতুন বাড়িতে উঠিয়া যাইতেছে। ভবানী মাস্টারের ইচ্ছা তুমি অবশ্যই আগামী ছাব্বিশে জানুয়ারী এখানে থাক। কারণ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে প্রথম পতাকা তুমি উত্তোলন করিয়াছিলে। ছাব্বিশে জানুয়ারীতেও সেই কাজটি তোমাকে দিয়া তিনি করাইতে চান। শুনিলাম এই বৎসরই তিনি অবসর লইয়া দেশে চলিয়া যাইবেন।

www.MurchOna.com

তোমার পিতা পরে পত্র দিতেছেন, দিদিকে বলিও। গুরুজনদের আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম দিলাম। তুমি আমার স্নেহাশিষ জানিও। ইতি, আশীর্বাদিকা, তোমার ছোট মা।'

'পুনশ্চ।। এ জীবনে আমি কাহাকেও দুঃখ দিই নাই। অনি, তুমি কি আমাকে দুঃখ দিবে?'

চিঠিটা পড়ে অনিমেষ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। এখন সেই ঘুঘু দুটোই শুধু নয় একরাশ পাখি সমস্ত বাগান জুড়ে তারস্বরে চেঁচামেচি শুরু করেছে। চোখের সামনে স্বর্গছেঁড়ার গাছপালা মাঠ নদী যেন একছুটে চলে এল। সেই কাঁঠাল গাছের ঝুপড়ি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছোট ছোট পাথরের আড়ালে লুকিয়ে থাকা লাল চিংড়িগুলো কিংবা সবুজ গালচের মত বিছানো চা-গাছের উপর দিয়ে গড়িয়ে আসা কুয়াশার দঙ্গল একটা নিঃশ্বাস হয়ে অনিমেষের বুকের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল।

ভবানী মাস্টার চলে যাবেন। 'একটা কথা মনে রাখবা বাবা, নিজের কাছে সৎ থাকলে জীবনে কোন দুঃখই থাকে না।' একটা ঘাম জড়ানো নস্যির গন্ধ যেন বাতাসে ভেসে এল। স্বর্গছেঁড়ায় বাবার যে ইচ্ছেটা মাধুরী চলে যাওয়ার পর একদম চলে গিয়েছিল সেটা হঠাৎ ঝুপ ঝুপ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মায়ের কথাটা ভাবতেই বুকের মধ্যে একটা শীতল ছোঁয়া লাগল অনির। স্বর্গছেঁড়ায় গেলে সবাইকে দেখতে পাবে ও, শুধু মা নেই। তাঁর জায়গায় ছোট মা সারা বাড়িময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিয়ের পর হেমলতা রাগ করে বলেছিলেন, 'দুধের স্বাদ কি ঘোলে মেটে? মা হল মা, সৎমা সৎমাই।' আচ্ছা, সৎমা বলে কেন? সৎ মানে তো ভাল, ভাল মা-রা আবার খারাপ হবে কি করে। কিন্তু ছোট মাকে তো মায়ের মত মনেই হয় না, বরং দিদির মত নিজের মনে হয়। সৎমারা নাকি খুব অত্যাচার করে। ছোট মাকে দেখে, এই চিঠি পড়ে, কেউ সে কথা বললে অনি তাঁকে মিথ্যুক বলবে। এখানে ছোট মাকে তার ভাল লেগেছে কিন্তু স্বর্গছেঁড়ায় গেলে মাকে মনে পড়বেই, তখন ছোট মাকে—! অনির মনে হল বাবাকে যদি সে জিজ্ঞাসা করতে পারত, মাকে ভুলে গেছে কিনা? কিন্তু তবু স্বর্গছেঁড়ায় যাবার জন্যে বুকের মধ্যে যে ছটফটানি শুরু হয়ে গেছে সেটা যাচ্ছে না। নতুন স্যার বলেছিলেন, 'মা নেই কে বলল? জন্মভূমিই তো আমাদের মা। বন্দেমাতরম।' শব্দটা উচ্চারণ করলেই শরীর গরম হয়ে ওঠে। তখন আর কারো মুখ মনে পড়ে না ওর। পেয়ারা গাছের তলায় পায়চারি করতে করতে ও নিচু গলায় আবৃত্তি করতে লাগল, 'আমরা অন্য মা জানি না—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ি নাই—আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা, মলয়জসমীরণ শীতলা, শস্যশ্যামলা—।' হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল অনি। একদৃষ্টে ও মাটির দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। পেয়ারা গাছের তলায় ছোট ছোট ঘাসের ফাঁকে কালো মাটি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সেই মাটিটাকে চেনা যাচ্ছে না আর। সেই স্বর্গছেঁড়া থেকে চলে আসার দিন ও রুমালে করে লুকিয়ে একমুঠো মাটি এনে পেয়ারা গাছের তলায় রেখেছিল। যখনই মন খারাপ করত তখনই এসে মাটিটাকে দেখত, মাটিটা দেখা মানে স্বর্গছেঁড়াকে দেখা। তারপর এক সময় ভুলে গিয়েছিল সেই মাটির কথা। এতদিন ধরে কত বৃষ্টি গেল, প্রতি বছরের বন্যা গেল। এখন আর কাউকে আলাদা করে চেনা যাবে না। মাটিদের চেহারা কেমন এক হয়ে যায়। আমাদের মা নাই, বাপ নাই, আমাদের জন্মভূমি আছে। চিঠিটা পকেটে রাখতে রাখতে অনি ঠিক করল এখন ও স্বর্গছেঁড়ায় যাবে না।

এবারও অনি ভাল রেজাল্ট করে নতুন ক্লাসে উঠল। তবে প্রথম তিনজনের মধ্যে ও জায়গা পাচ্ছে না, সরিৎশেখর ওর প্রগ্রেস রিপোর্ট দেখেছেন, অঙ্কে ও খুব কম নম্বর পাচ্ছে। মহীতোষ চাইছেন, স্কুলের অঙ্কের মাস্টারমশাইকে বাড়িতে শিক্ষক হিসেবে রাখতে, কিন্তু অনির এক গোঁ—নতুন স্যার ছাড়া ও কারো কাছে পড়বে না। সরিৎশেখর নতুন স্যার নিশীথ সেনের সম্বন্ধে খোঁজ নিয়েছেন। ভদ্রলোক বাংলার শিক্ষক, টিউশনি করেন না, তা ছাড়া ইদানীং জলপাইগুড়ির একটি দলের সঙ্গে ওঁর যোগাযোগের কথা সবাই জানে। নিজে সারাজীবন কংগ্রেসকে সমর্থন করেছেন সরিৎশেখর, কিন্তু সেটা দূর থেকে। জলপাইগুড়িতে আসার পর সকাল-বিকাল বাইরে বেরিয়ে স্থানীয় নেতাদের যে চেহারা দেখেছেন তাতে এখানকার পলিটিকস্ ঠিক কি জিনিস তিনি বুঝতে পারছেন না। এই সেদিন বাজারে যাবার সময় দিনবাজার পোস্টঅফিসের সামনে দুজন ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর মুখোমুখি দেখা, দুজনেই খদ্দর পরেছেন, একজনের মাথায় গান্ধীটুপি। টুপিহীন লোকটিকে যেন কোথায় দেখেছেন এরকম মনে হতে ওঁরা এসে তাঁর সঙ্গে আলাপ করলেন। টুপি পরা লোকটি বললেন, 'নমস্কার, আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম।'

সরিৎশেখর বললেন, 'আমার কাছে?'

www.MurchOna.com

'হ্যাঁ। আপনি তো স্বর্গছেঁড়া টি এস্টেটের বড়বাবু?'

'একদিন ছিলাম।'

'আপনি আমাকে চেনেন না। আমি বনবিহারী সেন, মিউনিসিপ্যাল ইলেক্শনের সময় কংগ্রেসের হয়ে আপনার কাছেই দাবী জানাতে যেতাম, হা হা হা।' প্রাণ খুলে হাসলেন ভদ্রলোক।

'দাবি কেন বলছেন, কংগ্রেসকে ভোট দেওয়া আমাদের কর্তব্য।' সরিৎশেখর খুব সৎ গলায় বললেন।

'ভাল ভাল। কিন্তু জানেন, এত কষ্টে স্বাধীনতা এনে দিলাম তবু দেশের লোকজন আমাদের প্রাপ্য সম্মানটা দিতে চায় না। আচ্ছা আপনার একটি ছেলে শুনেছি কম্যুনিস্ট, কি নাম যেন—'

বনবিহারীবাবু পাশের লোকটির দিকে তাকাতেই তিনি বললেন, 'প্রিয়তোষ।'

বনবিহারীবাবু ঘাড় নাড়লেন, 'হ্যাঁ, সে ফিরেছে? পুলিস কিন্তু ওয়ারেন্ট উইথড্র করে নিয়েছে। আসলে আমরা কারো সঙ্গে শত্রুভাবে থাকতে চাই না। ভারতবর্ষ একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র।'

সরিৎশেখর বললেন, 'এ ছেলের ব্যাপারে আমার কোন আগ্রহ নেই।'

দুহাত দুদিকে বাড়িয়ে উৎফুল্ল গলায় বনবিহারীবাবু চিৎকার করে উঠলেন, 'এই তো, এই যে আদর্শের কথা বললেন সমস্ত দেশবাসীর তা থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত। আপনার মত লোকই তো এখন সবচেয়ে বেশী দরকার। হ্যাঁ, আপনার কাছে কেন যাচ্ছিলাম, বলি।'

পাশের লোকটি বললেন, 'এসব কথা ওঁর বাড়িতে গিয়ে বললে হত না?'

বনবিহারীবাবু ঘাড় নাড়লেন, 'আরে না না হলধর, ইনি হলেন আমাদের ঘরের লোক, এঁর সঙ্গে অত ভদ্রতা না করলেও চলবে। হ্যাঁ সরিৎবাবু, আপনি তো জানেন ছাব্বিশে জানুয়ারী আমাদের প্রজাতন্ত্র দিবস। তা এই দিনটিকে সার্থক করে তোলার জন্য আমরা একটা বিরাট পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি। চাঁদমারির মাঠে ঐতিহাসিক জমায়েত হবে, কলকাতা থেকে নেতারা আসবেন, কিন্তু আমাদের স্থানীয় অফিসে বসে এত বড় ব্যাপারটা অর্গানাইজ করা যাবে না। আমাদের ইচ্ছা আপনার বিরাট বাড়িটা তো পড়েই আছে, ওটা আমরা সাময়িক ভাবে অফিস হিসেবে ব্যবহার করি। আপনি কি বলেন?'

থমমত হয়ে গেলেন সরিৎশেখর, 'কিন্তু আমার বাড়ি তো খুব বড় নয়। তা ছাড়া, বাড়ি ভাড়ার কথা—।'

'আমি জানি আপনি ভাড়া দেবেন না, আর সেটা দিয়ে আপনাকে অপমান করব না। আমরা আপনার সহযোগিতা চাই। প্রকৃত দেশসেবী হিসেবে এটা আপনার কাছে নিশ্চয়ই আশা করতে পারি।' বনবিহারীবাবু রুমালে নাক মুছলেন।

মুহূর্তেই সরিৎশেখর চিন্তা করে নিলেন। পার্টি অফিস করতে দিলে বাড়িটার হাল কয়েক দিনেই যা হবে অনুমান করা শক্ত নয়। এত সাধের তৈরী বাড়িতে পাঁচ ভূতে আড্ডা জমাবে, প্রাণ ধরে সহ্য করতে পারবেন না তিনি। হোক সেটা কংগ্রেসের অফিস, এ ব্যাপারে তাঁর কোন দুর্বলতা নেই। এ বাড়ি তাঁর ছেলের মত, অসময়ে দেখবে, তাকে বকে যেতে দিতে পারেন না তিনি। বনবিহারীবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি হয়তো জানেন না আমি অ্যাকটিভ পলিটিকস্ কোনদিন করতাম না। তবে দূর থেকে কংগ্রেসকে সমর্থন করে এসেছি। আমার ভূমিকা আজও একই। আপনাদের এই প্রজাতন্ত্র দিবসের কর্মযজ্ঞে দূর থেকে সমর্থন জানিয়ে যাব। আচ্ছা, নমস্কার—।'

সরিৎশেখরকে হাঁটতে হাঁটতে দেখে বনবিহারীবাবু বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন প্রথমটা, তারপর কোনরকমে বললেন, 'কিন্তু আমি যে নিশীথের কাছে শুনেছিলাম—'

ঘুরে দাঁড়ালেন সরিৎশেখর, 'কে নিশীথ?'

'জিলা স্কুলের টিচার নিশীথ সেন।'

'কি বলেছে সে?'

'নিশীথ বলল, আপনারা কংগ্রেসের সাপোর্টার। আপনার এক নাতি যে জেলা স্কুলে পড়ে, সে নিশীথের কংগ্রেসীজমের প্রচন্ড ভক্ত। নিশীথ তাকে গড়েপিটে তৈরি করছে, তারও ইচ্ছা আপনার বাড়িতেই কংগ্রেস অফিস হোক। আমি কি তাহলে ভুল রিপোর্টেড হলধর? তুমি তো সেই সাপ্লায়ারের কাজ করা থেকে সরিৎবাবুকে চেন?' সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বিস্মিত বনবিহারীবাবু প্রশ্নটা করলেন।

www.MurchOna.com

এতক্ষণে টুপিহীন লোকটিকে চিনতে পারলেন সরিৎশেখর। স্বর্গছেঁড়ায় চা-বাগানের একজন ফায়ারউড সাপ্লায়ারের হয়ে এই লোকটা মাঝে মাঝে অফিসে যেত। মাল না দিয়েও সাপ্লাই হয়েছে বলে চেষ্টা করার জন্য সাপ্লায়ারের কন্ট্রাক্ট বাতিল হয়ে গিয়েছিল। সরিৎশেখর তখন শুনেছিলেন এই লোকটিই নাকি সেজন্য দায়ী। হলধর বলল, 'নিশীথ, তো মিথ্যে কথা বলবে না আপনাকে।'

সরিৎশেখর হাসলেন, 'আমার নাতিকে আমার চেয়ে সেই ভদ্রলোক দেখছি বেশী চিনে গেছেন। ভাল ভাল। আচ্ছা চলি।' আর দাঁড়ালেন না তিনি।

বাজার থেকে ফিরে সরিৎশেখর সোজা অনির ঘরে এলেন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকতে ভালবাসে অনি, সরিৎশেখর ঘর দেখে খুশী হলেন। নিজের জামা-কাপড় ও নিজেই কাচে, হেমলতা ইস্ত্রি করে দেন। কিন্তু বই-এর টেবিল দেখে বিরক্ত হলেন সরিৎশেখর, সব স্তূপ হয়ে পড়ে আছে। পড়ার টেবিলে বসে অনি তখন ছবি আঁকছিল, দাদুকে দেখে সেটা চাপা ছিল। সচরাচর এই ঘরে সরিৎশেখর আসেন না, দরকারে অনিই তাঁর কাছে যায়।

সরিৎশেখর বললেন, 'নতুন বইগুলোর এই অবস্থা কেন, সাজিয়ে রাখতে পার না?' বুক-লিস্ট পাবার পর সদ্য কেনা হয়েছে বইগুলো। ওর ওপর একটা পুরনো বই দেখে হাতে তুলে নিলেন সরিৎশেখর, বঙ্কিমবাবুর আনন্দমঠ। পাতা উল্টে দেখলেন বেশীর ভাগ জায়গায় লাল পেন্সিলে আন্ডারলাইন করা আছে। নাতিকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি, 'এই বই কোথায় পেলে?'

অনি বলল, 'নতুন স্যারের কাছ থেকে এনেছি।'

'পড়েছ?'

ঘাড় নাড়ল অনি, 'হ্যাঁ, আমার অনেকটা মুখস্থ হয়ে গেছে। ধরবে?'

'কেন মুখস্থ করলে?'

প্রশ্নটা যেন আশা করেনি অনি, একটু থেমে বলল, 'আমার ভাল লাগে।'

নাতির দিকে ভাল করে তাকালেন সরিৎশেখর। হঠাৎ ওঁর মনে হল অনি আর সেই ছোটটি নেই। জলপড়া গাছের মত হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়ে অনেকখানি উঠে এসেছে। প্রতিদিন দেখতে দেখতে এই বড় হয়ে ওঠা ব্যাপারটা তিনি টের পাননি। এমন কি গলার স্বর পর্যন্ত পালটে যাচ্ছে ওর।

সরিৎশেখর বললেন, 'নতুন স্যার তোমাকে কি বলেছেন একটু শুনি।'

অনি দাদুর দিকে তাকাল, 'কি কথা?'

সরিৎশেখর বললেন, 'এই দেশের কথা, কংগ্রেসের কথা?'

অনি হাসল, 'নতুন স্যার আমাকে খুব ভালবাসেন দাদু। বলেন, তোমার মত সিরিয়াস ছেলে এই স্কুলে আর কেউ নেই।'

সরিৎশেখর বললেন, 'আচ্ছা! খুব ভাল।'

অনি যেন উজ্জীবিত হল কথাটা শুনে, 'পরিশ্রম, আত্মদান আর ইতিহাস ছাড়া কোন জাতি বড় হতে পারে না। আমাদের এই দেশ স্বাধীন হয়েছে একমাত্র কংগ্রেসের ওই সব গুণ ছিল বলে। তা ছাড়া যে কোন জাতির যদি উপযুক্ত নেতা না থাকে সে জাতি দেশ শাসন করতে পারে না। আমাদের পন্ডিত নেহরু হলেন সেই রকম এক নেতা।'

চোখ বন্ধ করলেন সরিৎশেখর। কি বলবেন ঠিক বুঝতে পারছেন না তিনি। এখন রাস্তাঘাটে যে সব ছেলেকে দেখেন তাদের থেকে অনি আলাদা। কিন্তু ওর নিশীথ সেন এই সব ব্যাপার ওর মাথায় ঢুকিয়ে ভাল করেছে না খারাপ করেছে বোঝা যাচ্ছে না।

'তুমি কি নতুন স্যারকে বলেছ যে, এই বাড়িতে কংগ্রেস অফিস হলে আমার আপত্তি হবে না?' গম্ভীর গলায় প্রশ্নটা করলেন তিনি।

দাদুর গলায় স্বর শুনে অনি চট করে মাথাটা নিচু করে ফেলল। নতুন স্যার যখন বলেছিলেন, ছাব্বিশে জানুয়ারীর প্রিপারেশনের জন্য বড় বাড়ি চাই তখন ও এই কথাটা বলেছিল। তাদের বাড়িতে কংগ্রেস অফিস হলে বড় বড় নেতারা এখানে আসবেন, তাঁদের দেখতে পাবে অনি—এটা ভাবতেই কেমন লাগছিল। খুব সন্তর্পণে মাথা নাড়ল সে, 'হ্যাঁ।'

www.MurchOna.com

সরিৎশেখর এতটা আশা করেননি। তাঁর খুব বিশ্বাস ছিল নিশীথ সেন বানিয়ে বানিয়ে কথাটা বলেছে। হঠাৎ প্রচণ্ড রাগ হয়ে গেল ওঁর, গলা চড়িয়ে বললেন, 'কিসে আমার আপত্তি আছে আর কিসে নেই—এ কথা তুমি জানলে কি করে?'

দাদুর গলা সমস্ত ঘরে গমগম করছে এখন। খুব অবাক হয়ে অনি দাদুর দিকে তাকাল। এই রকম মুখ নিয়ে দাদু কোনদিন তার সঙ্গে কথা বলেননি। অসহায় ভঙ্গিতে ও বলল, 'কিন্তু তুমি তো কংগ্রেসী। দেশবন্ধু, সুভাষ বোস, মহাত্মা গান্ধীর কথা তুমি তো বলতে। তাই আমি ভাবলাম—

হঠাৎ হাত বাড়িয়ে নাতির কান ধরলেন সরিৎশেখর। উত্তেজনায় তাঁর সমস্ত শরীর কাঁপছিল, 'ভীষণ পেকে গেছ তুমি। আমি কংগ্রেসী তোমাকে কখনও বলেছি? মহাত্মা গান্ধী এক সময় কংগ্রেস ছেড়ে দিয়েছিলেন, সুভাষ বোসকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল এ সব খবর নতুন স্যার বলেছে?' টকটকে লাল কানটাকে এবার ছেড়ে দিলেন সরিৎশেখর, 'মানুষের ইতিহাস দিয়ে মানুষকে বিচার করি না আমি, একটা মানুষ কি রকম সেটা তার বর্তমান দেখেই বোঝা যায়। স্বাধীনতার আগে আমরা যা ছিলাম, এই তো তিন বছর চলে গেল প্রায়, কতটুকু এগিয়ে দিয়েছে কংগ্রেস দেশটাকে?' শেষের কথাটা নাতিকে ধমকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি।

কানের ব্যথায় এবং সহসা দাদুর এই নতুন চেহারাটা দেখতে পেয়ে অনি কেঁদে ফেলল এবং কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'নতুন স্যার বলেছেন রাতারাতি দেশ তৈরি করা যায় না।'

'পঁচিশ বছরেও পারবে না। সব নিজের পকেট ভরার ধান্ধায় রয়েছে, দেশটা উচ্ছন্নে গেলে ওদের লাভ! সে কংগ্রেস আর এই কংগ্রেস এক নয়। আটচল্লিশ সালের তিরিশে জানুয়ারী গান্ধীজীর সঙ্গে সে কংগ্রেস মরে গেছে।' এতক্ষণে সরিৎশেখের খেয়াল হল একটি নাবালকের কাছে এ সব কি বলে যাচ্ছেন! বিদ্যাসাগরী চটিতে শব্দ করে বেরিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। ঘরে নাতির দিকে তাকালেন। অনি এখন কাঁদছে না, হাঁ করে দাদুর দিকে তাকিয়ে আছে। বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল সরিৎশেখরের। জীবনে এই প্রথম তিনি অনির গায়ে হাত দিলেন। তাঁর সারাজীবনে অনেক কঠোর কাজ তিনি করেছেন কিন্তু এই নাতির ব্যাপারে তাঁর মনের ভেতর যে দুর্বলতা ওর জন্মমুহূর্ত থেকে এসেছিল তাকে সরাতে পারেননি কখনো। কিন্তু আজ যখন শুনলেন কে এক নিশীথ সেন ওকে গড়েপিঠে তৈরি করছে তখন থেকে বুকের মধ্যে অদ্ভুত একটা ঈর্ষা বোধ করতে শুরু করেছেন তিনি। ছোট ছেলেটা কখন তাঁর অজান্তে রাজনীতির মধ্যে ঝাঁপিয়ে এখন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। ওর ভবিষ্যৎ কি তিনি জানেন না। সে রাজনীতি ব্যক্তিগতভাবে তিনি অপছন্দ করেন। কিন্তু সেটাও তাঁকে খুব বড় আঘাত দেয়নি। সহ্য হয়ে গেছে এক সময়। এখন এই ছোট্ট কাদার তালটাকে যদি কেউ রাজনীতির আগুনে সেঁকে, তাহলে সহ্য করতে কষ্ট হবে বইকি।

অনির কাছে এগিয়ে এলেন তিনি। আস্তে করে দু হাতে ওর মুখটা ধরলেন, 'দাদু, তুমি তো এখন অনেক ছোট, এ সব কথা তোমার ভাববার সময় নয়। এখন তোমার কর্তব্য অধ্যয়ন করা। নিজের দেশের ইতিহাস পড়ে দেশকে প্রথমে জানো, তারপর বড় হয়ে নিজের চোখে তার সঙ্গে দেশকে মিলিয়ে নিয়ে তবে স্থির করবে এ সব করবে কিনা।'

অনি দাদুর এই পরিবর্তনে খুব খুশী হতে পারছিল না। সামনের দিকে মুখ তুলে সে বলল, 'কিন্তু নতুন স্যার বলেন, আমাদের কোন ইতিহাস নেই। যা আছে তা ইংরেজদের লেখা।'

সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন সরিৎশেখর। তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, 'শোন, আমি চাই না তুমি এ সবের মধ্যে থাক। দাদুভাই, একটা কথা চিরকাল মনে রেখো, নিজে উপযুক্ত না হলে কোন জিনিস গ্রহণ করা যায় না। আমি চাই তুমি ফার্স্ট ডিভিশনে স্কুল থেকে বেরুবে। তার আগে তোমাকে এ সব কথা বলতে যেন না শুনি। আর হ্যাঁ, ওই নতুন স্যারের সঙ্গে বেশী মেলামেশা না করলেই ভাল। সামনের মাস থেকে তোমাদের অঙ্কের মাস্টার বাড়িতে পড়াতে আসবেন।'

হনহন করে বেরিয়ে যেতে যেতে সরিৎশেখরের নিজেরই মনে হল, তিনি বৃথা এই শব্দগুলো ব্যবহার করলেন। বঙ্কিমবাবু ঠিকই বলেছেন, 'এ যৌবনজলতরঙ্গ রোধিবে কে?' কিন্তু সেই তরঙ্গটাকে এরা দশ বছর বয়সেই চাপিয়ে দিল যে!

www.MurchOna.com

বন্দেমাতরম্। জেলা স্কুলের বিরাট মাঠ জুড়ে চিৎকারটা উঠে সমস্ত আকাশে ছড়িয়ে পড়ল। প্রায় সাড়ে চারশ' ছেলে তিনটে লাইনে ভাগে ভাগে মাঠ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেকের পরনে স্কুলের য়ুনিফর্ম। প্রথম দিকে স্কাউটরা, পরে সমস্ত স্কুল। একটু আগে হেডমাস্টারমশাই ছাব্বিশে জানুয়ারীর পতাকাটা তুললেন। লাইনের সামনে দাঁড়িয়ে অনির মনে পড়ছিল স্বর্গছেঁড়ার কথা। সাতচল্লিশ সালের পনেরই আগস্ট পতাকা তোলার সময় তার কি অবস্থাটাই না হয়েছিল। প্রত্যেকটা ক্লাসের ছেলেদের সামনে একজন করে লিডার দাঁড়িয়ে। নতুন স্যার অনিকে ওর ক্লাসের লিডার ঠিক করেছেন। এই নিয়ে রিহার্সালের সময় থেকে মন্টু ওর পেছনে লেগে আছে, নেহাত নতুন স্যারের জন্য কিছু বলতে পারছে না। আজকেও একটু আগে লাইনে দাঁড়িয়ে নেতাজীর পিঁয়াজি বলে ক্ষেপাচ্ছিল। যেহেতু সে লিডার তাই মুখটা সামনে ফেরানো, ফলে মন্টুকে কিছু বলতে পারছে না। বন্দেমাতরম্ ধ্বনি উচ্চারণ করার সময় ওর গায়ে সেই কাঁটাটা আবার ফিরে এল। এমন কি দাদু যে অনেক গম্ভীর মুখে আজকের মিছিলে যেতে পার্মিশন দিয়েছেন—সে কথাটাও ভুলে গিয়েছিল। আজকাল দাদু যেন কেমন হয়ে গিয়েছেন।

হেডমাস্টার মশাই-এর বক্তৃতার পর নতুন স্যার মঞ্চে উঠলেন, 'এবার আমরা সবাই সুশৃঙ্খল ভাবে মার্চ করে চাঁদমারির মাঠে যাব। তোমরা জানো নিশ্চয়ই কলকাতা থেকে বিশিষ্ট নেতারা সব সেখানে এসেছেন। তাছাড়া সরকারের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত আছেন। আমরা স্কুলের তরফ থেকে সেই ঐতিহাসিক জমায়েতে যোগ দিয়ে পবিত্র কর্তব্য পালন করব।'

স্কুলের সমস্ত মাস্টারমশাই এমন কি ওদের পাগল ড্রইং-স্যার অবধি সামনে হাঁটতে লাগলেন। সাড়ে চারশ ছেলে ভাগে ভাগে মাঠ ছেড়ে রাস্তায় নামল মার্চ করতে করতে। অনি একবার দেখতে পেল ক্লাস টেনের অরুণদার হাতে বিরাট জাতীয় পতাকাটা উড়ছে। অত বড় পতাকা নিয়ে অনি কখনোই সোজা হয়ে হাঁটতে পারত না। অরুণদাকে খুব হিংসে হচ্ছিল ওর।

রাস্তায় পড়তেই গান শুরু হল। 'চল্-চল্-চল্, ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল।' তালে তালে, এতদিনের রিহার্সাল মনে রেখে যখন সবাই গাইতে গাইতে পা ফেলছে তখন মানুষজন অবাক হয়ে ওদের দেখতে লাগল। টাউন ক্লাব মাঠে পাশ দিয়ে যেতে যেতে ও দেখল রাস্তার দুপাশে ভিড়ের মধ্যে সরিৎশেখর দাঁড়িয়ে আছেন লাঠি হাতে। হঠাৎ দাদুকে ভীষণ বুড়ো বলে মনে হল ওর। চোখাচোখি হতে দাদু মাথা নেড়ে হাসলেন। তখন দ্বিতীয় গানের মাঝামাঝি জায়গায় এসে গিয়েছে। অনি দাদুর দিকে চেয়ে লাইনটা সবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইল, 'সপ্তকোটিকণ্ঠ-কলকল-নিনাদকরালে দ্বিসপ্তকোটি-ভুজৈর্ধৃতখরকরবালে অবলা কেন মা এত বলে।'

করলা নদীর কাঠের পুলটা পেরিয়ে পোস্ট অফিসের সামনে দিয়ে ওদের মিছিলটা এঁকেবেঁকে গাইতে গাইতে এগোতেই ওরা দেখতে পেল এফ. ডি. আই. থেকে ছেলেরা বেরুচ্ছে। এফ. ডি. আই.-এর সঙ্গে জেলা স্কুলের চিরকালের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, খেলাধূলায় ওদের কাছে হেরে গেলেও পড়াশুনায় জেলা স্কুল ওদের থেকে এগিয়ে থাকে প্রতিবার। এফ. ডি. আই.-এর ছেলেদের দেখে চিৎকারটা যেন হঠাৎই বেড়ে গেল। হঠাৎ মন্টু চেঁচিয়ে বলল, 'অনিমেষ, ওদের রাস্তা ছাড়িস না, আমরা আগে বেরিয়ে যাব।' ওদের রাস্তা জুড়ে চলতে দেখে অসহায় হয়ে এফ. ডি. আই.-এর ছেলেরা অপেক্ষা করতে লাগল।

চাঁদমারির মাঠে তিলধারণের জায়গা নেই। সামনের দিকে ওরা যেতে পারল না। স্কাউটরা ড্রিল স্যারের সঙ্গে অন্যদিকে চলে গেল। পুলিস, স্কাউট, গার্লস গাইডরা পতাকাকে অভিবাদন জানালো। চাঁদমারির গায়ে বিরাট মঞ্চ তৈরি হয়েছে। মন্টু বলল, 'চল সামনে যাই, এখান থেকে কিছুই দেখতে পাব না।' ভিড় ঠেলে সামনে যাওয়া সোজা কথা নয়, অনির মাঝে মাঝে দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল ভিড়ের চাপে। শেষ পর্যন্ত ওরা একদম মঞ্চের সামনে যখন এসে দাঁড়াল তখন সমস্ত শরীর এই শেষ জানুয়ারীর সকালেও প্রায় ঘেমে উঠেছে। অনি দেখল বিরাট মঞ্চের ওপর নেতারা বসে আছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একজন বিরাট লোক, যাঁর ছবি প্রায়ই কাগজে বের হয়, অনি তাঁকে বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। পাশেই পুলিশ ব্যাণ্ডে 'ধনধান্যে পুষ্পেভরা' বাজছে। মন্টু বলল, 'আমি এরকম কখনও দেখিনি।'

অনি হাসল, 'কি করে দেখবি, প্রজাতন্ত্র দিবস তো এর আগে আসেনি।'

একটু পরেই অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেল। প্রথমে পায়ে পায়ে বিরাট পুলিসবাহিনী মার্চ করে এসে পতাকাকে স্যালুট করে গেল। পেছনের ব্যাণ্ডের তালে তালে ওদের পা পড়ছিল। স্কাউট আর গার্লস

www.MurchOna.com

গাইডদের যাবার সময় মাঝে মাঝে হাসি শোনা যাচ্ছে জনতার মধ্যে থেকে। একটি মোটা মেয়ে ঠিক সোজা হয়ে হাঁটতে পারছিল না, বেচারার পায়ে বোধ হয় ফোস্কা পড়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেই বিরাট ব্যক্তিটি কপালে হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছেন তখন থেকে। অনি বুঝতে পারছিল ওঁর হাত ব্যথা করছে। এর পরেই বন্দে-এ-এ মাতরম্ ধ্বনি দিতে দিতে কংগ্রেসের ফ্ল্যাগ নিয়ে নেতারা এগিয়ে এলেন অভিবাদন জানাতে। সেই চিৎকারের সঙ্গে গলা মিলিয়ে জনতার মধ্যে কেউ কেউ বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিল। অনির সমস্ত শরীরে এখন অদ্ভুত উত্তেজনা তির তির করে ওঠানামা করছে। আর সেই সময় ঘটে গেল ব্যাপারটা।

কংগ্রেসের লোকজন যখন প্রায় মঞ্চের সামনে এসে পড়েছেন ঠিক তখনই আট-ন'টি যুবক দৌড়ে জনতার ভিতর থেকে বেরিয়ে মঞ্চের কাছাকাছি চলে গেল। ওদের ছোটার ভঙ্গীতে এমন একটা তৎপরতা ছিল যে জনতা এমন কি মার্চ করে আসা কংগ্রেসীরাও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। অনি শুনল ওরা পাগলের মত হাত নেড়ে চিৎকার করছে, 'ইনকিলাব—জিন্দাবাদ। ইনকিলাব—জিন্দাবাদ। এ আজাদী—ঝুটা হ্যায়।' প্রথম কথাটার মানে অনি বুঝতে পারছিল না। কিন্তু বেশীক্ষণ নয়, সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চের ওপর শোরগোল পড়ে গেল। হঠাৎই অজস্র পুলিস এসে ওদের ঘিরে ফেলল। ওরা তখনও সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছে—'ইনকিলাব জিন্দাবাদ'। অনি বিস্ময়ে ওদের দেখছিল। পুলিস লোকগুলোকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। কিন্তু ওরা যাচ্ছে না কিছুতেই। ঠিক সেই সময় কংগ্রেসীরাও ধ্বনি তুলল—'বন্দেমাতরম্।' এদেরও গলার জোর যেন হঠাৎ বেড়ে গেল, 'ইনকিলাব—জিন্দাবাদ'। তারপরই অনির সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ও দেখল নির্দয়ভাবে পুলিসের লাঠি লোকগুলোর ওপর পড়ছে। যন্ত্রণায় চিৎকার করতে করতে ওরা মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে। আর সেই জটলা থেকে একপাটি জুতো সাঁ করে তীরের মত আকাশে উঠে মঞ্চের ওপর দাঁড়ানো কপালে হাত ঠেকিয়ে রাখা লোকটির মাথায় ঠোক্কর খেল। সঙ্গে সঙ্গে লোকটি আর্তনাদ করে পেছনের চেয়ারে ধপ করে বসে পড়লেন। মঞ্চের সবাই এসে তাঁকে ঘিরে ধরেছেন। একজন লোক, বোধ হয় ডাক্তার, ব্যাগ হাতে ছুটে এলেন।

এতক্ষণে পুলিস ওদের সরিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছে। একটা বড় গাড়িতে ওদের তুলে পুলিসরা শহরে চলে গেল।

এখন একটা থিতনো ভাব চারধারে। কেউ কোন কথা বলছে না। জনতার কেউ কেউ উসখুস করে বেরিয়ে যাচ্ছে বাইরে। অবস্থা স্বাভাবিক করতে থেমে দাঁড়ানো কংগ্রেসীরা আবার 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিতে দিতে চলে গেলেন। মঞ্চের ওপর তখনও সবাই ওই নেতাকে নিয়ে ব্যস্ত। কংগ্রেসীদের এই যাওয়াটায় কারো মনে কোন প্রতিক্রিয়া হল না।

মন্টু বলল, 'চল, আমরা পালিয়ে যাই।'

অনিমেষ বলল, 'কেন?'

মন্টু চাপা গলায় বলল, 'মারামারি হতে পারে।' বলে ছুট দিল। সঙ্গে সঙ্গে ওদের ক্লাসের কয়েকজন ওর পেছন ধরল। অনি দৌড়তে গিয়ে হঠাৎ কি মনে হতে না দৌড়ে হাঁটতে লাগল জনতার মধ্যে দিয়ে। আসবার সময় মানুষ ঠাসা হয়ে ছিল মাঠটা, এখন কেমন ফাঁকা ফাঁকা হয়ে গেছে, হাঁটতে কোন কষ্ট হচ্ছে না।

'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' মানে কি? অনি হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিল। এই ধ্বনি এর আগে শোনেনি সে। কথাটা কি বাংলা? নতুন স্যার বলেন, ইংরেজ পুলিসের অত্যাচার সহ্য করেও কংগ্রেসীরা বন্দেমাতরম্ ধ্বনি ছাড়েনি। এরাও তো আজ পুলিসের মার খেয়েও ইনকিলাব জিন্দাবাদ বলেছে! কেন? এখন তো দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। ওরা তবে কি বলতে চায়? কেন ওরা মারকেও ভয় করে না? হঠাৎই ওর ছোটকাকা প্রিয়তোষের কথা মনে পড়ে গেল। এই লোকগুলো কি ছোটকাকার দলের? ছোটকাকা কোথায় চলে গেছে। পিসীমা বলতেন পুলিসের ভয়ে প্রিয় আসে না। কেন পুলিসকে ভয় করবে? এখন তো সবাই বন্দেমাতরমের পুলিস। অনির বুকের মধ্যে আজকের মার-খাওয়া ছেলেগুলোর জন্যে একটু মমতা জমছিল। কেন কংগ্রেসীরা পুলিসদের নিষেধ করল না মারতে? ওরা তো প্রথমে কোন অন্যায় করেনি, পরে অবশ্য জুতো ছুঁড়েছিল। 'ইনকিলাব জিন্দাবাদের' মানেটা জানবার জন্য অনি নতুন স্যারকে খুঁজতে লাগল।

www.MurchOna.com

॥ ৪ ॥

সরিৎশেখর আজ সকালে শিলিগুড়ি গিয়েছেন। ওঁর দীর্ঘদিনের পরিচিত পাগলঝোড়া টি এস্টেটের রিটায়ার্ড হেডক্লার্ক তেজেন বিশ্বাসের গৃহপ্রবেশ আজ। সরিৎশেখরের যাবার ইচ্ছে ছিল না বড় একটা, গেলেই খরচ। ইদানীং টাকা-পয়সার ব্যাপারে আগের মতন দরাজ হতে পারেন না তিনি। পেন্সনের টাকা, সামান্য শেয়ার ডিভিডেণ্ড আর মহীতোষের পাঠানো অনির নামে কিছু টাকা—এর মধ্যেই তাঁকে ম্যানেজ করতে হয়। সেটা করতে গিয়ে এখন একটা আধুলি তাঁর কাছে একটা টাকার মতই মূল্যবান। তাই তেজেন বিশ্বাস যখন এসে হাতজোড় করে যাবার জন্য অনুরোধ করল তখন সরিৎশেখর বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন। এখন প্রতিদিন তাঁকে হিসাব করে চলতে হয়। ব্যাঙ্কে প্রায় তলানিটুকু পড়ে আছে, বাড়িটা এবার ভাড়া না দিলেই নয়। অবশ্য হেমলতার নামে ব্যাঙ্কে বেশ কিছু টাকা তিনি এক সময়ে রেখেছিলেন। কিন্তু সে টাকার কথা চিন্তা করতে গেলে নিজেকে কেমন ছোট মনে হয়। তা তেজেন বিশ্বাসের বাড়িতে হেমলতা প্রায় জোর করে পাঠালেন বাবাকে! এই একঘেয়ে জীবনের বাইরে একটু ঘুরে আসা হবে, মনটা ভাল থাকবে। সেজেগুজে আজ সকাল নটার ট্রেনে শিলিগুড়ি চলে গেলেন সরিৎশেখর, সন্ধ্যের ট্রেনে ফিরে আসবেন অবশ্যই।

আজ স্কুল ছুটি। দাদু চলে যাওয়ার পর অনি পড়ছিল নিজের ঘরে। শীত চলে গেছে, স্কুলে পড়াশুনা এখন জোর কদমে চলছে। এমন সময় বাইরের দরজায় খুব জোর কড়া নড়ে উঠল। বই রেখে ঘরের বাইরে এসে অনি দেখল পিসীমা রান্নাঘরে রয়েছেন, কড়ানাড়ার শব্দ বোধ হয় কানে যায়নি। ইদানীং হেমলতা কানে একটু কম শুনছেন। কড়াটা আর একবার শব্দ করে উঠতেই অনি দৌড়ে এসে দরজা খুলল।

মাঝবয়সী একজন মহিলা, মাথায় অনেকখানি ঘোমটা দেওয়া, অথচ ঘোমটা দেওয়ার ধরন থেকে বোঝা যায় অনভ্যস্ত হাতে দেওয়া, একটি বছর দুয়েকের বাচ্চার হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। অনিকে দেখামাত্র মহিলা হাসলেন, তারপর বললেন, 'তুমি নিশ্চয়ই অনি, না?' অনি দেখল হাসবার সময় মহিলার কালো মাড়ি বেরিয়ে পড়ে। কেমন একটা বিচ্ছিরি সেন্ট না পাউডারের গন্ধ ওঁর শরীর থেকে আসছে। অনি ঘাড় নাড়ল, হ্যাঁ।

সঙ্গে সঙ্গে মহিলা বাচ্চাটাকে বললেন, 'প্রণাম করো, প্রণাম করো, তোমার দাদা হয়।' বলামাত্র দম দেওয়া পুতুলের মত বাচ্চাটি হেঁট হয়ে হাত বাড়িয়ে ওর পায়ের মাটি ছুঁয়ে মাথায় বোলাল। অনি চমকে উঠে সরে দাঁড়াতে গিয়েও সুযোগ পেল না। আজ অবধি কেউ তাকে প্রণাম করেনি, এতকাল ওই সবাইকে প্রণাম করে এসেছে। ওর মুখচোখ লাল হয়ে উঠেছিল। এই সময় বাচ্চাটা আধো আধো গলায় বলে উঠল, 'জল খাবো।'

মহিলা বললেন, 'খাবে বাবা, একটু দাঁড়াও। দাদা তোমাকে জল খাওয়াবে, দুধ খাওয়াবে, সন্দেশ খাওয়াবে, তাই না?'

অনি হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কে?'

'আমি?' মহিলা আবার হাসবার চেষ্টা করলেন, 'চিনতে পারছ না তো! আচ্ছা আগে বল, বাড়িতে এখন কে কে আছেন?'

'আমি আর পিসীমা।'

'দাদু কোথায় গেছেন, বাজারে?'

'না। দাদু আজ শিলিগুড়িতে গিয়েছেন।'

'ও, তাই নাকি!' বলে মহিলা ঘুরে দাঁড়ালেন গেটের দিকে। সেখানে কেউ নেই কিন্তু মহিলা গলা তুলে ডাকলেন, 'চলে এস, তোমার বাবা বাড়িতে নেই।' অনি অবাক হয়ে দেখল গেটের একপাশে ইলেক্ট্রিক পোস্টের আড়াল থেকে একটা লোক বেরিয়ে এদিকে আসছে। তার মুখ চোখ কেমন বসা-বসা, গায়ের শার্ট খুব ময়লা আর পাজামার নিচের দিকটায় অনেকটা ফাটা। কাছাকাছি হতে অনির মনে হল এঁকে সে চেনে, থুতনির কাছে অতখানি দাড়ি ঝোলা সত্ত্বেও ভীষণ পরিচিত মনে হচ্ছে। ও চকিতে মহিলার দিকে তাকাল। এতক্ষণ যেটা লক্ষ্য করেনি সেটা দেখতে পেয়ে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। মহিলার

www.MurchOna.com

শাড়িটা বোধ হয় ঠিক আন্ত নেই আর বাচ্চার জুতোর ডগা ফেটে পায়ের আঙুল বেরিয়ে এসেছে। ঠিক এই সময় লোকটি কাছাকাছি হয়ে মোটা গলায় বলল, 'আমাদের অনির দেখি স্বাস্থ্য বেশ ভাল হয়েছে।' কথাটা শোনা মাত্র অনি আর এক মুহূর্ত দাঁড়াল না। কয়েক লাফে সমস্ত বাড়িটা ডিঙ্গিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে উপস্থিত হল। হেমলতা তখন মাটিতে বঁটি নিয়ে বসে তরকারি কুটছিলেন। ছেলেটাকে হনুমানের মত দুপদাপ করে আসতে দেখে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই অনি তাঁর কানের কাছে গরম নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে বলল, 'জ্যাঠামশাই এসেছে।'

অল্পের জন্যে বঁটিতে আঙুলটা দু'টুকরো হল না, হেমলতা ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে এসেছে?'

'জ্যাঠামশাই, সঙ্গে একজন বউ আর এইটুকুনি একটা বাচ্চা ছেলে।'

কথাটা বলতে বলতে অনি দেখল পিসীমা সোজা হয়ে বড় বড় চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। যেন বিশ্বাস হচ্ছে না এমন গলায় হেমলতা বললেন, 'পরিতোষ এসেছে? তুই চিনতে পারলি? কিন্তু ও তো বিয়ে-থা করেনি—যাঃ, তুই ভুল দেখেছিস!'

হেমলতা উঠতে যাচ্ছেন এমন সময় হাঁকটা ভেসে এল রান্নাঘরে, 'ও দিদি, কোথায় গেলে! দ্যাখো কাদের এনেছি!'

সঙ্গে সঙ্গে হেমলতা বজ্রাহতের মত বললেন, 'পরিই তো। কিন্তু এখন আমি কি করবো, গুরুদেব, আমি কি করবো এখন?'

'আরে তোমাকে ডাকতে ডাকতে গলা ধরে এল আর তুমি এখানে বসে আছ, বাইরে এস, প্রণাম করি।' অনি দেখল জ্যাঠামশাই রান্নাঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন।

হেমলতা ভাইয়ের দিকে তাকালেন। এত বিচ্ছিরি চেহারা হয়েছে যে চট করে চেনা মুশকিল। এই ভাই তাঁর বড় ভাই, এককালে সেই ছেলেবেলায় ওঁর কত আদরের ছিল—হঠাৎ বুকের ভিতরটা কেমন নড়েচড়ে উঠতেই কোনরকমে নিজেকে সামলে নিলেন হেমলতা। বাবা ওকে ত্যাজ্যপুত্র করেছেন, এ বাড়িতে ওর প্রবেশাধিকার নেই। এতদিন পরে কোথা থেকে উদয় হল?

যেন হেমলতা কি চিন্তা করছেন টের পেয়ে গেল পরিতোষ, 'কিছু চিন্তা করো না, তোমাদের ফাদার ফেরার আগেই কেটে পড়ব।'

এতক্ষণে হেমলতা যেন সাড়া পেলেন, শক্ত গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন এলি?'

'তোমাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করছিল, তাছাড়া—' একটু থেমে অনির দিকে তাকাল পরিতোষ, 'অনেকদিন বউ-বাচ্চাটা পেটভরে খায়নি। অবশ্য তোমাদের ফাদার বাড়ি থাকলে আমি ঢুকতাম না। বউটা শালা কিছুতেই শুনতে চায় না, একবার শ্বশুরবাড়ি আসবেই, বাঙাল তো, গোঁ ভীষণ।'

'বাঙাল? বাঙালের মেয়ে বিয়ে করেছিস তুই?'

'বিয়ে করিনি। করতে বাধ্য হয়েছি। আমার একটা বাচ্চা ছেলে আছে, তাকে তুমি দেখবে না?'

হেমলতা উঠে দাঁড়ালেন। বাবাকে তিনি চেনেন। আজ অবধি ভুলেও একবার বড় ছেলের নাম করেননি কখনো। বরং প্রিয়তোষের খোঁজখবর গোপনে নেবার চেষ্টা করছেন তিনি—হেমলতা সেটা বুঝতে পারেন। পরিতোষ তাঁর কাছে মৃত। এই অবস্থায় হেমলতার কি করা উচিত? ভাইকে থাকতে বলা মানে বাবাকে অসম্মান করা নয়? আর সন্ধ্যের মধ্যেই তো তিনি ফিরবেন, তখন? অবশ্য সন্ধ্যে হতে অনেক দেরি আছে। হেমলতা দরজার সামনে এলে পরিতোষ ঝুঁকে তাঁকে প্রণাম করতে যেতেই তিনি চমকে পিছিয়ে দাঁড়ালেন, 'রাস্তার ময়লা কাপড়ে ছুঁয়ে দিয়ো না, আমার স্নান হয়ে গেছে।'

পরিতোষ সোজা হয়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'আমার তো আর জামাকাপড় নেই।'

হেমলতা বললেন, 'তাহলে সরে দাঁড়াও, প্রণাম করার প্রয়োজন নেই।'

পরিতোষ দিদির কাছ থেকে এই ধরনের কথা আশা করেনি, স্খলিত গলায় সে উচ্চারণ করল, 'তুমি মাইরি ফাদারের মতই নিষ্ঠুর।'

সঙ্গে সঙ্গে একটা তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'নিজে যেন সাধুপুরুষ! এক ফোঁটা দয়ামায়া নেই যার সে আবার অন্যকে নিষ্ঠুর বলে!'

কথাটা শুনেই পরিতোষ গর্জে উঠল, 'অ্যাই, চুপ!'

www.MurchOna.com

'চুপ করবো কেন? অনেক চুপ করেছি, আর নয়।'

কয়েক পা এগিয়ে হেমলতা উঠোনের দিকে তাকাতেই দেখলেন বারান্দার সিঁড়িতে বাচ্চাকে কোলে নিয়ে একটি রোগাটে বউ বসে আছে। বুঝতে পেরেও জিজ্ঞাসা করলেন হেমলতা, 'এরা কারা?'

যেন কিছুই হয়নি এমন গলায় পরিতোষ বলল, 'ওই তো, তোমার ভাইবৌ আর ভাইপো। দিদিকে আবার প্রণাম করতে যেও না, রাস্তার কাপড়ে আছ।'

'এমন ভান করো যেন বুদ্ধিতে বৃহস্পতি।' মুখ নেড়ে পরিতোষকে কথাটা বলল মহিলা, তারপর হঠাৎ গলার স্বর বদলে গেল তার। বাচ্চাটাকে সঙ্গে নিয়ে হেমলতার দিকে এগিয়ে এসে প্রায় কেঁদে ফেলল, 'মুখে বড় বড় কথা বলত লোকটা, তাই শুনে ভুলে গেলাম। বিয়ের পর একদিনও পেটভরে খেতে পাইনি, বুকের দুধ শুকিয়ে যাবার পর একে আর দুধ দিতে পারিনি, দিদি, আমি ওকে জোর করে নিয়ে এসেছি আপনার কাছে, আপনিও তো মেয়ে, আমাকে ক্ষমা করবেন না?'

হেমলতার পেছনে পেছনে অনি বেরিয়ে এসেছিল। হঠাৎ পরিতোষ যেন তাকে আবিষ্কার করে বলে উঠল, 'এই ছেলেটা, তুমি এখানে কি করছ? যাও, বড়দের কথার মধ্যে থাকতে নেই।' তারপর চাপা গলায় বলল, 'ফাদারের পেয়ারের নাতি তো, এলেই সব রিপোর্ট করবে।'

সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠলেন হেমলতা, 'পরি, তুই—তুই একেবারে উচ্ছন্নে গিয়েছিস। ছি ছি ছি। সারাটা জীবন বাবাকে জ্বালিয়ে এলি, নিজের এক পয়সা রোজগার করার মুরোদ নেই, আবার এই মেয়েটাকে বিয়ে করে কষ্ট দিচ্ছিস, ছি।'

হাসল পরিতোষ, 'বিয়ে আমি করিনি, আমাকে করেছে।'

মহিলা এই সময় ডুকরে কেঁদে উঠতে হেমলতা বিচলিত হয়ে উঠোনে নেমে এলেন। জ্যাঠামশাইয়ের ধমক খেয়ে অনি কি করবে বুঝতে পারছিল না। লোকটা খারাপ, খুবই-খারাপ, তাদের বাড়িতে কেউ এভাবে কথা বলে না। ও দেখল বাচ্চাটা টলতে টলতে হেঁটে উঠোন পেরিয়ে বকফুলের গাছের দিকে চলে যাচ্ছে—সেদিকে কারো নজর নেই। জ্যাঠামশাইয়ের শরীরের পাশ কাটিয়ে ও নিচে নেমে বাচ্চাটাকে ধরতে গেল। বেচারা এত নির্জীব যে সামান্য হেঁটে আর দাঁড়াতে পারছিল না, অনিকে পেয়ে ওর হাঁটু জড়িয়ে ধরল। পরিতোষ সেটা লক্ষ্য করে বলল, 'বাঃ, দুই ভাইয়ে দেখছি বেশ ভাব হয়েছে।

মহিলা তখনও কাঁদছিল। হেমলতা তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। বয়েস বেশী নয় কিন্তু অসম্ভব পোড়-খাওয়া—দেখলেই বোঝা যায়। ভাল খেতে না পেয়ে শরীর ক্ষয়াটে হয়ে গেছে। এ বাড়ির বউ হবার কোন গুণ চেহারায় নেই। মাধুরী বা নতুন বউয়ের চেহারা দেখলে মনটা যে স্নিগ্ধতায় ভরে যায় এই মেয়েটির মধ্যে তার বিন্দুমাত্র ছায়া নেই।

হেমলতা জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার নাম কি?'

যেন বেরিয়ে আসা কান্নাটা গিলছে এমন গলায় উত্তর এল, 'সাবিত্রী।'

'তোমার বাবা কি বিয়ে দেবার আগে খোঁজখবর নেননি?' কাটা-কাটা ভাবে শব্দগুলো উচ্চারণ করলেন হেমলতা। উঠোনের এক কোণে বাচ্চাটাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে অনি অন্যদিকে তাকিয়ে পিসীমার কথা শুনছিল। এতদিনের দেখা পিসীমার গলা দিয়ে যেন দাদু কথা বলছেন।

'আমার বাবা নেই, যশোরে দাঙ্গার সময় মারা যায়। বিয়ের পর আমরা জানতে পারলাম উনি ত্যাজ্যপুত্র।' সাবিত্রী বলল।

'বাঃ, বিয়ের আগে ছেলের বাড়িঘর আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন বোধ করলে না কেউ? চমৎকার!' হেমলতা হিসাব মেলাতে পারছিলেন না।

পরিতোষ হাসল, 'তখন আর উপায় ছিল না যে। আমাকেও কেটে পড়তে দিল না, রাতারাতি জোর করে বিয়ে দিল। নইলে আমাদের বংশে—'

'চুপ কর! তোর মুখে বংশ কথাটা একদম মানায় না। যাক্, বাচ্চাটাকে নিয়ে যখন এসেছ তখন এমনি চলে যেতে বলছি না। সন্ধ্যেবেলায় বাবা আসার আগেই বিদায় হয়ো। আর তাঁর অনুমতি না

www.MurchOna.com

পেলে এই বাড়িতে কখনই এসো না—মনে থাকে যেন।' হনহন করে আবার রান্নাঘরে ঢুকে গেলেন হেমলতা।

পিসীমা চোখের আড়াল হওয়ামাত্র অনি জ্যাঠামশাইকে মাথার ওপর দু'হাত তুলে একটা নাচের ভঙ্গী করতে দেখল। জেঠিমার কান্না চট করে থেমে গিয়ে কালো কালো দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। বড় বড় পা ফেলে জ্যাঠামশাই জেঠিমার কাছে নেমে এসে চাপা গলায় বললেন, 'দারুণ হয়েছে। তুমি মাইরি জব্বর অ্যাক্টিং করলে সাবু। বড়দি একদম আউট।'

জেঠিমা বললেন, "ঝগড়াটা না বাধালে তোমার দিদি আমার কথা শুনতোই না।'

জ্যাঠামশাই বললেন, 'আমি তো ঘাবড়ে যাচ্ছিলাম। ভাবছিলাম তুমি অরিজিনাল ছাড়ছ কিনা!"

জেঠিমা বললেন, 'পাগল! একটা কথা তো সত্যি বলেছ।'

জ্যাঠামশাই বললেন, 'কি?'

'এই বাড়িটার কথা। এতবড় বাড়ি যার তাকে কি বকা যায়?' এমনভাবে হাসলেন জেঠিমা যে অনির খুব খারাপ লাগল।

'এটা আমার বাবার বাড়ি—আমার নয়। তা ছাড়া আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করা হয়েছে—নো রাইট এই বাড়িতে।' জ্যাঠামশাই উদাস গলায় বললেন। ওঁর চোখ সমস্ত বাড়িটায় ঘুরছিল।

'দেখো না, আস্তে আস্তে সব জল হয়ে যাবে। মানুষের রাগ আমার জানা আছে। কিন্তু শেষবার একটা সত্যি কথা বল তো, শুধু টাকা চুরি করেছিলে বলে ত্যাজ্যপুত্র করেছিল না অন্য কারণ ছিল?' জেঠিমার চাপা গলার স্বর কেমন হিসহিসে।

পরিতোষ খুব অস্বস্তির মধ্যে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বলল, 'ফাইটিং করো না, একটু লটঘট করেছিলাম। প্রথম যৌবন তো!'

'কি বললে? বুড়ো ভাম, পাঁচ বছর আগে প্রথম যৌবন ছিল তোমার—'

ফুঁসে ওঠা সাবিত্রীকে হাত জোড় করে থামিয়ে দিল পরিতোষ, 'নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি করে শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যেতে চাও? আরে পুরুষমানুষের ওরকম একটু-আধটু হয়ই, তা নিয়ে কেউ মাথা খারাপ করে না। তাছাড়া দুজনের ধান্ধাই তো এক।'

সাবিত্রী নিজেকে অনেকটা সামলে নিলেও বোঝাই যায় হজম করতে পারছে না ব্যাপারটা। হঠাৎ ও এদিক ওদিক তাকিয়ে ছেলেকে খুঁজতে গিয়ে দেখল সে অনির হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর ওপর বিরক্ত হয়ে উঠল সে, 'খুব তো চেঁচিয়ে ভেতরের খবর বলছ, ওদিকে ছোঁড়াটা হাঁ করে সব গিলচে।' কথাটা শোনামাত্র পরিতোষ ঘাড় ঘুরিয়ে অনিকে দেখতে পেয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সাবিত্রী চাপা গলায় তাকে বাধা দিল, 'খবরদার, বকাবকি করবে না। মিষ্টি কথায় ওকে হাত করে নিতে হবে।'

অনি দেখল জেঠিমা ওর দিকে আসছে। বাচ্চাটা তখন থেকে ঠায় ওর হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে। অনি বুঝতে পারছিল ছেড়ে দিলেই ও পড়ে যাবে। জেঠিমা বললে, 'কি সুন্দর দেখতে তোমাকে অনি। আহা, মার জন্য খুব কষ্ট হয়, না? সৎমা মারে?'

অনি জেঠিমার মুখের দিকে তকিয়ে বুঝতে পারছিল না কি জবাব দেবে। আজ অবধি এ ধরনের প্রশ্ন তাকে কেউ করেনি। এরা এ বাড়িতে আসা নিয়ে নিজেদের মধ্যে ষড়যন্ত্র করেছে এটা ও বুঝতে পারছিল। ত্যাজ্যপুত্র হলেও জ্যাঠামশাই এ বাড়ির সব খবর রাখে।

বাচ্চাটাকে সামনে এগিয়ে দিয়ে অনি বলল, 'একে ধরুন।'

সাবিত্রী অবাক হয়ে বাচ্চাটাকে টেনে নিতে দেখল অনি গটগট করে উঠোন পেরিয়ে অন্যদিকে চলে গেল। রাগে গা জ্বলে গেল সাবিত্রীর। বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে পরিতোষের কাছে এসে বলল, 'দেখলে, ছেলেটার তেল দেখলে? কথাটার জবাব দেবার প্রয়োজন বোধ করলে না!'

পরিতোষ মুখ বেঁকাল, 'ফাদারের সব কটা ব্যাড ভাইসেস ও পেয়েছে। আচ্ছা করে আড়ং ধোলাই দিতে হয়!'

চোখের আড়াল হতেই অনি পা টিপে টিপে বাগানের মধ্যে দিয়ে ফিরে এল। গাছের আড়ালে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে ও রান্নাঘরের ওপর নজর রাখতে লাগল।

www.MurchOna.com

বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে জামা খুলতে খুলতে পরিতোষকে বলতে শুনল অনি, 'ও বড়দি, আজ তোমার হাতের রান্না খাবো।'

হেমলতা কোন উত্তর দিলেন না। পরিতোষ কান পেতে উত্তরটা শোনার চেষ্টা করে না পেয়ে যেন খুশী হল। অনি দেখল জ্যাঠামশাই জেঠিমার দিকে একটা চোখ কুঁচকে হাসলেন। জামাটা খুলতেই অনির চোখ বড় হয়ে গেল। জ্যাঠামশাইয়ের গেঞ্জিটা ছিঁড়ে ফেটে একাকার। দু'এক জায়গায় সেলাই করে ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। পিসীমা বলেন গেঞ্জি সেলাই করে পরলে লক্ষ্মী চলে যায়। জ্যাঠামশাই কি করে ওটা পরেন?

জ্যাঠামশাই পায়ের ওপর পা দিয়ে বললেন, 'দিদির রান্না কোনদিন খাওনি তো, আহা, মাইরি তোমরা রাঁধতে জানো না।'

জেঠিমা খিঁচিয়ে উঠলেন সঙ্গে সঙ্গে, 'রান্না করার মত জিনিস কোনদিন এনেছ যে রাঁধবো? শুনলে গা জ্বলে যায়।'

হঠাৎ জ্যাঠামশাই বলে উঠলেন, 'যাও না, দিদিকে একটু সাহায্য করো। একা একা রাঁধছেন, দুই একটা পদ তৈরি করে নিজের কৃতিত্ব দেখাও।'

জেঠিমা হতচকিত হয়ে বোধ হয় রান্নাঘরের দিকে এগোচ্ছিলেন, এমন সময় পিসীমার গলা ভেসে এল, 'কাউকে আসতে হবে না। রাস্তার কাপড়ে এ বাড়িতে কেউ রান্নাঘরে ঢোকে না। বাথরুমে জল আছে, বাচ্চাটাকে একবারে স্নান করিয়ে দিতে বল। ভদ্রলোকের মতন দেখতে হোক।'

কথাটা শুনে জেঠিমার মুখ বেঁকে যেতে দেখল অনি। জ্যাঠামশাই চট করে উঠে দাঁড়ালেন, 'সেই ভাল, যাও, মন দিয়ে সাবান মেখে স্নান করে নাও। আমি বরং ছোঁড়াটার কাছ থেকে লেটেস্ট খবর নিই গে।'

জ্যাঠামশাইকে এদিক ওদিক তাকাতে দেখে অনি চট করে বাগানের ভিতরে চলে গেল। ইদানীং ঝোপঝাড় বেশী হয়ে গেছে বলে সরিৎশেখর লোক লাগিয়ে বাগান সাফ করার কথা বলেন। লোক পাওয়া আজকাল মুশকিল বলেই এখনও পরিষ্কার হয়নি। অনি এই সুযোগটাকে কাজে লাগাল। জ্যাঠামশাইয়ের মুখোমুখি হতে ওর একদম ইচ্ছে হচ্ছে না। লোকটাকে অত্যন্ত বদ মনে হচ্ছে ওর।

খেতে বসে অবাক হয়ে গিয়েছিল অনি। একটা লোক এত ভাত খেতে পারে? একসঙ্গে খেতে চায়নি ও, পিসীমা তাগাদা দিয়ে স্নান করিয়ে বসিয়েছেন। বাচ্চাটার খাওয়া আগেই হয়ে গিয়েছিল। তাকে বড় ঘরের মেঝেতে বিছানা করে ঘুম পাড়িয়ে আসা হয়েছে। পরিতোষ স্নান করে সরিৎশেখরের একখানা ধুতি লুঙ্গির মতন জড়িয়েছে। হেমলতা এতক্ষণ সেটা লক্ষ্য করেননি। অনির বারংবার তাকানো দেখে বুঝতে পারলেন, 'তুই বাবার ধুতি পরেছিস?'

পরিতোষ খেতে খেতে বলল, 'সিম্পল রান্না অথচ কি টেস্ট, আহা! হ্যাঁ, কি বললে? ধুতি? আমার পাজামার চেহারা দেখেছ? তুমি কোনদিন ও রকম পাজামা আমাকে পরতে দেখেছ? দিস ইজ লাইফ। বুঝলে!"

'খেয়ে উঠে ধুতি ছেড়ে রাখবি। একেই তোদের ঢুকতে দিয়েছি বলে ভয়ে কাঁটা হয়ে আছি, তারপর যদি এ সব জানতে পারে—' কথাটা শেষ করলেন না হেমলতা।

পরিতোষ দিদির দিকে তাকাল, 'মাইরি দিদি, এটা কি মুসলমানদের তালাক যে ত্যাজ্যপুত্র বললাম আর সমস্ত সম্পর্ক চুকে গেল? তুমি বুকে হাত দিয়ে বল তো, আমার ছেলেবেলার কথা মনে পড়লে কষ্ট হয় না?'

হেমলতা একবার অনির দিকে তাকিয়ে বলব কি বলব না ভাবতে ভাবতে বলে ফেললেন, 'কিন্তু বাবা বলেন যে দুষ্ট ক্ষত হাতে হলে সেটা বাড়তে না দিয়ে যদি হাতটা কেটে ফেলতে হয় তাই ভাল, শরীরটা বাঁচে।'

অদ্ভুতভাবে হাসল পরিতোষ। তারপর বলল, 'আর একটু ভাত দেবে? কম পড়বে না তো!'

হেমলতা ভেতর থেকে ভাত এনে দিতে পরিতোষ বলল, 'ব্যাপারটা কি জানো, তোমরা চিরকাল হাতটা কেটে ফেলার কথাই ভেবেছ, ওষুধ দিয়ে হাতটা সারিয়ে তোলার কোন চেষ্টাই করোনি। তুমি কি

www.MurchOna.com

ভেবেছ আমি পাষাণ? আমার মনের মধ্যে তোমাদের কথা আসে না? আমরা সব ভুলে যেতে পারি, কিন্তু ছেলেবেলার কথা কি ভুলে যেতে পারি?'

হেমলতা বললেন, 'এ সব কথা এখন থাক।'

জ্যাঠামশাই আবার কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, জেঠিমা বলে উঠলেন, 'দিদি যখন বলছেন, তখন আর কথা বাড়াচ্ছ কেন?'

জেঠিমা স্নান করেছেন, কিন্তু সেই আগের কাপড়ই তাঁর পরনে। কথাটা সঙ্গে সঙ্গে যেন মেনে নিলেন জ্যাঠামশাই, 'ঠিক আছে, থাক। আমাকে আর একটু আমড়ার টক দাও।'

খাওয়াদাওয়ার পর অনি নিজের ঘরে চলে এল। এখন জ্যাঠামশাইকে অনেকটা জানা হয়ে গেছে। মুখ হাত ধোওয়ার সময় জ্যাঠামশাই বলেছিলেন যে ওঁরা হলদিবাড়িতে আছেন এখন। দাদু যে ট্রেনে শিলিগুড়ি থেকে আসবেন তাতেই ওঁদের উঠতে হবে যদি যেতে হয়। না হলে কাল সকালে ট্রেন আছে—রাতটা থেকে যেতে হয়। পিসীমা সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন, যে চিন্তা যেন ঘুণাক্ষরে মাথায় না আসে, বিকেলের অনেক আগেই ওদের চলে যেতে হবে।

কথাটা শোনার পর থেকে অনি ভাবছিল স্টেশনে যদি মুখোমুখি দেখা হয় তাহলে দাদু ওঁদের চিনতে পারবেন কি না। জ্যাঠামশাইয়ের চেহারা খারাপ হয়ে গেছে, দাড়ি রেখেছেন, তবু দাদু ঠিক চিনে ফেলবেন। কিন্তু তারপর কি হবে? বিছানায় শুয়ে শুয়ে অনি এইসব ভাবছে, তখন দরজা খুলে পরিতোষ মাথা বাড়াল, 'বাঃ বেশ ঘরটা তো!' অনি তড়াক করে উঠে দাঁড়াতেই পরিতোষ ঘরে ঢুকে চেয়ারে টেনে বসল, 'পড়াশুনা কেমন হচ্ছে?'

কোন রকমে অনি বলল, 'ভাল।'

'খারাপ হবার কথা নয়। সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছ বাবা—আমার ছেলেটাকে দেখেছ? পেট পুরে খাবার দিতেই পারি না তো পড়াশুনা করাবো—সৎমা কেমন চীজ? শহরের মেয়ে তো?' অনির একটা পেনসিল টেবিল থেকে তুলে কানে সুড়সুড়ি দিতে দিতে জ্যাঠামশাই এমনভাবে কথা বলে যাচ্ছিল যে অনি ঠিক তাল রাখতে পারছিল না।

শেষের কথাটা না ধরে অনি বলল, 'সৎমা?'

জ্যাঠামশাই বলল, 'আরে তোমার বাবা আবার বিয়ে করেনি? আমি শালা চিন্তাই করতে পারি না, এত বড় ছেলে যার সে কি করে বিয়ে করে—তা বাবার এই বউ তোমার সৎমা হল না? তুমি কি বলে ডাক?'

'ছোট মা।' কথাগুলো শুনতে অনির খুব খারাপ লাগছিল।

'ওই হল, বাচ্চা কাঁটালের আর এক নাম এঁচোড়। দেখতে শুনতে কেমন?'

'ভাল।'

'তোমার জেঠিমার চেয়ে ভাল?'

কোন রকমে অনি বলল, 'জানি না।'

'কি ফরসা ছিল এককালে, দেখলে মনে হত বেনারসী ল্যাংড়া খাচ্ছি। এখন অবশ্য না খেয়ে খেয়ে আমসত্ত্ব হয়ে গিয়েছে—ছোটকা আসে না?'

জ্যাঠামশাই কথা শুরু করেন যেভাবে শেষ সেভাবে করেন না। ছোটকা মানে প্রিয়তোষ এটা বুঝতে পারল অনি, 'না।'

'শালা এক নম্বরের বুদ্ধু। বাঙালী হয়ে পলিটিক্স বোঝে না। আরে আখের গোছাতে হবে বলেই যদি দল করবি তবে কংগ্রেস কর! আমার কাছে গিয়েছিল একদিন। তোমার কাছে টাকাপয়সা আছে?' জ্যাঠামশাই ওর দিকে ফিরে চাইলেন।

অনি প্রথমে কথাটা ধরতে পারেনি, শেষে দ্রুত ঘাড় নাড়ল, 'না। ছোটকাকু এখন কোথায়?'

'জানি না। তোমার জেঠিমার হাতে তেল-মুড়ি খেয়ে হাওয়া হয়ে গেল। বেশীক্ষণ রাখা রিস্কি—কে দেখে ফেলবে—ফাদারের কাছ থেকে টাকা নেয় না? এখন তো সব কম্যুনিস্টরা দেখি ঝাণ্ডা নিয়ে মিছিল করে, পুলিস কিছু বলে না, ও শালা তাহলে অন্য কারণে পালিয়েছে, তাই না?' কথা বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন জ্যাঠামশাই। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দুবার আড়মোড়া ভেঙে বললেন, 'জব্বর খাওয়া হয়ে গেছে আজ। অনেক প্রাইভেট কথা বললাম, কাউকে বলিস না ভাই।'

www.MurchOna.com

উনি ঘর থেকে চলে যাবার পর অনির খেয়াল হল জ্যাঠামশাই ওকে ভাই বললেন। ও হেসে ফেলল, লোকটা যেন কি রকম। আচ্ছা, আখের গোছাতে কি লোকে কংগ্রেস করে? আখের গোছানো মানে তো বড়লোক হওয়া। নতুন স্যার মোটেই বড়লোক নয়। তবে?

যাবার সময় হেমলতা প্রায় তাড়িয়ে ছাড়লেন। সাবিত্রীর যেন যেতে কিছুতেই ইচ্ছে করছিল না। বার বার বলছিল, 'দিদি, আমি না হয় খোকাকে নিয়ে থেকে যাই। উনি দেখবেন, খোকাকে ফেলতে পারবেন না।'

হেমলতা কান দেননি সে কথায়। বলেছেন, সরিৎশেখর বাড়িতে থাকাকালীন ওরা আসুক, উনি কিছু বলবেন না, কিন্তু ওঁর অনুপস্থিতিতে এদের থাকা চলবে না। অনি দেখছিল যাওয়ার সময় অনেকগুলো পোঁটলা হয়ে গিয়েছে। এগুলো পিসীমা দিয়েছেন, না ওঁরা জোর করে নিয়েছেন, বুঝতে পারছিল না। প্রায় দরজার কাছে গিয়ে পরিতোষ বলল, 'যাঃ, এক পেটি চা দাও!'

হেমলতা ইতস্তত করে বললেন, 'মহী এখনও চা পাঠায়নি।'

'এমন গুল মারো না! আমি দেখলাম খাটের তলায় দুটো পেটি পড়ে আছে। একটা নিচ্ছি।' বলে সটান ভিতরে গিয়ে একটা পাঁচ পাউণ্ডের পেটি বের করে আনল!

হেমলতা বললেন, 'সন্ধ্যে হয়ে আসছে। এবার—'

পোঁটলাগুলো গুছিয়ে বেঁধে নিয়ে ওরা হেমলতাকে প্রণাম করল। সকালে ওঁদের প্রণাম করা হয়নি, অনি এবার চট করে প্রণাম সেরে নিল। জ্যাঠামশাইকে প্রণাম করার সময় তিনি হঠাৎ এক হাতে ওকে জড়িয়ে ধরলেন, 'মাইরি দিদি, আমি শালা এক নম্বরের হারামী।'

হেমলতা বললেন, 'মুখ খারাপ না করে এবার এসো।'

'আসতে বলছ?' অনিকে ছেড়ে দিল পরিতোষ।

'না। আর হ্যাঁ, এই টাকাটা তোমার ছেলেকে মিষ্টি খেতে দিলাম। জন্মাবার পর ওকে প্রথম দেখলাম তো।' হঠাৎ হাতের মুঠো থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে সাবিত্রীর দিকে বাড়িয়ে ধরতেই সে সেটাকে হেমলতার বোঝার আগেই নিয়ে ব্লাউজের ভিতর ঢুকিয়ে ফেলল।

'মাইরি দিদি, তুমি নমস্য। জন্মাবার পর অনিকে ফাদার আংটি দিয়েছিল আর তুমি আমার ছেলেকে দশ টাকা দিলে। অবশ্য তাই বা কে দেয়।'

কথাটা শেষ করে পরিতোষ পুঁটলি নিয়ে হাঁটতে শুরু করল। সাবিত্রী তার পিছনে বাচ্চাকে নিয়ে হাঁটছিল। অনি পিসীমার পাশে দাঁড়িয়ে ওদের যাওয়া দেখছিল। প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। গেটের বাইরে গিয়ে সাবিত্রী বাচ্চাটাকে নিয়ে একবার ঘুরে দাঁড়াল। অনি শুনল এতক্ষণে বাচ্চাটাকে দিয়ে জেঠিমা বলাতে পারল, 'টা—টা।'

হঠাৎ হেমলতা বললেন, 'অনিবাবা, দাদু এলে এদের আসার কথা তুমি বলে ফেলো না, বুঝলে?'

অবাক হয়ে অনি বলল, 'কেন?'

হেমলতা একটা অস্বস্তিতে বললেন, 'সারাদিন পরিশ্রমের পর একথা শুনলে ওঁর শরীর খারাপ হবে। যা বলার আমি বলব।'

'কিন্তু দাদু যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন?'

হাসলেন হেমলতা, 'না, করবেন না।'

কিন্তু সেই রাত্রে, সরিৎশেখর আসার অনেক পরে, অনি যখন বুক দুরুদুরু হয়ে বসে আছে তখন দাদুর চিৎকার শুনতে পেল। তাড়াতাড়ি পা টিপে টিপে দাদুর শোওয়ার ঘরের দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়াল ও। সরিৎশেখর বলছিলেন, 'তুমি অন্যায় করেছ। কেন তাকে ঢুকতে দিলে?' পিসীমা চাপা গলায় কি যেন বললেন। 'তুমি জানো সে চারধারে বলে বেড়াচ্ছে ব্যাঙ্কে আমার নামে লাখ টাকা আছে। আমি নাকি চামার।' সরিৎশেখর আক্ষেপের গলায় বললেন।

পিসীমার গলা শুনতে পেল অনি, 'আমি বলে দিয়েছি যেন এ বাড়িতে সে আর কোনদিন না আসে। আপনি এ নিয়ে আর চিন্তা করবেন না।'

www.MurchOna.com

'তুমি ভীষণ অন্যায় করেছ ঐ অপদার্থটাকে বাড়িতে ঢুকতে দিয়ে। আঃ, আমার রাত্রে ঘুম হবে না।' কিছুক্ষণ চুপচাপ। অনি চলে আসবে ভাবছে, এমন সময় শুনতে পেল দাদু জিজ্ঞাসা করছেন, 'বাচ্চাটা কার মত দেখতে হয়েছে?'

'মায়ের আদল আসে।' পিসীমা বললেন, 'মা-মুখো বাচ্চারা সুখী হয়।'

সরিৎশেখরের গলার আওয়াজটা অন্য রকম ঠেকল অনির কাছে।

আজ ইন্টারস্কুল ক্রিকেট ফাইন্যালে জেলা স্কুল নয় রানে এফ. ডি. আইকে হারিয়েছে। স্কুলের উপর-ক্লাসের ছেলেরা বিজয়-উল্লাস চলার সময় হেডমাস্টার মশাইকে ধরেছিল যাতে আগামী কাল স্কুল ছুটি থাকে। সেটা পাওয়া গেল কিনা এখনও জানা যায়নি। তাই স্কুলের সামনে বেশ কিছু ছাত্রের জটলা হয়েছে। মাঠের একপাশে গোলপোস্টের গা ঘেঁষে নতুন স্যারের সঙ্গে অনিরা বসে ছিল। এমন সময় এফ. ডি. আই স্কুলের নবীনবাবু ওদের কাছে এলেন। নবীনবাবুকে এর আগে দেখেছে অনি। ভীষণ নস্যি নেন আর কংগ্রেস করেন। ছাব্বিশে জানুয়ারীতে কংগ্রেসের প্রসেশনে নবীনবাবুর হাতে পতাকা ছিল। এফ. ডি. আই-এর ছেলেরা পোশাক পালটে চুপচাপই চলে গেল। ইন্টারস্কুলের যত খেলা হয় প্রতিটিতেই প্রায় ওরা জেলা স্কুলকে হারায়, শুধু এই ক্রিকেটটা বাদে। আজকে জেলা স্কুলের অরুণ ব্যানার্জী দারুণ খেলেছে, সামনেবার ও থাকছে না, তখন দেখা যাবে—এইসব বলতে বলতে ওরা চুপচাপই চলে গেল।

নবীনবাবু রুমালে নাক মুছতে মুছতে নতুন স্যারকে বললেন, 'নিশীথ, তোমার সঙ্গে একটু আলোচনা ছিল।' নবীনবাবুকে দেখে অনির খুব হাসি পাচ্ছিল। খেলা চলার সময় কোন বল বাউণ্ডারী পেরিয়ে গেলে নিজের স্কুলের ছেলেদের গালাগালি দিয়ে ভূত ভাগাচ্ছিলেন। অনিদের স্কুলের বড়রা সেই গালাগালিগুলো আওড়ে যাচ্ছিল সঙ্গে সঙ্গে।

নতুন স্যার বললেন, 'আরে বসুন না এখানে, এখনও তেমন ঠাণ্ডা নেই।'

নবীনবাবু একটু ইতস্তত করে বললেন, 'ওয়েদার চেঞ্জ হচ্ছে তো, হিমটিম লাগলে—তাছাড়া'—বলে ওদের দিকে তাকালেন নবীনবাবু।

নতুন স্যার বললেন, 'খুব ব্যক্তিগত কথা?'

নবীনবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, 'রাজনীতির ব্যাপারে।'

নতুন স্যার হাসলেন, 'ও, তাহলে নির্দ্বিধায় বলতে পারেন। এরা আমার খুব অনুগত ছাত্র। তেমন গুরুতর ব্যাপার নয় আশা করি!'

নবীনবাবু এবার ধুতি সামলে ঘাসের ওপর বসলেন, 'এবারও আমরা তোমাদের কাছে হেরে গেলাম। ফুটবলে দেখে নেব!'

নতুন স্যার হাসলেন। অনির খুব ইচ্ছে করছিল ফুটবল নিয়ে কথা হোক। ওঁদের স্কুলের দুজন ছেলে আজ আট বছর ধরে নাকি ফুটবল খেলার জন্য পাস করতে পারছে না। নবীনবাবু বললেন, 'ছাব্বিশে জানুয়ারীর পর একদম হইচই হল না, কেমন আলুনি-আলুনি লাগছে।'

নতুন স্যার বললেন, 'হইচই করার মত লোক নেই, আর ঘটনাটাও কোন ভদ্রলোক সমর্থন করেন নি।'

নবীনবাবু বললেন, 'কিন্তু ওদের পার্টির সভ্যদের ধরে পুলিস প্যাঁদালো, এ তো সবাই চোখের ওপর দেখেছে।'

নতুন স্যার বললেন, 'ওরা পার্টির সভ্য নয় নিশ্চয়ই। কোন পার্টি এই ধরনের হঠকারী কাজ করবে না। আমরা তো জানি নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবার পর ওরা এখনও অগোছালো।'

নবীনবাবু বললেন, 'তাহলে এ কাজ করল কে?'

নতুন স্যার বললেন, 'নিশ্চয়ই কিছু মাথাগরম ছেলে। পুলিস নাকি বলেছে, সবাই শহরের নয়। এসব নিয়ে ভাববেন না।'

নবঅনবাবু বললেন, 'আমি ভাবতে পারি না নিশীথ, এত কষ্ট করে এত রক্ত দিয়ে কংগ্রেস স্বাধীনতা আনলো আর সেদিনের কয়েকটা পুঁচকে ছোঁড়া তাকে অপবিত্র করে দিল! এই প্রতিদান?'

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

হঠাৎ নতুন স্যারের গলার স্বর পালটে গেল, 'এ কথাই তো দেশের মানুষকে বোঝাতে হবে। গান্ধীজীকে হত্যা করতে এ দেশের মানুষের হাত কাঁপেনি। কিন্তু সেটা কজনের হাত? যীশুখ্রীস্ট নিহত না হলে পৃথিবীর কয়েক কোটি মানুষের চোখ খুলত না। আমরা সেই কথাই সবাইকে বোঝাব।'

নবীনবাবু সামনে ঝুঁকে যেন অনিরা শুনতে না পায় এমন গলায় বললেন, 'কাল শশধরবাবুর সঙ্গে দেখা হল। ঐ ঘটনাটাকে কাজে লাগিয়ে লাল পার্টির বারোটা বাজাতে প্ল্যান হচ্ছে।'

নতুন স্যার বললেন, 'সে কি! এটা তো ওদের কাজ নয়, আমরা জানি।'

নবীনবাবু বললেন, 'জানাটা আর জানানোটা এক নয়। শশধরবাবু বললেন, এই সুযোগে ওদের মুখে কালি বোলালে ইলেকশনে ওরা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। নাথিং ইজ আনফেয়ার ইন ওয়ার।'

নতুন স্যার বললেন, 'ইলেকশন! কবে?'

নবীনবাবু কৌটো খুলে আবার নস্যি তুললেন, 'তা জানি না, তবে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে নির্বাচন তো অবশ্যম্ভাবী!'

হঠাৎ নতুন স্যার বললেন, 'যারা সেদিন কাজটা করল তাদের একজনকে আমি চিনি। খুব ভাল কবিতা লিখত। আর আশ্চর্যের ব্যাপার, ও যে কোন রাজনীতিতে বিশ্বাস করে আমি কোনদিন টের পাইনি।'

নবীনবাবু রুমালে নাক মুছতে মুছতে বললেন, 'শশধরবাবু আজ তোমাকে একবার দেখা করতে বলেছেন।'

নতুন স্যার বললেন, 'বাড়িতে থাকবেন?'

নবীনবাবু বললেন, 'না-না। তোমাদের পাড়ায় বিরাম করের বাড়িতে আজ সন্ধ্যেবেলায় উনি আসবেন, সেখানেই যেতে বলেছেন। বিরামবাবুকে চেন?'

'হ্যাঁ, ওঁর স্ত্রীর সঙ্গেও আলাপ আছে।'

'খুব সুন্দরী মহিলা, না?'

নবীনবাবু প্রশ্নটা করতে অনি দেখল নতুন স্যার চট করে ওদের দিকে একবার তাকিয়ে নিলেন। তারপর একটু অস্বস্তি-মাখানো গলায় বললেন, 'ওই মহিলারা যে রকম হন আর কি।'

নবীনবাবু হাসলেন, 'একটু হাতে রেখো, মিউনিসিপ্যাল ইলেকশনে আমাদের ক্যান্ডিডেট হচ্ছেন। ইনকিলাব পার্টিদের কে হচ্ছে জানো?'

নতুন স্যার অন্যমনস্ক হয়ে ঘাড় নাড়লেন। কথাগুলো শুনতে শুনতে অনি ফস করে বলল, 'আচ্ছা, ইনকিলাব জিন্দাবাদ মানে কি?'

সবাই ওর দিকে অবাক হয়ে তাকাতে নতুন স্যার বললেন, 'হঠাৎ তোমার মাথায় প্রশ্নটা এল কেন?'

অনি আস্তে আস্তে বলল, 'বন্দেমাতরম্ শব্দটার মানে তো আমরা জানি, কিন্তু ইনকিলাব জিন্দাবাদ মানে তো জানি না। আচ্ছা, এখন থাক, আমি পরে জিজ্ঞাসা করব।'

কথা বলার ধরন দেখে সবাই হো হো করে হেসে উঠতে অনি মাথা নিচু করল। হঠাৎ হঠাৎ মুখ থেকে নিজের অজান্তে কথা বেরিয়ে যায়। নতুন স্যার বললেন, 'পরে কেন? আচ্ছা, তোমরা যে সব হাসছ তোমাদের কেউ মানেটা বল দেখি?'

অনি চোখ তুলে দেখল, ওরা কেউ কথা বলছে না, প্রশ্নটা শুনে নিজেদের মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে, হঠাৎ নবীনবাবু ফিসফিস করে বলে উঠলেন, 'আমাকে জিজ্ঞাসা করো না। আমি চলি।' নতুন স্যার কিছু বলার আগেই উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

'আরে আপনি যাচ্ছেন কোথায়? একসঙ্গে শশধরবাবুর কাছে যাব ভেবেছিলাম।' নতুন স্যার বলে উঠলেন।

'শশধরবাবু? বিরাম করের বাড়িতে যাবে? তা হলে অবশ্য—।' একটু যেন খুশী হলেন নবীনবাবু, 'আমার সঙ্গে আলাপ নেই, এই সুযোগে আলাপ হয়ে যাবে, চল।'

নতুন স্যার বললেন, 'আরে এখনও তো সন্ধ্যে হয়নি।'

www.MurchOna.com

নবীনবাবু বললেন, 'বয়স অল্প তো, ঠাণ্ডর পাও না। এই সন্ধ্যে হয়নি মনে হওয়া সময়টা খুব ডেঞ্জারাস! চোরা হিম কখন মাথার ভেতর ঢুকে গিয়ে চেপে বসবে টের পাবে না। আমার আবার সাইনাসের ট্রাবল আছে। সাইনাস কি বংশগত রোগ?'

নতুন স্যার উঠতে উঠতে বললেন, 'জানি না। তাহলে আপনার পক্ষে নস্যি নেওয়া তো উচিত হচ্ছে না।'

ওঁকে উঠতে দেখে অনিরাও উঠে পড়ল। এখন সন্ধ্যে হয়নি বটে, কিন্তু পশ্চিমের আকাশটার লাল আভাটা কেটে গেছে। স্কুলের বিশাল মাঠটা জুড়ে অদ্ভুত শান্ত এক ছায়া ক্রমশ গাঢ় হচ্ছে।

নতুন স্যার বললেন, 'চল, হাঁটতে হাঁটতে কথা বলা যাক।'

নবীনবাবুর কথাটা মনঃপূত হল না, 'না না, ওরা আবার হাঁটবে কেন, ছাত্রদের পড়ার সময় হয়ে গেছে। এখন তোমাদের কর্তব্য মন দিয়ে পড়াশুনা করা, রাজনৈতিক আলোচনা করার জন্যে পরে অনেক সময় আছে। সন্ধে হয়ে আসছে, এখন বাবারা দৌড়ে বাড়ি চলে যাও।'

নতুন স্যার হেসে অনির কাঁধে হাত রাখলেন, 'বাড়ি যেতে হলে ওদের বড় রাস্তা অবধি একসঙ্গে যেতে হবে তো। চল তোমরা। হ্যাঁ, যে কথা জিজ্ঞাসা করছিলে, ইনকিলাব জিন্দাবাদ মানে হল—বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।'

নবীনবাবু বললেন, 'তাই বলো! আমার তো ধ্বনিটা শুনলে কেমন ধমক-ধমক মনে হয়। তা ভাই বিপ্লবটা কোথায় যে তা অনেক দিন বাঁচবে?'

নতুন স্যার হাঁটতে হাঁটতে বললেন, 'আমি যত দূর জানি, যে কোন শোষণের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম তাকেই কম্যুনিস্টরা বিপ্লব বলে থাকে। পৃথিবীর আর এক প্রান্তে একজন অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে শোষিত মানুষ এক হয়ে যে সংগ্রাম করেছিল তার ফলে সেই দেশে এক অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে যায়। সেই সংগ্রামের সম্মানে পৃথিবীর সর্বত্র শোষিত মানুষের বুকে উৎসাহ আনতে কম্যুনিস্টরা বলে ইনকিলাব জিন্দাবাদ।'

অনি বলে ফেলল, 'এখন তো আমরা স্বাধীন হয়েছি, ইংরেজরা চলে গেছে, শোষকরা তো আর নেই। তাহলে কেন ওরা ইনকিলাব জিন্দাবাদ বলে সেদিন অমন মার খেল?'

নবীনবাবু চমকিত হয়ে বললেন, 'এ ছেলে তো খুব তৈরি। গুড, গুড। তবে জেনে রেখো খোকা, নেতারা যা বলেন তাই মেনে নেবে, কোন প্রশ্ন করতে নেই। প্রশ্ন করলে কোন শৃঙ্খলা থাকে না।'

নতুন স্যার বললেন, 'ও তো এখনও বালক, কৌতূহল না থাকলে ওকে মানায় না। ওরা বলে, যে স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি তা নাকি ইংরেজরা দয়া করে দিয়ে গেছে। কেউ কি দয়া করে ক্ষমতা দেয় যদি বাধ্য না হয়? ওরা বলে দেশে স্বাধীনতার পর কোন পরিবর্তন হয়নি। অবস্থা একই আছে। আমরাই যেন এখন শোষক। নিশ্চয়ই কেউ এ কথা ভাবতে পারে, তার স্বাধীনতা আছে ভাবার। আমরা রাশিয়ার মত কারো ব্যক্তিস্বাধীনতা কেড়ে নিতে চাইনি। কিন্তু আমাদের ভুল দেশের লোকের কাছে ধরিয়ে দিতে ওরা বিদেশ থেকে আদর্শ আমদানি করল কেন? এমন একটা ধ্বনি ওরা বেছে নিল যার অর্থ দেশের সাধারণ মানুষ জানে না। দেশের ঠাকুর ফেলে বিদেশের কুকুর পূজো করার কি প্রবণতা! সুভাষ বোস কংগ্রেসের আদর্শ মেনে না নিতে পেরে ইনকিলাব জিন্দাবাদ বলেননি, তিনি বলেছিলেন, 'জয় হিন্দ'। আসলে নিজেদের কথা নিজেদের মত করে না বললে কোনদিন দেশের মানুষের সমর্থন পাওয়া যাবে না।'

নবীনবাবু বললেন, 'নিশ্চয়ই। এ দেশে আগামী একশ বছরেও কম্যুনিস্টরা ক্ষমতায় আসবে না।'

নতুন স্যার ম্লান হাসলেন, 'দুঃখ হয়, কয়েকটা তাজা তরুণ ছেলে কি ভ্রান্ত হয়ে বিপথে চলে গেল। আচ্ছা, এবার তোমরা যাও।'

ওরা দাঁড়িয়ে দেখল, নতুন স্যার আর নবীনবাবু বিরাম কর মশাইয়ের বাড়ির দিকে চলে গেল। অনি বন্ধুরা ডানদিকে সেনপাড়ার দিকে চলে গেলে ও একা একা হাঁটতে লাগল। নতুন স্যারের সব কথা ও বুঝতে পারেনি। কিন্তু বন্দেমাতরম্ শব্দটা উচ্চারণ করলে বুকের মধ্যে যে রকম চনমন করে, ইনকিলাব জিন্দাবাদ বললে তা করে না। সেদিন ঐ ধ্বনিটা শোনার পর বাড়িতে একা একা ও আবৃত্তি করেছে। খুব জোরালো মিলিটারী-মিলিটারী বলে মনে হয়। ওর হঠাৎ মনে হল, নতুন স্যার হয়তো ঠিক

www.MurchOna.com

কথা বলেননি। এই ছেলেগুলো কি এতই বোকা যে ইনকিলাব জিন্দাবাদ বলতে বলতে মার খাবে! কোথাও একটা ব্যাপার আছে যা হয়তো নতুন স্যার জানেন না। অনির ছোটকাকার কথা মনে পড়ল। ছোটকাকা কোথায় এখন? ছোটকাকা তো বন্দেমাতরম্ শুনলে মুখটা কেমন করতো! কিসের জন্যে ছোটকাকা এখনও বাড়ি আসে না? ছোটকাকা তো সব বুঝতো। এসব কথা ভাবতে গিয়েই অনির মনে পড়ে গেল তপুপিসী এখন জলপাইগুড়িতে। গার্লস স্কুলে দিদিমণি হয়ে গেছে তপুপিসী। পিসীমা সেদিন দাদুকে বলছিলেন কথাটা। বাড়ির সঙ্গে ঝগড়া করে এই চাকরিটা নিয়ে স্কুলের হোস্টেলে আছে। অনির ভীষণ মনে হতে লাগল, তপুপিসী নিশ্চয়ই ছোটকাকার খবর জানে। কেন মনে হল অনি জানে না, কিন্তু ও ঠিক করল তপুপিসীর সঙ্গে দেখা করবে।

দুদিন বাদে এক বিকেলে অনি তিস্তা গার্লস স্কুলের সামনে এসে দাঁড়াল। আর কদিন বাদেই দোল। জলপাইগুড়িতে দোলটা বেশ বাড়াবাড়ি রকম হয়ে থাকে। গার্লস স্কুলের পথে আসতে আসতে অনি বিহারী মজুরদের চিৎকার করে ঢোলক বাজিয়ে হোলির গান গাইতে দেখেছে। স্কুলের মেইন গেট বন্ধ, তবে গেটের একপাশে ছোট একটা দরজা কেটে বের করা হয়েছে। অনি দেখল বয়স্ক পুরুষ মহিলারা সেই ছোট গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকছেন। সাহস করে অনি ওঁদের পিছু পিছু চলে এল। গেটের এপাশে বিরাট মাঠ, অনেক গাছপালা, তারপর ইংরেজী 'ই' অক্ষরের মতো স্কুল বিল্ডিং। কোথায় তপুপিসীর হোস্টেল বুঝতে না পেরে অনি এদিক ওদিক দেখতে দেখতে ভাবল, এভাবে আসাটা ঠিক হয়নি! তপুপিসীর ভাল নাম ওর জানা নেই। মাঠের দিকে তাকাল ও, মেয়েরা হাডুডু খেলছে। এত বড় মেয়েদের হাডুডু খেলতে ও কখনো দ্যাখেনি। কয়েকটা শাড়িপরা মেয়ে ওর পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে ফিক করে হেসে গেল। মুহূর্তে অনির নিজেকে খুব অসহায় মনে হতে লাগল। ঠিক সেই সময় একটা দারোয়ান গোছের লোক ওকে জিজ্ঞাসা করল, সে কাকে চায়?

অনি বলল, 'নতুন দিদিমণি।'

দারোয়ান বলল, 'কৌনসা দিদিমণি? নাম ক্যা?'

অনি বলল, 'তপুদিদিমণি! স্বর্গছেঁড়া থেকে এসেছে।'

'ক্যা বোলতা? পুরা নাম কহ?' দারোয়ান খিঁচিয়ে উঠল।

'পুরো নাম জানি না।' অনি বলল।

'তব ভাগো। দো মিনিট নেহি থা আর ফটসে ঘুঁস গিয়। যা ভাগ। লিডিস স্কুলমে ঘুঁসনেমে বহুত মজা—হ্যাঁ?'

লোকটা অনির হাত ধরে টানতে টানতে গেটের দিকে নিয়ে যেতে লাগল। অনি বলল, 'আমাকে ছেড়ে যাও, আমি চলে যাচ্ছি।' ওর খুব লজ্জা করছিল। মাঠের অন্য মেয়েরা ওর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে।

হঠাৎ একটি মেয়ে দৌড়ে ওদের দিকে দারোয়ানকে ডাকতে ডাকতে এল। ডাক শুনে দারোয়ান ওকে ধরে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ওর শক্ত লোহার মত আঙুলের চাপে অনির হাত ভেঙে যাবার উপক্রম হচ্ছিল। মেয়েটি হাঁপাতে হাঁপাতে কাছে এসে বলল, 'দারোয়ান, দিদি ওকে ছেড়ে দিতে বলল।'

'কোন দিদি?' দারোয়ান বোধ হয় এটা আশা করেনি।

'ডেপুটি দিদি?' মেয়েটি কথাটা বলতেই দারোয়ান ওর হাত ছেড়ে দিল। অনির মনে হল, ওর হাতটা কব্জির কাছে ভেঙে গেছে। একটুও সাড় পাচ্ছে না। অন্য হাতটা দিয়ে ও অবশ্য জায়গাটায় মালিশ করতে গিয়ে শুনল মেয়েটি তাকে বলছে, 'তোমাকে দিদিমণি ডাকছেন।'

খুব অবাক হয়ে অনি ওর মুখের দিকে তাকাল। ফ্রক পরা এই মেয়েটি মাথায় তারই মত লম্বা, দৌড়ে এসেছে বলে মুখটা একটু লালচে। ও বলল, 'আমাকে?'

মেয়েটি ঘাড় নেড়ে 'হ্যাঁ' বলল।

'কে?' অনি ঠিক বুঝতে পারছিল না।

'ডেপুটি দিদি।'

'আমি তো—!' অনি ভয় পেল, হয়তো তার এই প্রবেশের জন্য স্কুলের কর্তৃপক্ষ ওকে শাস্তি দেবেন, শুধু দারোয়ানের আঙুলের চাপই যথেষ্ট নয়। অনি ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা,

www.MurchOna.com

এখানে তপু দিদিমণি কোথায় আছেন, স্বর্গছেঁড়ায় থাকতেন?' মেয়েটিকে তুমি বলতে কেমন বাধলো অনির।

'উনিই তো আমাদের ডেপুটি। উনিই তোমাকে ডাকছেন।' অনির বোকামি দেখে মেয়েটি ঠোঁট টিপে হাসল।

তপুপিসী কি ধরনের কাজ করে যাতে তাকে ডেপুটি বলা যায় তার কোন ধারণা ছিল না অনির। ও মেয়েটির পেছনে পেছনে অনেকটা পথ হেঁটে এল। এর আগে কোন গার্লস স্কুলের ভেতর ও ঢোকেনি, এখন এতগুলো মেয়ের মধ্যে তাদের সপ্রশ্ন দৃষ্টির সামনে হাঁটতে গিয়ে অনির খুব অস্বস্তি হতে লাগল। অদ্ভুত এক আড়ষ্টতা এবং পুরুষালী সপ্রতিভতা একসঙ্গে ওকে পেয়ে বসল।

মাঠের শেষে চেয়ারে গা এলিয়ে তপুপিসী বসে ছিল। অনিদের আসতে দেখে উঠে দাঁড়াল। অনি খানিকটা দূর থেকে তপুপিসীকে দেখে খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল। ভীষণ রোগা হয়ে গেছে তপুপিসী। মুখ চোখ যেন কেমন কেমন, রাগী রাগী মনে হয়।

মেয়েটি বলল, 'দিদি, ওকে এনেছি।' কথাটা শেষ হতেই তপুপিসী ওকে হাত ধরে কাছে টেনে নেন, 'ওমা, আমাদের অনি, তুই কত বড় হয়ে গেছিস। দূর থেকে দেখে আমি একদম অবাক। একবার ভাবি অনি কিনা, তারপর হাঁটা দেখে বুঝলাম; এ নির্ঘাত তুই। খুব লম্বা হয়েছিস যাহোক, সোজা হয়ে দাঁড়া দেখি, ওমা, আমি কোথায় যাব—তুই যে একদম আমার মাথায় মাথায় হয়ে গেছিস।' গালে হাত দিতেই তপুপিসীর মুখের গাম্ভীর্য কোথায় পালিয়ে গেল। এই ধরনের কথা শুনে অনির খুব ভাল লাগছিল। এইভাবে নিজের লোকের মত কথা কেউ বলে না আজকাল। ও দেখল মেয়েটি বিস্ময়ে হাঁ হয়ে তপুপিসীকে দেখছে। বোধ হয় ওদের কাছে তপুপিসীর এই চেহারাটা অজানা। তপুপিসী বলল, 'এই ছোঁড়া, সেই যে এলি, তারপর আর স্বর্গছেঁড়ায় গেলি না? খুব নিষ্ঠুর তুই।' তারপরেই ঘটনাটা মনে পড়ে যাওয়ায় গলাটা অদ্ভুত নরম হয়ে গেল তার, 'মায়ের জন্য খুব কষ্ট হয় না রে?' তপুপিসীর হাতটা ওর কাঁধের ওপর ছিল। অনি মাথা নিচু করল! ও আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করেছে, ইদানীং মায়ের কথাবার্তা কেউ বললে ও বেশ সহ্য করতে পারে, আগেকার মত দমবন্ধ হয়ে কান্না পায় না।

'তোর নতুন মা কিন্তু খুব ভাল মেয়ে। আচ্ছা, তুই কার কাছে এসেছিস এখানে? কি পরিচিতি আছে এখানে?' তপুপিসী যেন হঠাৎ বাস্তবে ফিরে এলো।

হাসল অনি, 'তোমার কাছে এসেছিলাম।'

'আমার কাছে? সত্যি? তাহলে ফিরে যাচ্ছিলি কেন?'

'দারোয়ান তাড়িয়ে দিচ্ছিল। তোমার পুরো নাম বলতে পারিনি।'

কথাটা শুনে হাঁ হয়ে গেলো তপুপিসী, 'সে কি! তুই আমার নাম জানিস না?'

নিজেকে সামলাতে সামলাতে অনি বলল, 'কি করে জানব, তুমি ডেপুটি-ফেপুটি হয়েছ!'

'ওমা, আরে আমি তো এই হোস্টেলে থাকি আর মেয়েদের খুব শাসন করি, তাই ওরা ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেন্ট করে দিয়েছে।' তপুপিসী বোঝালেন। 'তা হ্যাঁরে, কার কাছে শুনলি আমি এখানে আছি?'

অনি বলল, 'শুনলাম পিসীমা বলছিল।'

তপুপিসী বলল, 'বড়দি, মেসোমশাই ভাল আছেন?' অনি ঘাড় নাড়ল।

'কেউ তোকে পাঠিয়েছে আমার কাছে?' তপুপিসী চোখ বড় বড় করল।

ঘাড় নাড়ল অনি, 'না।'

এই প্রথম অনির মনে হল, ও যে জন্য তপুপিসীর কাছে এসেছে সেটা বলতে ওর কেমন সঙ্কোচ হচ্ছে। ছোটকাকু কোন খবর তপুপিসীর কাছে পেতে হলে যে সম্পর্কটা থাকা দরকার সেটা আছে কি? অনির মনে পড়ল সেই চিঠিটার কথা, যার অর্থ তখন সে বুঝতে পারেনি কিন্তু তপুপিসীর জন্য কষ্ট হয়েছিল। এই তো তপুপিসী বাড়ি-ঘর ছেড়ে একা একা এখানে আছেন, কেন, কি জন্যে?

তপুপিসী জিজ্ঞাসা করলো, 'কেন এসেছিস বল না রে?'

এবার অনি ঠিক করল, ও বলেই ফেলবে। মাথা নিচু করে ও বলল, 'আমি একটা কথার মানে বুঝতে পারি না। ছোটকাকু থাকলে আমি জিজ্ঞাসা করতাম। তুমি জানো কোথায় ছোটকাকু আছে?'

'আমি জানবো এই ধারণা তোর কি করে হল?' যেন একটা গভীর কুয়োর ভেতর থেকে কথা বলছে তপুপিসী।

www.MurchOna.com

অনি সত্যি কথা বলে ফেলল, 'আমি তোমার চিঠিটা পড়েছিলাম, পুলিস সেটা পায়নি। ছোটকাকু চলে যাবার পর পুলিস এসে ওটা পেলে তোমাকে ধরত। দাদুর আলমারিতে চিঠিটা রয়েছে, তুমি যদি চাও এনে দিতে পারি।'

তপুপিসী বলল, 'কি কথা মানে তুই বুঝতে পারিস না অনি?'

'বন্দেমাতরম আর ইনকিলাব জিন্দাবাদ, ছোটকাকু কেন দ্বিতীয়টাকে বেছে নিল? কোনটা বড়?' অনি বলল।

কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থেকে তপুপিসী বলল, 'তুই এত ছোট ছেলে, তোর এ সবে কি দরকার! এ বড় শক্ত জিনিস, ভীষণ নেশা। মদের চেয়েও খারাপ নেশা। এ নেশা সব খায়। আমরা সাধারণ মানুষ, আমাদের এই নেশা থেকে অনেক দূরে থাকা উচিত।'

ঠিক সেই সময় ঢং ঢং করে পেটা ঘড়িতে ভিজিটরদের যাবার নির্দেশ বাজল। অনি দেখল গার্ডেনরা সব গেটের দিকে চলে যাচ্ছেন। তপুপিসী হঠাৎ কেমন কেমন গলায় বলে উঠলো, 'অনি, তার খবর কখনও যদি পাস আমাকে বলে যাবি? আমায় ছুঁয়ে বলে যা, বলে যাবি তো?'

॥ ৫ ॥

কে যেন এসে খবর দিয়ে গেল মহীতোষ খুব অসুস্থ, বিকেলের দিকে রোজই জ্বর আসছে। জলপাইগুড়ি থেকে স্বর্গছেঁড়ায় সরিৎশেখর পোস্ট অফিস মারফৎ চিঠিপত্র খুব একটা পাঠাতেন না। চার ঘণ্টার পথ কোন কোন সময় চার দিন নিয়ে নিত ডাকবিভাগ। খেয়েদেয়ে দুপুর নাগাদ কিং সাহেবের ঘাটে গিয়ে দাঁড়ালেই হল, প্রচুর লোক স্বর্গছেঁড়া, বীরপাড়া, বানারহাটে যাচ্ছে। তাদেরই কারো হাতে চিঠি দিয়ে দিতেন তিনি, মহীতোষ সন্ধ্যে নাগাদ পেয়ে যেতেন। যাঁরা স্বর্গছেঁড়ার লোক নন অথচ মহীতোষকে চেনেন তাঁরা যাবার সময় স্বর্গছেঁড়ায় চৌমাথার পেট্রল-পাম্পে চিঠি রেখে যেতেন। চিঠি দেবার না থাকলেও সরিৎশেখর দুপুরে কিং সাহেবের ঘাটে যেতেন। ওখানে গেলে পুরো ডুয়ার্সের হালফিল খবর পাওয়া যায়। কোর্টকাছারি করতে অজস্র মানুষ আসছেন ওদিকে মালবাজার-নাগরাকাটা আর এদিকে ফালাকাটা-হাসিমারা থেকে। অনেকেই সরিৎশেখরকে চেনেন, দেখা হলে নমস্কার করে খবরাখবর নেন। তাছাড়া চিম্বার মার্চেন্টরা তো আছেনই, ওঁদের জলপাইগুড়িতে না এসে উপায় নেই। তা আজ বিকেলে ফেরার সময় এই খবরটা পেলেন। মহীতোষ যে অসুস্থ এ কথা আগে কেউ বলেনি, কেউ চিঠি লেখেনি। বিকেলের দিকে জ্বর আসছে এটা ভাল কথা নয়। তিস্তার পাশ ঘেঁষে যে কাঁচা পথটা দিয়ে রোজ হাঁটাচলা করতেন সেটার ওপর মাটি পড়ছে। পি. ডব্লু. ডি. অফিসের সামনে দিয়ে ঘুরে আসতে হল।

অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটছিলেন সরিৎশেখর। আজকাল লাঠি আর পা কেমন মিলেমিশে পথ মেপে নয়। লাস্ট বাস বার্নিশ থেকে ছাড়ে বিকেল ছটায়। এখনও ঘণ্টা দেড়েক সময় আছে, অনিকে নিয়ে রওনা হলে রাত নটার মধ্যে স্বর্গছেঁড়ায় পৌঁছে যাওয়া যায়। তেমন বোধ করলে মহীতোষকে এখানে নিয়ে এসে চিকিৎসা করাতে হবে। হঠাৎ তাঁর মনে হল আজ অবধি তাঁকে শুধুই দায়িত্ব পালন করে যেতে হচ্ছে। চাকরিতে যখন ছিলেন তখন তো বটেই, আজ নিঃসঙ্গ অর্থহীন অবসর-জীবনেও এইসব সাংসারিক চিন্তা তাঁকে ভাবতে বাধ্য করে। সব ছেড়েছুড়ে একা একা বেঁচে থাকার সুখ পাওয়া আর হল না। অথচ হেম আজকাল প্রায়ই বলে থাকে যে তিনি নাকি অত্যন্ত নির্দয়, পাষাণ। তাঁর কথাবার্তা অত্যন্ত ঠোঁটকাটা এবং পরবর্তী প্রতিক্রিয়া না ভেবে বলা। হেম এসব কথা আগে বলতে সাহস পেত না, ইদানীং বলে থাকে। সরিৎশেখরের মাঝে মাঝে মনে হয়, মেয়ের মাথাটায় কিছু গোলমাল হয়েছে। কারণ রাতারাতি তাঁর সম্পর্কে যে ভয়টা সকলের ছিল সেটা হিম খোয়ালো কি করে। মাঝে মাঝে এমন উপদেশ দেয় যে বন্ধুর মত মনে হয়, খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে গোলমাল করলে মায়ের মত ধমকে ওঠে, আবার বাবার সংসারে পড়ে থেকে জীবনটা নষ্ট হল বলে যখন আক্ষেপ করে তখন চট করে বড় বউ-এর কথা মনে পড়ে যায়। এ এক অদ্ভুত খেলা মেয়ের সঙ্গে, হেমলতাও মৌজ হয়ে খেলে যায়। অনির সঙ্গে কথাবার্তা কম হয়। পড়াশুনা খারাপ করছে না, করলে রেজাল্ট ভাল হতো না। তাঁর কড়া নির্দেশ আছে

www.MurchOna.com

যেখানেই থাকো সন্ধ্যের মধ্যে বাড়ি ফিরতে হবে। সকালে অঙ্কের মাস্টার পড়িয়ে যায় অনিকে, মহীতোষ তার টাকা দিচ্ছে। কিন্তু বাজারদর যে ভাবে বাড়ছে সংসারের খরচ সামলানো মুশকিল হয়ে পড়ছে তাঁর। ফলে হেমলতার জমা-টাকায় হাত দিতে হয়। মনে মনে ভীষণ কুণ্ঠার মধ্যে আছেন।

প্রতিজ্ঞা করেছিলেন স্বর্গছেঁড়ায় ফিরে যাবেন না আর। জীবনের সব প্রতিজ্ঞাই কি রাখতে পারা যায়? দ্রুত পা চালালেন সরিৎশেখর। হাসপাতাল পাড়া থেকে দুটো সাইকেল রিকশা রেস দিয়ে আসছিল কোর্টের দিকে। মোড় ঘোড়ার সময় এ ওকে ডিঙিয়ে যেতে যেতে পরস্পরকে ছুঁয়ে ফেলতেই ঘটে গেল ব্যাপারটা। সরিৎশেখর দেখলেন রিকশাটা দ্রুত তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। কিছু বোঝার আগেই হাঁটুর ওপর প্রচণ্ড একটা আঘাত তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দিল না। প্রায় মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন সরিৎশেখর। হইহই করে লোকজন ছুটে এল চারধার থেকে। রিকশা রাস্তার একপাশে কাত হয়ে উলটে আছে। রিকশাওয়ালা ছোকরা মাটিতে শুয়ে। ওরা যখন সরিৎশেখরকে তুলে ধরল তখন তাঁর চোখে অন্ধকার, চশমা নেই, লাঠিটা ছিটকে গেছে হাত থেকে। মাজাভাঙা লাউডগার মত হিলহিল করছে শরীর, ছেড়ে দিলেই ধুপ করে পড়ে যাবেন, বাঁ পা-টা যেন তাঁর শরীরে নেই। আর তারপরেই বেদনাটা অনুভব করলেন তিনি, যেন একটা ধারালো করাত দিয়ে কেউ তাঁর পা কেটে দিচ্ছে। ছেলেরা অনেকেই সরিৎশেখরকে চিনতো, দাঁড়িয়ে থাকা অন্য রিকশাটায় ওরা ওঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। ধাক্কা লাগার পর সেটার কিছু হয়নি, এমন কি রিকশাওয়ালারাও চুপচাপ ভদ্রলোকের মত দাঁড়িয়ে ছিল।

অন্ধকারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অনি বাড়ি ফিরে আসতো। সূর্য ডুবে গেলে যে ছায়াটা চারধার জুড়ে তাকে সেটা মন-কেমন করায়। কারণ একটু বাদেই দৌড়তে হবে, পিসীমা ঠাকুরঘর থেকে সন্ধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসার আগেই কলতলায় পৌঁছে যেতে হবে। এই একটি ব্যাপারে সরিৎশেখর দারুণ কড়া। রাত হয়ে গেলে কি হবে অনি অনুমান করতে পারে।

আজ অবশ্য সেরকম কোন সমস্যা তার নেই। ছুটির পর বাড়ি এসে বেরুতে যাবে এমন সময় শচীন আর তপন এসে হাজির হল। শচীন ওদের ক্লাসের গোলগাল মার্কা ভাল ছেলে, ওর বাবার দুটো চা-বাগানে শেয়ার-আছে। শচীন তপনকে নিয়ে এসেছে অনিকে নেমন্তন্ন করতে। স্কুলে বললে হবে না বলে বাড়ি বয়ে এসেছে, তার দিদির বিয়ে।

ভেতরের বারান্দায় চেয়ার পাতা ছিল, সেখানে ওদের বসিয়ে অনি পিসীমাকে ডেকে আনল। দাদু বাড়িতে নেই, নিশ্চয়ই কিং সাহবের ঘাটে গিয়েছেন। অনির বন্ধুরা খুব কমই বাড়িতে আসে, পিসীমা তড়িঘড়ি দেখতে এলেন। আজকাল পিসীমা বাড়িতে শেমিজ পরেন না, কেমন যেন হয়ে গেছেন। কিছুতেই খেয়াল থাকে না।

হেমলতাকে দেখে অনির বন্ধুরা উঠে দাঁড়াল। ফুটফুটে দুটো ছেলেকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হেমলতা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'বসো বসো, দাঁড়াতে হবে না, তোমরা তো সব অনির বন্ধু? তা আমাদের বাড়িতে আসো না কেন? কি নাম তোমাদের?'

অনির খুব মজা লাগছিল, পিসীমা যখন কথা বলেন তখন যেন থামতে চান না। ওর বন্ধুরা বেশ হকচকিয়ে গেছে, কোন্ উত্তরটা দেবে বুঝতে পারছে না। অনি বলল, 'পিসীমা, এ হচ্ছে তপন, খুব ভাল গান গায় আর ও—'

অনিকে থামিয়ে হেমলতা বললেন, 'তপন কি?'

তপন এবার চটপট বলল, 'মিত্র।' বলে এগিয়ে এসে হেমলতাকে প্রণাম করল।

হেমলতা ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'বেঁচে থাক, বাবা। মিত্তির হল কুলীন কায়েত।'

অনি বলল, 'আর এ হচ্ছে আমাদের ক্লাসের গুড বয়। ওর দিদির বিয়েতে নেমন্তন্ন করতে এসেছে।'

হেমলতা বললেন, 'কি নাম তোমার, বাবা?'

'আমার নাম শচীন রায়।'

শচীন এগিয়ে গেল প্রণাম করতে। কিন্তু বেচারা নিচু হতে না হতেই হেমলতা ধড়মড় করে কয়েক পা পিছিয়ে গেলেন, 'না না, থাক থাক, প্রণাম করতে হবে না।' শচীন তো বটেই, অনিও খুব অবাক হয়ে গেল পিসীমার এ রকম ব্যবহারে। একটু সামলে নিয়ে বললেন, 'বামুনের ছেলে তুমি—।'

www.MurchOna.com

কথা শেষ করার আগেই অবাক গলায় শচীন বলল, 'না না, আমরা বৈদ্য।'

হেমলতা তাই শুনে দোনোমনা হয়ে বললেন, 'একই হল। বদ্দিরাও তো এক ধরনের বামুন। তোমরা সব বসে গল্প কর।' হেমলতা আর দাঁড়ালেন না। উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে আর একবার ওদের দেখে গেলেন।

শচীন বলর, 'তোর পিসীমা খুব সেকেলে, না রে?'

অনি বলল, 'কই, না তো?'

তপন বলল, 'যাঃ। আমি প্রণাম করলাম কিছু হল না। ও প্রণাম করতেই বামুন-টামুন বের করে ফেললেন।'

শচীন বলল, 'মিত্ররা তো কায়েত সবাই জানে। আগেকার লোকেরা বামুনদের শুধু সম্মান দিত। তোর পিসীমার কথা বাড়িতে গিয়ে বলতে হবে।'

তপন গম্ভীর গলায় বলল, 'স্বাধীনতা এলেও আমরা যে কত পরাধীন তা তোর পিসীমাকে দেখলে বোঝা যায় অনি।'

এসব কথা শুনতে অনির একদম ভাল লাগছিল না। পিসীমা এমন কাণ্ড করবেন ও ভাবতে পারেনি। বদ্যি না বামুন না জেনেই প্রণাম নিলেন না, বন্ধুদের কাছে ওই খবরটা ওরা নিশ্চয়ই ছড়িয়ে দেবে। খুব খারাপ লাগছিল ওর। এমন সময় রান্নাঘর থেকে হেমলতা চাপা গলায় তাকে ডাকলেন। হেমলতা এইভাবে তাকে ডাকেন না, অন্য সময় তাঁর চিৎকার শুনে সরিৎশেখর অবধি বিরক্ত হয়ে ধমক দেন, 'কি কাকের মত চেঁচাচ্ছ?'

চটপট হেমলতা জবাব দিতেন, 'কি করব, জন্মাবার সময় তো কেউ মধু দেননি।' তা এখনও এই ওকে ডাকছেন, ওঁকে মোটেই কর্কশ মনে হচ্ছে না। অনি উঠে রান্নাঘরে এল।

হেমলতা প্লেট সাজিয়ে বসেছিলেন। তিলের নাড়ু, নারকোলের নাড়ু আর মোটা পাকা কলা। হেমলতা বললেন, 'হ্যাঁরে, ও আবার এসব খাবে-টাবে তো! নাহলে বল দুটো লুচি ভেজে দিই!'

অনি বলল, 'কে খাবে না, কার কথা বলছ?'

হেমলতা বললেন, 'ঐ যে, ফরসা মতন—'

অনি বলল, 'দুজনেই তো ফরসা। তপন?'

হেমলতা দ্রুত ঘাড় নাড়লেন, 'না না, যে প্রণাম করতে আসছিল—।'

'ও, শচীনের কথা বলছ? তুমি কিন্তু ওকে প্রণাম না করতে দিয়ে খুব অন্যায় করেছ। আমার বন্ধুরা শুনলে ক্ষ্যাপাবে।' অনি সোজাসুজি বলে ফেলল।

হেমলতা বলে উঠলেন, 'না বাবা, প্রণাম করতে হবে না। তা ও কি খাবে এসব?'

'খাবে না কেন?' অনি দুটো প্লেট হাতে নিয়ে যেতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, 'একটাতে বেশী দিয়েছ কেন অত?'

হেমলতা হাসলেন, 'বেশী কোথায়? ওটা ওকে দিবি।'

অনি বলল, 'কেন? দুজনকেই সমান দাও। তপন কি দোষ করল? একেই প্রণাম নেবার সময় অমন করলে, খাবার সময় যদি তপনকে কম দাও তো ও ছেড়ে কথা বলবে?'

হেমলতা যেন অনিচ্ছায় দুটো প্লেটের খাবার সমান করতে চেষ্টা করলেন, 'হ্যাঁরে ছেলেটা খুব শান্ত, না রে?'

'কোন্ ছেলেটা?' অনির হঠাৎ মনে হল পিসীমাকে অন্য রকম লাগছে। এমন ভঙ্গিতে পিসীমাকে কথা বলতে ও কোনদিন দ্যাখেনি।

'ওই যে, বদিব্রাহ্মণ—।'

'ওঃ', অনি প্রায় খিঁচিয়ে উঠল, 'তুমি বার বার ওই যে ওই যে করছ কেন? শচীন নামটা বলতে পারছ না?'

হেমলতা কিছু বললেন না। অনি খাবার নিয়ে চলে গেলে একা রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে হঠাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। তার কোন ছবি নেই, মুখ মনে নেই, এই শরীরে কোন চিহ্ন সে এঁকে যেতে পারেনি, কারণ শরীরটা তখন তৈরি হয়নি। সে শুধু বেঁচে আছে হেমলতার কাছে একটা নাম হয়ে,

www.MurchOna.com

বুকের মধ্যে একটা নাম জপের মন্ত্রের মত অবিরত ঘুরে ফিরে আসে। সে-মানুষকে তিনি মনে করতে পারেন না, শুনেছেন বড় সুন্দর ছিল লোকটা, খুব ফরসা। তারপর এতদিন ধরে নামটাকে সম্বল করে কল্পনায় চেহারাটাকে তৈরি করে নিজের সঙ্গে খেলে খেলে যাওয়া। আজ এতদিন বাদে সেই নামের একটি মানুষকে তিনি প্রথম দেখলেন। ফর্সা সুন্দর চেহারার একটি কিশোর। হোক কিশোর, নামটা শুনে বুকের মধ্যে লোহার মুঠোয় কে দম টিপে ধরেছিল। এ নামের মানুষের কাছে কি করে তিনি প্রণাম নেবেন?

হেমলতা চুপচাপ একা একা কাঁদতে লাগলেন। যৌবনের শুরুতে যে মানুষটা তাঁকে কুমারী রেখে চলে গিয়েছিল স্বার্থপরের মত, আজ এতদিন পরে তার নামটার সঙ্গে মিলিয়ে একটি ছবি পেয়ে গিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

সরিৎশেখরের জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে তপন আর শচীন চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল, অনি যেন অবশ্যই যায়, ওর দাদুকে যেন অনি বলে যে ওরা এতক্ষণ বসে ছিল। জলপাইগুড়িতে তখন একটা অদ্ভুত নিয়ম চালু ছিল। কোন বিবাহ-অনুষ্ঠানে পত্র দিয়ে অথবা মুখে নিমন্ত্রণ করলেই চলবে না, অনুষ্ঠানের দিন ঘনিষ্ঠদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলে আসতে হবে। এ রকম অনেকবার হয়েছে, এই সামান্য ত্রুটির জন্য বিবাহ-অনুষ্ঠান ফাঁকা হয়ে গেছে, বাড়িতে বলা হয়নি বলে অনেকেই আসেননি।

শচীনরা চলে গেলে অনি চুপচাপ গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। এখন খেলার মাঠে গিয়ে কোন লাভ নেই। পিসীমা আজ ওরকম করছিলেন কেন? শচীনকে নাম ধরে ডাকছিলেন না পর্যন্ত। হঠাৎ ওর খেয়াল হল পিসীমার বরের নাম ছিল শচীন। দাদু একদিন সে-সব গল্প বলেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অনি ঘুরে দাঁড়াল। এখন ও বুঝতে পেরে গেছে কেন শচীনকে উনি প্রণাম করতে দেননি। ইদানীং ও পিসীমার সঙ্গে ঠাট্টাতামাশা করে, বয়স হয়ে যাবার জন্যে বোধ হয় পিসীমা ওকে প্রশ্রয় দেন। এরকম একটা ব্যাপার আবিষ্কার করে অনি এই নিয়ে একটু মজা করবে বলে হাঁটতে যেতেই পেছন থেকে একজন তাকে ডেকে উঠল। অনি ফিরে দেখল, ওদের পাড়ার একটি বড় ছেলে ওকে ডাকছে, 'এই খোকা, তোমার নাম অনি তো?'

অনি ঘাড় নাড়ল।

'তাড়াতাড়ি বাড়িতে খবর দাও, তোমার দাদুর অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।' ছেলেটি গেটের কাছে এসে দাঁড়াল।

দাদুর অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে? অনি হতভম্বের মত তাকাল। কি করতে হবে কি বলতে হবে বুঝতে পারছিল না। ছেলেটি আবার বলল, 'দাঁড়িয়ে থেকো না, যাও। খুব খারাপ কিছু না, পায়ে চোট লেগেছে বোধ হয়, ভয়ের কিছু নেই।'

দুর্ঘটনা ঘটে গেছে অথচ ভয়ের কিছু নেই—এ কথা লোকে চট করে বিশ্বাস করতে চায় না। তা ছাড়া প্রিয়জনের দুর্ঘটনা মানেই একটা মারাত্মক ব্যাপার হয়ে যায়। অনি যখন ছুটে গিয়ে হেমলতাকে চেঁচিয়ে এই খবরটা দিল তখনও হেমলতা তার স্বামীর ঘোরে আছেন, চোখে জল। খবরটা শুনে আচম্বিতে কি করবেন বুঝতে না পেরে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলেন। বাবার দুর্ঘটনা ঘটেছে, যে লোকটা একটু আগে সুস্থ শরীরে বেড়াতে গেল সে লোকটা এখন হাসপাতালে—একথা ভাবলেই বুকটা কেমন করে ওঠে। এই দীর্ঘ জীবনটা তাঁর বাবার সঙ্গে কেটেছে, বাবা ছাড়া তিনি কিছু ভাবতেই পারেন না। ফলে এই খবরটা ওঁর শরীর নিঙড়ে একটা ভয়ের কান্না বের করে আনল। স্বামীর কথা ভাবতে গিয়ে যে কান্নাটা বুকে ঘোরাফেরা করছিল এতক্ষণ, আশ্চর্যভাবে সেটা চেহারা পালটে ফেলল এখন। সেই কান্নাটা এখন হেমলতাকে যেন সাহায্য করল।

হাসপাতালে যেতে হবে। তাড়াতাড়ি বাড়ির ঘর-দোর বন্ধ করে তালা দিতে গিয়ে হেমলতা আবিষ্কার করলেন, বাড়িটা একদম খোলা পড়ে থাকছে। এত বড় বাড়িতে তালা দিয়ে এর আগে সবাই মিলে কোথাও যাওয়া হয়নি। হেমলতা দেখলেন বাগানের ভেতর দিয়ে কেউ এসে তালা ভেঙে যদি সব বের করে নিয়ে যায় তবে পাড়ার লোকে কেউ টের পাবে না। কিন্তু একটা বড় আতঙ্ক ছোট ভয়ের সম্ভাবনাকে চাপা দিতে পারে, হেমলতা ইষ্টনাম করতে করতে অনিকে নিয়ে বের হলেন।

www.MurchOna.com

অনি দেখল, পিসীমা থান-শেমিজের ওপর একটা সুতীর চাদর জড়িয়েছেন। এর আগে কখনও সে পিসীমার সঙ্গে রাস্তায় বের হয়নি। এখানে আসার পর পিসীমা কখনও বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন কিনা মনে পড়ে না। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। টাউন ক্লাব মাঠের পাশ দিয়ে যেতেই ওরা রিকশা পেয়ে গেল। হেমলতা তখন থেকে শুধু নাম জপ করে যাচ্ছেন। দাদুর পায়ে চোট লেগেছে, ভয়ের কিছু নেই, শোনার পরও কিন্তু অনি সহজ হতে পারছিল না। খারাপ খবর নাকি লোকে টপ করে দেয় না, সইয়ে সইয়ে দেয়। দাদু যদি মরে গিয়ে থাকে এতক্ষণে তাহলে ও কি করবে?

হাসপাতালে প্রথম ঢুকল অনি। পিসীমা পেছন পেছন। রিকশা থেকে নেমেই অনি দেখল পিসীমা মাথায় ঘোমটা দিয়েছেন। এ রকম বেশে ওঁকে দেখে অনির খুব হাসি পেলেও কিছু বলল না। তাড়াহুড়োয় পয়সাকড়ি আনা হয়নি বলে রিকশাওলাকে দাঁড় করিয়ে রাখা হল। ফিরে গিয়ে একেবারে ডবল পাবে। কড়া ওষুধের গন্ধ নাকে ধক করে আসতেই অনির মনে হল, হাসপাতালে থাকতে খুব কষ্ট হয়। অনুসন্ধান লেখা কাউন্টারটায় কেউ নেই। একটা শুঁটকো মত বেয়ারাগোছের লোক মেঝেতে বসে ছিল, অনিদের বোকার মত চাইতে দেখে বলল, 'কি খুঁজছ, বাবা?'

অনি বলবে কি বলবে না ভেবে বলে ফেলল, 'আমার দাদু কোথায় তাই জানতে এসেছি।'

লোকটা কেমন অথর্বের মত তাকাল, 'জানতে চাইলেই জানতে পারবে না। ছটার পর বাবুদের ডিউটি খতম।' হাত দিয়ে ফাঁকা চেয়ার দেখাল সে, 'কি কেস?'

অনি ঠিক বুঝতে পারল না প্রথমটা, 'মানে?'

'বাঁচবে না কষ্ট পাবে?' লোকটা উদাস গলায় জিজ্ঞাসা করল। অনিকে ঘুরে পিসীমার দিকে চাইতে দেখে লোকটা বুঝিয়ে দিল, 'চুকে গেলেই বেঁচে যাওয়া যায়, এখানে থাকলেই তো ভোগান্তি, কষ্ট। কিন্তু চাইলেই কি যাওয়া যায়? এই যে, দ্যাখো, আমি একেবারে খোদ যাবার দরজা—এই হাসপাতালে কাজ করছি আর প্রতিদিন চলে যাবার জন্য চেষ্টা করছি তবু সে শালা কি আমাকে টিকিট দেবে? তা কখন ভর্তি হয়েছে?'

'বিকেলে। অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে পায়ে।' অনি বলল।

'ও সেই রিকশা কেস? বাঁচার কোন আশা নেই, সে শালা দয়া করবে না, অনেক ভোগান্তি আছে। তা তিনি আছেন ওই সামনের হলুদ বাড়িতে। এসে অবধি ডাক্তার নার্সদের ধমকে বারোটা বাজিয়ে ছেড়েছেন। যাও, রিকশা কেস বললেই যে কেউ এখন বলে দিতে পারবে।'

লোকটা একফোঁটা নড়ল না।

তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে অনি বলল, 'বাঁচার আশা নেই বলল, না?'

হেমলতা বললেন, 'তার মানে ভগবান নিয়ে যাবে না, ওর কাছে মরে যাওয়া মানে বেঁচে যাওয়া যত বদ লোক!'

হেমলতা হাঁটছিলেন টিপটিপে পায়ে। হাসপাতালের বারান্দায় রুগীরা সার দিয়ে শুয়ে রয়েছে। রাজ্যের মানুষের ছোঁয়া লেগে যাওয়ায় তাঁর হাঁটাটা শ্লথ হচ্ছিল। দুবার তাগাদা দিয়ে অনি এগিয়ে গিয়েছিল হলুদ বাড়ির দরজায়। এখন ভিজিটিং আওয়ার্স শেষ হয়ে গেছে। দলে দলে মানুষজন হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। দরজায় একজন দারোয়ানগোছের লোক ওদের আটকালো। অনি ব্যাপারটা তাকে বললেও সে যেতে দিতে নারাজ, সময় চলে গেছে।

ততক্ষণে হেমলতা এসে পড়েছেন, শুনে খেঁকিয়ে উঠলেন, 'আমরা কি জেনে বসে আছি যে কখন ওঁর অ্যাক্সিডেন্ট হবে আর আমাদের সে খবর পেয়ে আসতে তোমাদের সময় চলে যাবে?'

দারোয়ান বলল, 'কখন অ্যাডমিট হয়েছে আপনার স্বামী?'

হেমলতা সব ভুলে চিৎকার করে উঠলেন, 'মুখপোড়া বলে কি! ওরে উনি আমার বাবা, স্বামীকে অনেক দিন আগে খেয়েছি।' অনির চট করে মনে পড়ে গেল, দাদু বলেন পিসীমা নাকি রাক্ষস গণ।

দারোয়ানটা একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'কি হয়েছিল?'

এবার অনি চটপট বলল, 'রিকশায় লেগেছে।'

সঙ্গে সঙ্গে দারোয়ানের চেহারা বদলে গেল, 'আরে বাপ, যান যান, বাঁ দিকে ঘুরে তিন নম্বর বেড।'

www.MurchOna.com

লোকটা এরকম ভয় পেল কেন বুঝতে পারল না অনি। পিসীমা তখনও গজগজ করছেন, 'এদের এখানে চাকরি দেয় কেন? মেয়ে বউ বুঝতে পারে না! যত বদ লোক।'

সরিৎশেখর বিছানার ওপর হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। তাঁর একটা পা মোটা ব্যাণ্ডেজ জড়ানো, টান টান করে রাখা। ওদের দেখে তিনিই কাছে ডাকলেন, 'এই যে, এদিকে এস। দ্যাখো কিভাবে এঁরা সব আছেন। এটা কি হাসপাতাল না শুয়োরের খাঁচা। ঘরময় নোংরা ছিল, আমি বলে কয়ে সরিয়েছি, নইলে তোমরা ঢুকতে পারতে না।'

হেমলতা বাবার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছে?'

সঙ্গে সঙ্গে গলা তুললেন সরিৎশেখর, 'স্বাধীন হয়ে সব উচ্ছন্নে গেছেন। আমি এখানে এসে এক ঘণ্টা পড়ে আছি, একটা ডাক্তার নেই যে এসে দেখবে! নার্কি তার ডিউটি ওভার, নতুন লোক আসেনি। ভাবতে পার? ইংরেজ আমলে এ সব জিনিস হলে হ্যাঙ্ আনটিল ডেথ হয়ে যেত। আমি কালই জহরলাল নেহেরুকে লিখব।'

সরিৎশেখরের পাশের বেডে শুয়ে থাকা একজন রুগী চিনচিনে গলায় বলে উঠলেন, 'আমাদের খাবার থেকে চুরি করে ওরা, কি জঘন্য খাবার!'

সরিৎশেখর হেমলতাকে বললেন, 'শুনলে? চুরি করা আমি বের করছি! আমি এখানকার দেখনবাহার নাইটিঙ্গেলদের বলেছি খাবারের চার্ট দেখাতে, একটা কিছু বিহিত করতে হবে। ওই যে আট নম্বরের বাচ্চাটা চল্লিশ মিনিট চেঁচিয়েও বেডপ্যান পায়নি, আমি এলে তবে দিল। হ্যাঁ মশাই, সিভিল সার্জেন কখন আসেন হাসপাতালে?'

পাশের লোকটি বলল, 'সকালে।'

হেমলতা এবার প্রায় অসহিষ্ণু গলায় বললেন, 'আপনার পায়ের অবস্থা কি রকম?'

'যন্ত্রণা হচ্ছে খুব।' এতক্ষণে মুখ বিকৃতি করলেন সরিৎশেখর, 'কাল সকালে বোধ হয় প্লাস্টার করবে। দুপুর নাগাদ বাড়ি গিয়ে ভাত খাব।'

'পারবেন?' হেমলতা যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

'পারব না কেন? আমার একটা পা তো ঠিক আছে।' হঠাৎ যেন তাঁর কথাটা মনে পড়ে যেতেই তিনি অনিকে কাছে ডাকলেন, 'শোন, তুমি কাল সকালের ফার্স্ট বাসে স্বর্গছেঁড়ায় চলে যাবে।'

অনি অবাক হয়ে বললে, 'কেন? আমার স্কুল যে খোলা!'

সরিৎশেখর বললেন, 'সারাজীবনে অনেক স্কুল খোলা পাবে। আমি যেতে পারছি না, তুমি অবশ্যই যাবে। তোমার বাবার খুব অসুখ।'

কিং সাহেবের ঘাটের চায়ের দোকানগুলো বোধ হয় দিনরাত খোলা থাকে। এই কাক-ভোরেও তাদের সামনে লোকের অভাব নেই। ভাতের হোটেল এখনও খোলেনি। সেগুলো ছাড়িয়ে সামান্য এগোতেই অনিকে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। একই সঙ্গে চার-পাঁচজন ট্যাক্সি-ড্রাইভারের স্যাঙাত এসে ওকে যেন কোলে করেই নিজের গাড়িতে তুলতে চাইছে। অনি অসহায়ের মত এপাশ-ওপাশ তাকাচ্ছিল। সামনে সার দিয়ে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। মন্টু এগুলোকে বলে মুড়ির টিন। থার্টি টু পার্টস অল আউট। পুরো গাড়িটাই নাকি ভাঙা-চোরা—সব কটা অংশ, কোনরকমে জোড়াতালি দিয়ে রাখা হয়েছে। হর্ন নেই, দরকারও হয় না। চলার সময় এক মাইল দূর থেকেই এদের গর্জন শুনতে পায়। অনি কোনদিন এই ট্যাক্সিতে চড়েনি। স্বর্গছেঁড়া থেকে আসবার সময় লরিতে চেপে জোড়া-নৌকায় পার হয়ে এসেছিল। অনেকদিন ওরা কিং সাহেবের ঘাটে এসে দেখেছে সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপিয়ে আগাপাশতলা যাত্রী বোঝাই করে ট্যাক্সিগুলো তিস্তার কাশবন চিরে ছুটে যায় বার্নিশের দিকে। বছরের যে কটা মাস চর শুকনো থাকে ট্যাক্সিগুলো প্রতাপ দেখিয়ে বেড়ায়। তাও পুরো চর নয়, বার্নিশের কাছে সিকি মাইল গভীর জলের ধারা আছে। সে অবধি গিয়ে আবার যাত্রী নিয়ে ফিরে আসে ট্যাক্সিগুলো। তারপর যখন বর্ষা বেশ জমে ওঠে, নদীর এপার-ওপার দেখা যায় না, ঢেউগুলো ক্ষ্যাপা গোখরোর মত ছোবল মারতে থাকে অবিরত, তখন ট্যাক্সিগুলো কোথায় যে হাওয়া হয়ে যায়! অনি দেখল সামনের একটা ট্যাক্সির দরজা খুলে গেল হঠাৎ। তারপর একজন বয়স্ক মানুষ চাপা গলায় ধমকে উঠলেন, 'কি হচ্ছে?'

www.MurchOna.com

সঙ্গে সঙ্গে অনি দেখল লোকগুলো বেশ থতমত হয়ে গেল। একজন চট করে বলে উঠল, 'কেন ঝামেলা করস, বাবু তখন থিকা বইস্যা আছেন, ইনারে পাইলেই গাড়ি খুলুম—আসেন কত্তা, আমাগো পিক্ষীরাজে বসেন, আমি ডেরাইভার সাহেবকে ডাইক্যা আনি।'

লোকটা ওকে যেন পথ দেখিয়ে খানিকটা দূর এগিয়ে এসে গাড়িটা চিনিয়ে দিল। অনি দেখল অন্যান্য গাড়ির তুলনায় এটা তবু ভদ্র চেহারার, মাথার ওপরের ত্রিপলটা আস্ত আছে। বয়স্ক ভদ্রলোক তখনও বিরক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। অনি দেখেই বুঝলো ইনি নিশ্চয়ই খুব বড়লোক, কারণ এঁরা ফিনফিনে ধুতি, গিলে করা পাঞ্জাবি আর ফরসা গোলগাল চেহারা থেকে একটা আভা বের হচ্ছিল।

ভদ্রলোক গম্ভীর গলায় বললেন, 'গাড়িতে উঠিয়ে ছাড়ার নাম নেই। তোমাদের প্যাসেঞ্জার না হওয়া অবধি বসে থাকতে হবে?'

কথাটার কোন জবাব দিল না কেউ। ভদ্রলোক এপাশ-ওপাশ তাকালেন। অনি দেখল যে লোকটা ওকে গাড়ি চিনিয়েছে সে একটা পাটকাঠির মত ফিনফিনে লোককে সঙ্গে নিয়ে এদিকে আসছে। অনি শুনতে পেল ভদ্রলোক তাকে ডাকছেন, 'এই খোকা, ওপারে যাবে তো? গাড়িতে উঠে বস। এবার না ছাড়লে দেখছি!' অনি গাড়িতে ওঠার আগের ফিনফিনে লোকটি দরজা খুলে ওকে সামনে বসতে বলল। ড্রাইভারের সিটে কোন গদি নেই। গোল গোল স্প্রিং-এর ওপর মোটা বস্তা পাতা রয়েছে। খুব চওড়া ফুটবোর্ডের ওপর পা রেখে নিচু হয়ে সিটে গিয়ে বসতেই মনে হল ওর পাছায় অজস্র পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে। ড্রাইভারের সঙ্গীটি তখন চেঁচাচ্ছে—'ফাস্টো টিপ—বার্নিশ, ফাস্টো টিপ—বার্নিশ!'

গাড়িতে ওঠার সময় অনি লক্ষ্য করেছিল ভদ্রলোক একা নেই। একজন মহিলা এবং একটি ছেলেকে এক পলকে নজর করেছিল সে। এখন গাড়িতে উঠে ও দেখল ওর সামনে আয়নাটা আস্ত আছে এবং ভদ্রলোকের পাশে ভীষণ ফরসা একজন মহিলা বসে আছেন লাল কাপড় পরে। মহিলার চোখে নতুন ধরনে চশমা যা অনি কোনদিন দেখেনি, জামাটার হাতা নেই। এ রকম জামা ছোট ঠাকুমা পরত। দাদুর তোলা ছোট ঠাকুমার একটা ছবি দেখেছিল সে, ঠিক এই রকম, তবে একটু ঢোলা। অনি উঠতেই তিনি চোখ কুঁচকে তাকে একবার দেখলেন, 'রাবিশ! এত করে বললাম গাড়ি বের কর, শুনলে না, এখন বোঝ।'

ভদ্রলোক বললেন, 'তিস্তার চরে প্রাইভেট গাড়ি চালালে বারোটা বেজে যাবে।'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'উঃ, চিরটাকাল পুতুপুতু করে কাটালে!'

ভদ্রলোক বললেন,'ছেলে শুনছে।'

'শুনুক! এখন তো শোনার বয়স হচ্ছে।'

ভদ্রমহিলার কথা শেষ হওয়া মাত্র হুড়মুড় করে চার পাঁচজন কাবলীওয়ালার একটা দল এসে পড়ল। ওদের দেখে অন্যান্য ট্যাক্সি-ড্রাইভাররা কিন্তু একদম চিৎকার করল না। ওরা বোধ হয় এই ট্যাক্সিতে প্যাসেঞ্জার দেখে সোজা এখানেই চলে এল। ড্রাইভারের সঙ্গী চেঁচিয়ে বলল, 'এক রুপিয়া খান সাব এক আদমি কো।'

একটা মোটা কাবুলীওয়ালা, যার ঘাড় মাথার অর্ধেক অবধি কামানো, ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, 'পাঁচ আদমী-চার রুপয়া।'

এই নিয়ে যখন ওদের মধ্যে কথা চলছে অনি শুনল ভদ্রমহিলা বললেন, 'এই গাড়িতে ওরা যাবে নাকি?' ভদ্রলোক জবাব না দিলেও অনি বুঝতে পারল, তিনিও ওদের যাওয়াটা পছন্দ করছেন না। ভদ্রমহিলা বললেন, 'তুমি ড্রাইভারকে বলো ওদের না নিতে।'

ভদ্রলোক বললেন, 'ও শুনবে কেন? আমরা তো পুরো ট্যাক্সি রিজার্ভ করিনি।'

এবার যেন মহিলা ধৈর্য রাখতে পারলেন না, 'তাই কর। আঃ! তুমি জানো না ওরা কি রকম। আজ অবধি কেউ কাবুলীওয়ালার বউ দ্যাখেনি, জানো?'

হঠাৎ ভদ্রলোকের গলার স্বর পালটে গেল, 'তাতে তোমার কি এসে গেল, তুমি তো আমার স্ত্রী।'

অনি দেখল ভদ্রমহিলার মুখ অসম্ভব লাল হয়ে গেছে। তাঁর একপাশে ওর বয়সী যে ছেলেটা চুপচাপ বসে আছে তার মুখটা অসম্ভব রকমের গোবেচারা। এ রকম লালটু গোলালু মার্কা ছেলে ওদের

www.MurchOna.com

দলে একটাও নেই। হঠাৎ ছেলেটা বলে উঠল, 'কাবুলীওয়ালারা খুব ভাল, না মা? আখরোট দেবে আমাদের?'

ভদ্রমহিলা খিঁচিয়ে উঠলেন, 'আঃ, তুমি চুপ কর। যেমন বাপ তেমনি ছেলে।'

ছেলেটি হতচকিত হয়ে বলল, 'হ্যাঁ মা, মিনিকে দিত, আমি পড়েছি।'

অনি ঠিক বুঝতে পারছিল না ছেলেটা কোন পড়ার কথা বলছে। তবে আন্দাজ করল ও কাবুলীদের নিয়ে কোন গল্প পড়েছে।

দর ঠিকঠাক হয়ে গেলে লোকগুলো যখন গাড়িতে উঠতে যাবে তখন অনি পিঠে একটা হাতের স্পর্শ পেল। ঘাড় ঘুরিয়ে সে দেখল, ভদ্রমহিলা অনেকটা ঝুঁকে প্রায় তার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলছেন, 'তুমি আমাদের এখানে এসে বসো তো ভাই, সামনের সিটটা ওদের ছেড়ে দাও।'

অনি কি করবে বুঝে না উঠতেই ভদ্রলোক গম্ভীর গলায় বললেন, 'চলে এসো পেছনে, কুইক।' ভদ্রলোক জানলা ছাড়বেন না, তাঁর কি সব দেখার আছে। গোলালু ছেলেটা প্রায় নাকে কেঁদে উঠল, সে ওপাশের জানলা থেকে সরবে না। অনি নেমে দাঁড়িয়েছিল। একটা ছোকরা কাবুলী ওর মাথায় আলতো করে টোকা মারল। তারপর ওরা চারজন ড্রাইভারের পাশে গিয়ে অদ্ভুত ভাষায় উঃ আঃ করতে করতে বসে পড়ল। শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোকে নেমে দাঁড়াতে অনি পেছনের সিটে বসতে পেল। ছোট্ট কাপড়ের ঝোলাটা কোলের ওপর রেখে মহিলার পাশে বসতেই অনির মনে হল অদ্ভুত এক ফুলের বাগানে সে ঢুকে পড়েছে। এতো রকম ফুলের গন্ধ একসঙ্গে নাকে আসছে যে দিশেহারা হয়ে যেতে হয়। মায়ের গা থেকে যে রকম গন্ধ বের হত এটা সেরকম নয়, মহিলার শরীর থেকে যে সৌরভ বের হচ্ছে তা মানুষকে যেন অবশ করে দেয়। সামনের সিটে বসে যে কেন গন্ধটা পায়নি বুঝতে পারছিল না অনি। কাবুলীরা উঠে বসেই প্রায় একই সঙ্গে ঘাড় ঘুরিয়ে ওদের দেখল। একজন কি একটা মন্তব্য করতেই সবাই ঠা-ঠা করে হেসে উঠল। অনি দেখল ভদ্রমহিলা এত হাতে ছেলেকে জড়িয়ে ধরেছেন, অন্য হাত তার পিঠের ওপর রাখা।

ড্রাইভারের সঙ্গী এবং অবশিষ্ট কাবুলীটা ফুটবোর্ডে উঠল। সঙ্গীটি ওঠার আগে হ্যাণ্ডেল নিয়ে কয়েক মিনিট প্রাণপণে ঘুরিয়ে ইঞ্জিন স্টার্ট করতে সেটা সফল হয়ে এল। ইঞ্জিন গর্জে উঠতেই গাড়িটা থরথর করে কাঁপতে লাগল। অনির মনে হতে লাগল মন্টুর কথা সত্যি, যে কোন সময় গাড়ির সব কটা অংশ খুলে পড়ে যেতে পারে। বিকট চিৎকার করে গাড়িটা চলতে শুরু করল এবার। ভেতরে বসে কানে তালা লাগার যোগাড়। অনি দেখল পেছনের সিটের গদি এখনও সবটা উঠে যায়নি।

দুপাশে বালি আর বালি, ইতস্তত কিছু কাশগাছ, গাড়িটা যত জোরে ছুটছে তার বহুগুণ বেশী শব্দ করছে। মাঝে মাঝে মরা নদীর খাঁজে কিছু জল জমে রয়েছে। অবলীলায় ট্যাক্সি সেটা পেরিয়ে এল। কাবুলীগুলো খুব মজা পেয়েছে, অনি শুনল, ওরা চিৎকার করে গান ধরেছে। অনির বসতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। মহিলা তাকে প্রায় চেপ্টে ফেলেছেন। ওঁর পেটের গমের মত রঙের চর্বি যত নরম হোক ওজনে দমবন্ধ করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। ভদ্রমহিলা বোধ হয় অনির পেছন দিক দিয়ে স্বামীকে চিমটি কেটেছিলেন, কারণ তিনি হঠাৎ উঃ করে স্ত্রীর দিকে তাকালেন। মহিলা কেমন হাসি-হাসি গলায় বললেন, 'কাবুলীওয়ালারাও গান গায়, শুনেছ আগে?

ভদ্রলোক বললেন, 'হুঁ। সেক্স এলে ওরা গান গায়।'

প্রায় আঁতকে উঠলেন মহিলা, 'সে কি!'

সঙ্গে সঙ্গে চাপা গলায় ভদ্রলোক বলে উঠলেন,, 'তোমার অবশ্য ভয়ের দিন অনেক আগে চলে গেছে। আয়নার মুখ দ্যাখো না তো!'

অনি দেখল মহিলা হঠাৎ চুপ করে গেলেন। ওঁর হাতটা নির্ভার হয়ে ওর পিঠের ওপর এলিয়ে পড়ে আছে। মুখ ঘুরিয়ে অনি দেখল একটা ঠোঁট চেপে ধরে তিনি ছেলের জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছেন। কেন হঠাৎ এমন হল সে বুঝতে পারছিল না। সেক্স মানে কি? এই শব্দটাই সব গোলমালের কারণ। মানে জিজ্ঞাসা করলে যদি ভদ্রলোক চটে যান? ও মনে মনে কয়েকবার আওড়ে শব্দটা মুখস্থ করে ফেলল। বাড়িতে ফিরে গিয়ে ডিক্সনারীতে এর মানেটা দেখতে হবে। আর এই সময় আর্তনাদ

www.MurchOna.com

করে গাড়িটা থেমে গেল। অনি দেখল চারধারে এখন মাথা অবধি কাশগাছের বন। একটা ডাহুক পাখি ডাকছে কোথাও। ড্রাইভারের স্যাঙাত লাফিয়ে নামল, 'হালারে টাইট দেবার লাগব।' বলে পাশ থেকে একটা কাশগাছের ডাঁটা ছিঁড়ে নিয়ে ইঞ্জিনের ঢাকনা খুলে ভেতরে কোথাও গুঁজে দিতেই আবার শব্দ করে গাড়িটা ডেকে উঠল। ব্যাপারটা এতটা আকস্মিক যে কাবুলীগুলো পর্যন্ত হাঁ হয়ে গেল। ভদ্রলোক চাপা গলায় বললেন, 'আমার গাড়ি হলে মেকানিক ডাকতে হত।'

নদীর ধারে এসে ট্যাক্সিটা দাঁড়াতেই কাবুলীগুলো আগে লাফিয়ে নামল। এপারে কোন দোকানপাট নেই। প্রায় রোজই ঘাট জায়গা বদলাচ্ছে, তাছাড়া পাহাড়ের বৃষ্টি হলেই শুকনো চরে আট-দশটা মেটো ধারা গর্জিয়ে এক হয়ে যাবে। ওপারে বার্নিশে! বার্নেশও বলে অনেকে। লোকজন দোকানপাটে জমজমাট। এই সাতসকালে সেখানে গঞ্জের ভিড়। সমস্ত ডুয়ার্স এবং সুদূর কুচবিহার থেকে বাসগুলো এসে ওই বার্নিশে বসে থাকে। তিস্তা পেরিয়ে জলপাইগুড়িতে আসার উপায় নেই। তাই বার্নিশের রবরবা এত। বার্নিশের নিচে মন্ডলঘাট, জলপাইগুড়িতে আসার সময় ওরা মঙ্গলঘাট দিয়ে এসেছিল।

গাড়ি থেকে অনি দেখল জোড়া-নৌকো একটাও নেই, ছোট ছোট নৌকো দুটো দাঁড়িয়ে আছে। পাড়ে ভিড় নেই একদম, একটা নৌকোয় গোটা আটেক লোক বসে আছে। তবে এই সিকি মাইল চওড়া তিস্তায় এখন প্রচন্ড ঢেউ, জলের রঙ লালচে। হঠাৎ দেখলে কেমন ভয়-ভয় করে। ড্রাইভারের সঙ্গী এসে তার কাছে টাকা চাইল। ও দেখল ভদ্রলোক মহিলা এবং গোলালুকে নিয়ে নৌকোর দিকে এগোচ্ছেন। টাকাটা দিয়ে ও চটপট এগোল। আসবার সময় পিসীমা তিনটে এক টাকার নোট তাকে দিয়েছেন, এক টাকা ট্যাক্সির ভাড়া, চার আনা নৌকোর ভাড়া, পাঁচসিকা বাসভাড়া আর আট আনায় দুটো রাজভোগ। একদম হিসেব করে দেওয়া টাকা। সকালবেলায় সাততাড়াতাড়ি না খেয়ে বেরোনো—তাই রাজভোগ বরাদ্দ।

ভদ্রলোক উঠে গেছেন নৌকোয়, উঠে ছেলেকে প্রায় কোলে করে টেনে তুলেছেন। অনিকে আসতে দেখে মহিলা বললেন, 'তোমার জন্য দাঁড়িয়ে আছি ভাই। একসঙ্গে এলাম তো, যাই কি করে!'

অত বড় মহিলা তাকে ভাই বলছেন, অনির কেমন অস্বস্তি হল। ও কি মাসীমা না বলে দিদি বলবে? ওঁরা নিশ্চয়ই খুব আধুনিক। বড়লোক হলেই বোধ হয় আধুনিক হয়। মন্টু বলে বিলেতে আমেরিকায় ছেলেমেয়েরা বাবা-মায়ের বন্ধু। ওঁদের চেয়ে আধুনিক কে আছে? মহিলা তো তাকে শুধু ভাই বললেন।

অনি দেখল ঢেউ-এর দোলায় নৌকোটা পাড়ের বালিতে ঘষা খেয়ে আবার হাতখানেক সরে যাচ্ছে। সে সময় তার ফাঁক দিয়ে লালচে জলের স্রোত দেখা যাচ্ছে। ভদ্রমহিলা বোধ হয় সেই দিকে চোখ পড়ার পর এগোতে পারছেন না। ওদিকে ভদ্রলোক কিন্তু উদাস চোখে বার্নিশের দিকে চেয়ে আছেন। নৌকোটা ছোট। দু'ধারে সরু তক্তা পাতা, যাত্রীরা সেখানে বসে আছে। মাঝখানে কাঠের বীমগুলো এখন ফাঁকা। গোলালু জুলজুল করে বাবার পাশে বসে মাকে দেখছিল। অনির একটু ভয়-ভয় করছিল। সে সাবধানে নৌকোতে উঠতেই সেটা সামান্য দুলে উঠল। প্রথমে মনে হয়েছিল বুঝি এবার ব্যালান্স থাকবে না কিন্তু সেটা চট করে ফিরে এল। সোজা হয়ে বেশীক্ষণ দাঁড়ানো যায় না। ও ঘুরে দেখল ভদ্রমহিলা ওর দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, 'বেশী দুলছে না তো?' অনি ঘাড় নেড়ে হাত ধরতেই ভদ্রমহিলা শরীরের সব ওজন নৌকোর ওপর অনিকে ভর করে ছেড়ে দিলেন। অনির মনে হল ওর দমবন্ধ হয়ে যাবে, ও উলটে জলে পড়ে যাবে। কিন্তু কিছুই হল না, সামলে নিয়ে ভদ্রমহিলা সেখানেই কাঠের ওপর বসে পড়ে অনিকে বললেন, 'বসো।' অনি বসতে বসতে শুনতে পেল মহিলা বলছেন, 'স্বার্থপর, জেলাস!' ঠিক বুঝতে না পেরে ওঁর দিকে তাকাতেই তিনি হেসে ফেললেন, 'না, না, তোমাকে নয় ভাই। এম্মা, তোমাকে কেন বলব! তুমি আমার কত উপকার করলে! কোথায় যাচ্ছ?'

'স্বর্গছেঁড়ায়!' অনি বলল।

'দারুণ রোমান্টিক নাম, না? আমরা যাচ্ছি ময়নাগুড়ি। আজই ফিরে আসব। জলপাইগুড়িতে থাক?' কাঁধে হাত রেখে পা নাচালেন মহিলা।

'হ্যাঁ।'

'এলে দেখা করো। আমরা থাকি বাবুপাড়ায়। বাড়ির নাম ড্রিমল্যান্ড। মনে থাকবে তো?'

অনি ঘাড় নাড়ল। 'ও কোন্ স্কুলে পড়ে?'

www.MurchOna.com

'কে? ও, প্রিন্স? কার্শিয়াং-এ পড়ে। ছুটিতে এসেছে। আমার একটা মেয়ে আছে, দারুণ সুন্দরী, আমার চেয়েও। ওই সঙ্গেই আমার মেলে বেশী। প্রিন্স ওর বাবার মতন, স্বার্থপর। ওহো, তোমার নাম কি? কোন্ স্কুলে পড়?' এত কথার পর মহিলার এবার যেন প্রশ্নটা মনে পড়ল। ঠিক সে সময় মাঝিরা এসে নৌকোয় উঠতে সেটা খুব জোরে দুলে উঠল। মহিলা ওকে এক হাতে জড়িয়ে ধরলেন। সেই রকম ফুলের বাগানে ঢুকে পড়ে অনি বলল, 'আমার নাম অনিমেষ, জেলা স্কুলে পড়ি।'

নৌকোটা ছেড়ে দিল। নৌকোর মুখে একটা মোটা লম্বা দড়ি বেঁধে কয়েকজন সেটাকে টানতে লাগল পাড় ধরে হাঁটতে হাঁটতে। সেই টানে নৌকো এগিয়ে যেতে লাগল ওপারের দিকে। অনি শুনতে পেল ভদ্রলোক গোলালুকে বলছেন, 'একে বলে গুণ টানা।' গোলালু বুঝল কিনা বোঝা গেল না। ও কেন জেলা স্কুলে না পড়ে কার্শিয়াং-এ পড়ে? সেখানে নিশ্চয়ই একা থাকতে হয়। ওর হঠাৎ গোলালুর জন্য কষ্ট হল। মা থেকেও ও মার কাছে থাকতে পারছে না। ঢেউ বাঁচিয়ে নৌকোটাকে অনেক দূরে নিয়ে এসে মাঝিরা লাফিয়ে তাতে উঠে বসল। সঙ্গে সঙ্গে ছপ-ছপ করে বৈঠা পড়তে লাগল জলে। বাঁধন খুলে যেতেই স্রোতের টানে সোঁ সোঁ করে নৌকো নদীর ভিতরে ঢুকে পড়ল।

বড় বড় ঢেউ দেখা যাচ্ছে মাঝ-নদীতে। এক একটা এত বড় যে তার আড়ালে বার্নিশ ঘাট পড়ে যাচ্ছে পলকের জন্য। হঠাৎ নৌকোর একধারে বসে থাকা রাজবংশীরা চিৎকার করে উঠল, 'তিস্তা বুড়িকি জয়!' সঙ্গে সেটা গর্জন করে ফিরে এল। মাঝিরা প্রাণপণে নৌকো ঠিক রাখার চেষ্টা করছে। চিৎকার করে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে ওরা। অনি দেখল বউ ঢেউয়ের কাছাকাছি নৌকো এসে যেতেই একটা দিক যেমন উঁচু হয়ে যাচ্ছে নৌকোর।

গোলালু ওর বাবাকে জড়িয়ে চোখ বন্ধ করে বসে আছে। ভদ্রলোক অন্য হাতে নৌকোর তক্তা শক্ত করে ধরে আছেন। ভদ্রমহিলা এই সকালে কুল কুল করে ঘামছেন। তাঁর মুখের রঙ কাদা হয়ে গড়িয়ে পড়ছে একধারে। সমস্ত শরীর দিয়ে যেন অনিকে জড়িয়ে ধরেছেন। ছিটকে ছিটকে জল আসছে নৌকোয়। কাবুলীগুলো পর্যন্ত নদীর চেহারা দেখে ভয়ে চুপচাপ হয়ে বসে গেছে।

এবার ঢেউটা পার হবে নৌকো। অনি দেখল স্রোতটা এখানে গর্তের মত নিচে নেমে গিয়ে হঠাৎ তুবড়ির মত ওপরে ফুঁসে উঠেছে। নৌকো সেই টানে নিচে নেমে যেতেই অদ্ভুত একটা ঝাঁকুনি লাগল। সেটা সামলে জলের টানে ওপরে উঠতেই একটু বেটাল হয়ে গেলে হুড়মুড় করে একরাশ জল নৌকোয় উঠে এল। আর তখনি অনি দেখল বেটাল নৌকোর একপাশে বসে থাকা একটা লোক টুপ করে জলে পড়ে গেল চুপচাপ। যেন ভেতরে ভেতরে কেউ কাজ করে যায়, নইলে সেই মুহূর্তে মহিলার বাঁধন খুলে অনি ঘুরে বসত না। আর বসতেই ও দেখল সেই শরীরটা ছুটন্ত জলের সঙ্গে পাক খেয়ে তার নিচ দিয়ে নৌকোর তলায় ঢুকে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ঝুঁকে পড়ে অনিমেষ তার পিঠের জামা চেপে ধরল মুঠোয়। জলের স্রোতে শরীরটার ওজন কমে গিয়েছে, তবু তাকে ধরে রাখা অনির পক্ষে অসম্ভব। পিঠের দিকে টান লাগায় শরীরটার নিচ দিক নৌকোর তলায় ঢুকে গেল আর লোকটা চট করে আধা উলটে গেল। অনি দেখল লোকটার সারা শরীর কাপড়ে মোড়া, বাঁচার স্বাদ পেয়ে একটা হাত ওপরে বাড়িয়ে দিয়েছে। এভাবে কতক্ষণ সে ধরে থাকতে পারে? মহিলা না থাকলে সে নিজে পড়ে যেত। মহিলা তার কোমর দু'হাতে ধরে রাখায় সে ব্যালেন্স রাখতে পেরেছে। এতক্ষণ নৌকোটা সেই বড় ঢেউ-এর জায়গাটা পেরিয়ে এসেছে। দুজন মাঝি দৌড়ে ছুটে এল অনিকে সাহায্য করতে। তারা এসে ঝুঁকে পড়ে লোকটাকে ধরতেই সে হাত বাড়িয়ে নৌকোর কাঠ ধরতে গেল। নাগাল পাচ্ছে না দেখে অনি হাতটা ধরে সাহায্য করতে যেতেই দেখল সে কোন রকমেই মুঠো করতে পারছে না। কারণ মুঠো করার জন্য আঙুলগুলোই তার নেই। এই জলে ভেজা হাতের যেখানে সে চেপে ধরেছিল সে জায়গাটা যেন কেমন কেমন লাগছে। আর এই সময় চিৎকারটা শুনতে পেল অনি। কানের কাছে মহিলা প্রচন্ড আর্তনাদ করে তার কোমর ছেড়ে দিলেন। দিয়ে আলুথালু হয়ে দৌড়ে স্বামীর পাশে গিয়ে বসলেন।

যেহেতু এখন নৌকো দুলছে না, অনি সোজা হয়ে একা দাঁড়াতে পারল। ততক্ষণে নৌকোটা পাড়ের কাছে এসে গেছে এবং এই মাঝি দুটো লোকটাকে টেনে অনিরা যেখানে বসেছিল সেখানে তুলেছে। অনি দেখল মৃতপ্রায় একটা মানুষ নৌকোর কাঠের ওপর এলিয়ে পড়ে আছে। মুখভর্তি দাড়ি,

www.MurchOna.com

দাঁত নেই, হাঁ করে বুক কাঁপিয়ে নিশ্বাস নিচ্ছে। অনি দেখল লোকটার নাক নেই, কানের অর্ধেকটা খসা, চুলের জায়গায় ছোপ ছোপ দাগ। পুরো মুখটা ঢেকে বসেছিল সে নৌকোয়। আর এতক্ষণ পরে অনি টের পেল ওর শরীর থেকে অদ্ভুত একটা পচা গন্ধ বের হচ্ছে। কেমন একটা গা-ঘিনঘিনে ভাব সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ল এবার। অনি নিজের হাতের দিকে তাকাল। তারপর ঝুঁকে তিস্তার জলে হাত ধুয়ে নিল। আর এই সময় একটা মাঝি ওকে বলে উঠল, 'পুণ্য করলেন না ভাই, আপনার পাপই হইল।' কথাটার মানে বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে তার দিকে তাকাতেই সে বলল, 'এ তো মানুষ নয়, জন্তুর অধম। মইরা গেলেই এ শান্তি পাইত, তিস্তা বুড়ীর কোল থিকা ছিনাইয়া আইন্যা কি লাভ হইল!'

অনি এত অবাক হয়ে গিয়েছিল যে ওর জামাকাপড়ের অনেকটা যে জলে ভিজে গেছে টের পেল না, 'কিন্তু ও মরে যেত যে!'

মাঝিরা হাসল, 'হক কথা। কিন্তু বাঁইচ্যা যাইত।'

ঠিক তখন কাল সন্ধ্যেবেলায় হাসপাতালের সেই লোকটার মুখ মনে পড়ল। এই পৃথিবী থেকে চলে যাওয়া মানে বেঁচে যাওয়া—লোকটা বলেছিল। এখন এই মাঝিও প্রায় সেই কথাই বলছে। নিজের মায়ের কথা ভাবল অনি, মা কি বেঁচে গেছে? তাকে ফেলে রেখে মা কি শান্তিতে আছে? মানুষের মনে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে না বুঝতে পারছিল না অনি। হঠাৎ ওর মনে হল হাসপাতালের সেই লোকটা অথবা খসে-যাওয়া-শরীরে লোকটা বোধ হয় একই রকমের।

পাড়ে নৌকো এসে ভিড়তেই খবরটা ছড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে একটা ভিড় জমে গেল নৌকোটার সামনে। সবাই একে একে পয়সা দিয়ে নেমে গেলে অনি মাঝিটাকে পয়সা দিতে গেল। সে ঘাড় নেড়ে বলল, 'না, আপনের ভাড়া লাগব না।'

পাড়ে দাঁড়িয়ে দুলন্ত নৌকোয় দাঁড়ানো মাঝিকে সে বলল, 'কেন!'

মাঝি হাসল, 'আপনি যা করছেন তা ক'জনা করে!'

কিছুতেই পয়সা নিল না সে। অনেকগুলো বিস্মিত মুখের সামনে দিয়ে অনি ওপরে উঠে এল। সার সার বাস দাঁড়িয়ে। জায়গাগুলোর নাম মাথার ওপর লেখা—লঙ্কাপাড়া—আলিপুরদুয়ার—কুচবিহার—নাথুয়া ফালাকাটা। এইসব চেনা বাসগুলোকে দেখতে পেয়ে ওর খুব খিদে পেয়ে গেল। খাবারের দোকান খুঁজতে গিয়েও দেখল ভদ্রলোক, মহিলা আর গোলালু একটি মিষ্টির দোকানে বসে আছেন। হাসিমুখে ওঁদের কাছে যেতেই অনি দেখল মহিলার মুখ কালো হয়ে গেল। একটা চেয়ার খালি ছিল, অনি সেটা ধরতেই তিনি চিৎকার করে উঠলেন, 'বসো না, বসো না, খবরদার, ছোঁয়া লেগে যাবে।' হাঁ হয়ে গেল অনি। মহিলা স্বামীকে বললেন, 'ওকে এখান থেকে যেতে বলে দাও। সংক্রামক রোগ, অলরেডি ওর ভেতরে এসে গিয়েছে কিনা কে জানে।'

ভদ্রমহিলার দিকে আড়চোখে দেখে নিয়ে ওঁর স্বামী অনিকে বললেন, 'তুমি বরং কার্বলিক সোপ দিয়ে হাতটা ধুয়ে নিও। হিরোর ডেফিনেশন সব মানুষের কাছে সমান নয় ভাই। উইশ ইউ গুড লাক।'

ভীষণ কান্না পেয়ে গেল অনির। কোনরকমে দ্রুত দোকান থেকে বেরিয়ে এল সে। খাবার ইচ্ছেটা এখন একদম চলে গেছে। এসব রোগ কি সংক্রামক? তার ভেতরে কি চলে আসতে পারে? এখানে কার্বলিক সোপ সে কোথায় পাবে। চারদিকে তাকিয়ে হঠাৎ নাকের কাছে হাতটা নিয়ে এল সে। না তো, কোন গন্ধ নেই। এই সময় সামনের বাসে হর্ন বেজে উঠতে সে দেখল তার ওপর আলিপুরদুয়ার লেখা, বাসটা এখনই ছাড়বে। স্বর্গছেঁড়ার ওপর দিয়ে একে যেতে হবে।

প্রায় অন্ধের মতন সে বাসে উঠে বসল। এখান থেকে মিষ্টির দোকানটা দেখা যাচ্ছে। জানলার পাশের সিটে বসে অনি দেখল ওদের টেবিলে বড় বড় রাজভোগ এসে গিয়েছে। আজ অবধি কেউ তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করেনি। সে কি জানতো লোকটার খারাপ অসুখ আছে? একটা মানুষ ডুবে যাচ্ছে দেখে তার বুকের মধ্যে এমন একটা ব্যাপার হল যে সে ঠিক থাকতে পারেনি। হঠাৎ ওর মনে পড়ল, মাঝিগুলো তো নির্দ্বিধায় লোকটাকে টেনে তুলেছিল। ওরা কি কার্বলিক সোপে হাত ধোবে? ওদের মনে যদি কোন চিন্তা না এসে থাকে সে এত ভাবছে কেন? মহিলা নিশ্চয়ই ভুল বুঝেছেন অথবা তিনি মোটেই আধুনিক নন। সংস্কার না থাকার নামই নাকি আধুনিক হওয়া, আমেরিকানদের মত—মন্টু প্রায়ই বলে। ওর মনে পড়ল মাঝি ওকে বলেছে আপনি যা করেছেন তা ক'জনে পারে? অদ্ভুত একটা শান্তি একটু একটু করে ফিরে আসছিল অনির।

www.MurchOna.com

এই সময় ড্রাইভার গাড়ি ছাড়ল দুবার হর্ন বাজিয়ে! সামান্য লোক হয়েছে গাড়িতে। কন্ডাক্টর দরজা বন্ধ করে চেঁচাল, 'ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি, স্বর্গছেঁড়া, বীরপাড়া—আলিপুরদুয়ার।' আর বাসটা এবার নড়তেই হঠাৎ অনি লক্ষ্য করল কি একটা ছুটে আসছে তার দিকে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই সেই কালো মতন জিনিসটা চটাং করে এসে লাগল জানলার ওপরে। একটা কাদার তাল ঝুলে থাকল জানলায়। একটু নিচু হলেই সেটা গলে অনির মুখে এসে লাগত। বিস্মিত, হতভম্ব অনি সমস্ত শরীরে কাঁপুনি নিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল একটা লোক ওকে দেখে চেঁচাচ্ছে, 'কেন বাঁচালি, মরতে চেয়েছিলাম তো তোর বাপের কি, শালা! কেন বাঁচালি?' সেই আধখানা শরীরটা নৌকোর ওপর থেকে এসে ভেজা কাপড়ে হিংস্র হয়ে লাফাচ্ছে আর নাকিস্বরে অনির দিকে তাকিয়ে একই কথা বলে যাচ্ছে। ও কি করে টের পেল যে অনি বাঁচিয়েছে? নিশ্চয়ই কেউ বলে দিয়েছে। অনির বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল, চোখের সামনে জলের আড়াল। ও তাড়াতাড়ি কাচের জানলাটা বন্ধ করে দিল। ঝাপসা হয়ে গেলে সব মানুষকে সমান দেখায়।

বাবার অসুখের খবর পেয়ে জোর করে দাদু তাকে পাঠালেন কিন্তু ধূপগুড়ি না পেরোনো পর্যন্ত সেকথা খুব একটা মনে পড়েনি অনির। ডুডুয়া নদী ছাড়িয়ে রাস্তাটা বাঁক নিতে সেই স্বর্গছেঁড়া চা-বাগানের গাছগুলো চোখে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে একটা উত্তেজনা হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল। কদিন বাদে সে আবার এইসব গাছগাছালি, ডানদিকের মদেসিয়া কুলিদের ঘরবাড়ি দেখতে পাচ্ছে। মুখ বাড়িয়ে একটাও পরিচিত মুখ দেখল না ও। যদিও স্বর্গছেঁড়া বাজার এখান থেকে মাইল দুয়েক, তবু কেউ কেউ তো এদিকে আসতেও পারে। তারপর সেই বিরাট শালের মাঝখানে কাজ-করা ফুলের মত চা-বাগানের মধ্যিখানে মাথা তোলা ফ্যাক্টরী-বাড়িটা চোখে পড়ল তক্ষুনি ও বুকটা কেঁপে উঠল। বাবার খুব অসুখ, ওই ফ্যাক্টরীতে বাবা নিশ্চয়ই কাজ করতে যেতে পারছেন না। চা-বাগানের শেষে বাঁ দিকে বাবুদের কোয়ার্টার, দু'দুটো চাঁপা গাছ বুকে নিয়ে বিরাট খেলার মাঠ চুপচাপ পড়ে আছে। অনি চিৎকার করে বাস থামাল।

মাটিতে নামতেই ইউক্যালিপটাস গাছের শরীর-ছোঁয়া বাতাসটাকে নাক ভরে টেনে নিয়েও চারপাশে তাকাল। কোয়ার্টারগুলোর দরজা বন্ধ। রাস্তার এপাশে মাড়োয়ারীদের দোকানের সামনে একজন পশ্চিমাগোছের লোক উবু হয়ে বসে তাকে দেখছে। চোখোচোখি হতে দাঁত বের করে হাসল, অনি তাকে চিনতে পারল না। বাড়ির সামনে পাতাবাহারের যে সার দেওয়া গাছগুলো ছিল সেগুলো যেন শুকিয়ে এসেছে। ক্লাবঘর তালাবন্ধ, অনি বারান্দায় উঠে এসে দরজার কড়া নাড়ল।

ডানদিকের খিড়কি দরজা খুলে বাগান দিয়ে বাড়ির ভেতরে যাওয়া যায়, কিন্তু হঠাৎ এই সদরের বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ওর মনটা কেমন হয়ে গেল। এখন এ বাড়িতে মা নেই। এই বারান্দা, এ বাড়ির ঘর উঠোন যে কোন জায়গায় ও মাকে কল্পনা করতে পারে। মা মারা গেছেন জেনেও মাঝে মাঝে নিজের সঙ্গে খেলা করে ভাবত মা স্বর্গছেঁড়ায় আছেন, গেলেই দেখা হবে। এখন এই সত্যটার সামনাসামনি দাঁড়িয়ে অদ্ভুত কষ্ট হচ্ছিল ওর। মায়ের কথা ভাবতে ভাবতে বাবাকে মনে পড়ে যেতে শক্ত হয়ে দাঁড়াল অনি। বাবার কি হয়েছে? দাদু কেন জোর করে ওকে স্বর্গছেঁড়ায় পাঠালেন? হঠাৎ অনি কুঁই কুঁই শব্দ পেয়ে পেছন ফিরে তাকাতেই দেখতে পেল একটা কালো রঙের ঘেয়ো নেড়ি কুকুর চার পা মুড়ে মাটিতে বসে ওর দিকে কেমন আদুরে চোখে তাকিয়ে শব্দ করছে। কুকুরটাকে চিনতে পারল ও, মা এঁটো ভাত দিতেন, কালু বলে ডাকতেন, আর একদম পছন্দ করতেন না পিসীমা কুকুরটাকে। আশ্চর্য, ও কি করে অনিকে চিনতে পারল! আর একবার কড়া নাড়তেই ভেতরে খিল খোলার শব্দ হল। দরজার কপাট খুলে যেতে অনি দেখল ছোট মা দাঁড়িয়ে আছে।

'ওমা, তুমি! কি চমকে দিয়েছ, আমি ভাবলাম কে না কে? সত্যিই অবাক হয়ে গেছে ছোট মা, হাত বাড়িয়ে অনির ব্যাগটা নিয়ে কাছাকাছি হতেই আবার বলল, 'আরে, তুমি যে দেখছি আমাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছ মাথায়!'

অনি এখন চট করে কথা বলতে পারছিল না। অনেকদিন ছোট মা জলপাইগুড়ি যায়নি। মহীতোষ একা গেছেন মাস কয়েক আগে। কিন্তু একটা মানুষের চেহারা যে এই সামান্য কয়েক মাসের ব্যবধানে এত খারাপ হতে পারে ছোট মাকে না দেখলে বোঝা যাবে না। কি রোগা হয়ে গেছে শরীরটা! দেখে মনে হয় ছোট মারই খুব কঠিন অসুখ হয়েছে। কিন্তু গলার ওপর অতখানি কাটা দাগ কেন? অনি সেদিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি পড়ে গিয়েছিলে?'

www.MurchOna.com

'না তো!' বলেই ছোট মা প্রশ্নটা বুঝতে পারল, ও হ্যাঁ, খোঁচা লেগেছিল একবার। তা তুমি হঠাৎ করে এলে যে, স্কুল কি ছুটি?'

'না, ছুটি না। দাদু জোর করে পাঠালেন, বাবার নাকি খুব অসুখ, কি হয়েছে?' অনি ছোট মার পেছনে পেছনে ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

ওদের বাইরের ঘরটা সেইরকমই রয়ে গেছে। এমন কি দু'দুটো সোফার ওপরে যে কভার ছিল সেগুলো অবধি একই রকম আছে, ছিঁড়ে যায় নি। ছোট মা বলল, 'অসুখ মানে? বাবাকে কে খবর দিল?' ছোট মা ঘুরে ওর দিকে তাকাল।

'জানি না। কাল বোধ হয় কেউ দাদুকে বলেছে। কিন্তু বাড়ি আসার সময় একটা রিকশার সঙ্গে অ্যাক্সিডেন্টে দাদুর পা ভেঙে গেছে, আজ প্লাস্টার করে হাসপাতাল থেকে আসবে।' অনি খবরটা দিল।

'ও মা! কি করে হল? এখন কেমন আছেন?'

'ভাল।'

'কিন্তু ওঁর এই অবস্থায় তুমি চলে এলে কেন!'

'কি করব! দাদু যে জোর করে আমাকে পাঠালেন, কোন কথা শুনতে চাইলেন না। বাবা কোন ঘরে? এখন কেমন আছেন?'

খুব আস্তে ছোট মা বললেন, 'এখন ভাল আছেন, ফ্যাক্টরীতে গিয়েছেন।'

অবাক হয়ে গেল অনি, 'সে কি!' তাহলে কাল যে দাদু খবর পেলেন বাবা খুব অসুস্থ। দাদু লোকের কথায় চট করে বিশ্বাস করেন।' অনির মনে হয় ছোট মা খুব কষ্ট করে হাসতে চেষ্টা করল।

মাঝের ঘরে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল অনি। কোন জানলা খোলা নেই, যাওয়া-আসার দরজায় ভারী পর্দা ঝোলানো। প্রায়ান্ধকার ঘরের এককোণায় টেবিলের ওপর প্রদীপ জ্বলছে। সেই প্রদীপের আলোয় অনি দেখতে পেল মাধুরী খুব গম্ভীর মুখে তাকিয়ে আছেন। বেশ বড় ফ্রেমের চৌহদ্দিতে মাধুরীর একটা অচেনা ছবি এনলার্জড করে ধরে রাখা হয়েছে। যেহেতু ঘরের ভেতর আলো আসার রাস্তা নেই তাই ছবির ওপর পড়া প্রদীপের আলোটা অদ্ভুতভাবে চোখ কেড়ে নেয়। অনির মনে হল মাকে যেন দেব-দেবীর মত লাগছে, এ-বাড়ির সবাই এখানে এসে পূজা করে যায়। কিন্তু এই বন্ধ ঘরে কিছুক্ষণ থাকলে দম বন্ধ হয়ে যাবে। একটা চাপা অস্বস্তি সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। মুখ ঘুরিয়ে ছোট মার দিকে তাকাতেই দেখল ছোট মা এক দৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। খুব দ্রুত অনি বলল, 'জানলা বন্ধ করে রেখেছ কেন, খুলে দাও।'

সঙ্গে সঙ্গে ছোট মা চমকে উঠল, 'না, না! এ ঘরের জানলা খোলা বারণ। চল, ভেতরে যাই।' ছোট মা আর দাঁড়াল না। অনি দেখল ঘরের ভেতর ঠিক ছবির সামনে একটা খাট পাতা। ঘরটা থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে ছবিটার দিকে আর একবার তাকিয়ে ওর মনে হল মা যখন খুব গম্ভীর হয়ে যেতেন অথবা কোন কারণে যখন মায়ের মন খারাপ হয়ে যেত তখন এইরকম দেখাত।

ভেতরের ঘরে যেখানে অনিরা শুতো সেখানে একটা ছোট খাট আর তার চারপাশের কাপড়চোপড় দেখে বুঝতে অসুবিধে হল না যে এটা ছোট মার ঘর, ছোট মা একাই শোয় এখানে।

ছোট মা বলল, 'আগে একটু জিরিয়ে নাও, আমি তোমার জন্য খাবার করি।'

অনি বলল, 'ঝাড়িকাকু কোথায়?'

ছোট মা যেন সামান্য ভ্রুকুটি করল, 'তুমি জান না?'

অনি ঘাড় নাড়ল। ছোট মা মুখ নিচু করে বলল, 'তোমার বাবার সঙ্গে তর্ক করেছিল বলে উনি তাড়িয়ে দিয়েছেন। তা আমার অসুবিধে হচ্ছে না কিছু, একা মানুষ সারাদিন বসে থাকতাম, এখন কাজ করতে করতে বেশ দিনটা কেটে যায়।' ছোট মা উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলে অনির মনে হল ও যেন একদম অচেনা কোন পরিবেশে চলে এসেছে।

জুতো খুলে খালি পায়ে অনি উঠোনে এসে দাঁড়াল। ঝাড়িকাকুকে বাবা ছাড়িয়ে দিয়েছেন? পিসীমা বলতেন, ঝাড়িকাকু এ বাড়িতে এসে বাবাকে কোলেপিঠে করেছেন, কাকুকে তো মানুষ করেছেন বলা যায়। ইদানীং অনির মনে হত ও সবকিছু বুঝতে পারে, ও অনেক বড় হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এখন এই কাঁঠালগাছ আর তালগাছের দিকে তাকিয়ে ও কিছুতেই বুঝতে পারল না যে বাবা কি করে ঝাড়িকাকুকে ছাড়িয়ে দেন।

www.MurchOna.com

বাড়ির ভেতর যে বাগানটা ছিল সেটা অপরিষ্কার হয়ে আছে। অনি তারের দরজা ঠেলে পেছনে এল। গোয়ালঘরের আশেপাশে বেশ জঙ্গল হয়ে গিয়েছে। সেদিকে এগোতেই খুব দ্রুত হাম্বা হাম্বা ডাক শুনতে পেল অনি। গলাটা-ধরা-ধরা, কিন্তু অনি চিনতে পারল। কাছাকাছি হতে ও একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেল। গোয়ালঘরের কাছে বিচুলির স্তূপের পাশে কালীগাইকে বেঁধে রাখা হয়েছিল। অনিকে দেখে সে সমস্ত শক্তি দিয়ে দড়ি ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। এখন ওর অনেক বয়স, শরীর হাড়জিরজিরে হয়ে গেছে, ফলে বেচারার গলায় দড়ির চাপ লাগায় চোখ বড় বড় হয়ে যাচ্ছে। অনি দৌড়ে ওর পাশে যেতে গরুটা একদম স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপর খুব অভিমানী মেয়ের মত মাথা নিচু করে ফোঁস ফোঁস শব্দ করতে লাগল। অনি ঘাড়ে হাত রাখতেই কালী ওর লম্বা গলাটা চট করে তুলে যেন অনিকে জড়িয়ে ধরতে কোমরের কাছে ঘষতে লাগল। সেই ফোঁস ফোঁস শব্দটা সমানে চলছে। অনি শব্দটার মানে বুঝতে পারছিল। বেচারার প্রচুর বয়স হয়েছে। এখন নিশ্চয়ই আর দুধ দেয় না। মা ওকে এইটুকুনি কিনে এনেছিল। তারপর ওর নাতিপুতি বিরাট বংশে গোয়ালঘর ভর্তি হয়ে গেল। হঠাৎ অনির খেয়াল হল, আর কোন গরুকে দেখতে পাচ্ছে না তো! কালীর আদরের চোটে যখন অস্থির তখন অনি ছোট মার গলা শুনতে পেল, 'তোমাকে দেখে ওর খুব আনন্দ হয়েছে, না?'

অনি দেখল ছোট মা তারের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। কালী ওকে সরতে দিচ্ছে না, ওর গলায় হাত বোলাতে বোলাতে অনি বলল, 'আর গরুগুলো কোথায়?'

ছোট মা বলল, 'ঝাড়ি চলে যাওয়ার পর তোমার বাবা রাগ করে সবকটাকে বিক্রি করে দিলেন।'

অনি অবাক হয়ে বলল, 'বিক্রী করে দিলেন?'

ছোট মা হাসলো, 'দিদি খুব যত্ন করত, আমি পারি না, তাই। ঝাড়ি থাকতে ওই করত সব। তা যেদিন সবগুলোকে নিয়ে হাটে চলে যাবে সেদিন এই গরুটার কি কান্না। ঠিক বুঝতে পেরেছিল এ বাড়ি থেকে চলে যেতে হবে। এখন তো আর দুধ দেয় না বেচারা, গায়ে জোরও নেই যে চাষ করবে, বোধ হয় কেটেই ফেলত ওকে। এমনভাবে কাঁদতে কাঁদতে আমার দিকে তাকাল যে আমি পারলাম না। তোমার বাবাকে অনেক বলেকয়ে ওকে রেখে দিলাম। বেশী দিন আর বাঁচবে না।'

হঠাৎ অনি আবিষ্কার করল কালীগাই-এর গলায় আদর করতে করতে কখন ওর দুই চোখ ঝাপসা হয়ে গেছে। ছোট মা সেই সময় ডাকল, 'এসো, হাতমুখ ধুয়ে জলখাবার খেয়ে নাও। সেই কোন সাতসকালে বেরিয়েছ!'

ছোট মার হাতের রান্না ভাল, তরকারিটা খেতে খেতে অনির মনে হল। একটু ঝাল ঝাল, কিন্তু বেশ সুস্বাদু। লুচি ওর খুব প্রিয় জিনিস, ফুলকো হলে কথাই নেই। ঠিক এই সময় অনি শুনতে পেল বাইরের ঘরের দরজায় কে যেন খুব জোরে জোরে শব্দ করছে। খেতে খেতে ও উঠতে যাবে, ছোট মা রান্নাঘর থেকে ছুটে এল, 'তুমি খাও, আমি দেখছি।'

ভেতরের বারান্দায় জলখাবার খাবার চল এ বাড়িতে এখনও আছে। টুলমোড়াগুলো পাল্টায়নি। খেতে খেতে অনি পিসীমার ঘরটার দিকে তাকাল, দরজা খোলা, ওটা বোধ হয় গুদামঘর করা হয়েছে। ঘরটার ওপরে পেয়ারা গাছটা তার সব ডালপালা যেন নামিয়ে দিয়েছে, বেশ ডাঁশা ডাঁশা পেয়ারা হয়েছে গাছটায়। এই সময় বাইরের ঘরে বেশ জোরে একটা ধমক শুনতে পেল অনি, 'কোথায় আড্ডা মারা হচ্ছিল, অ্যাঁ? আধঘণ্টা ধরে ডাকছি, দরজা খোলার নাম নেই?' ছোট মা বোধ হয় কিছু বলতেই চিৎকারটা জোরদার হল, 'কেন আস্তে বলব কেন? বিয়ের সময় তোমার বাপ তো বলে দেয়নি তোমার কান খারাপ।'

খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল, অনি উঠে দাঁড়াল। গলাটা নিচে নেমে আসতে ও স্পষ্ট চিনতে পারল। আর চিনতে পেরেই হতভম্ব হয়ে গেল। মহীতোষকে এ গলায় কোনদিন কথা বলতে শোনেনি অনি। আজ অবধি বাবাকে কারো সঙ্গে ঝগড়া করতে দ্যাখেনি পর্যন্ত। মায়ের সঙ্গে যখন ঠাট্টা করতেন তখন বাবার গজদাঁত দেখা যেত। ও কিছুতেই মেলাতে পারছিল না। এমন কি বাবা যখন জলপাইগুড়ি যান তখনও তো এ ধরনের কথা বলেন না। মেয়েদের এ বাড়িতে কেউ বকেছে এমন গলায়, মনে করতে পারছিল না অনি। তাছাড়া, ওর যে জন্য আসা, বাবার এই গলা শুনে কিছুতেই মনে হচ্ছে না যে তাঁর অসুখ করেছে।

www.MurchOna.com

'ধূপ জ্বলছে না কেন, ধূপ?' আবার চিৎকার ভেসে এলো, এবার কাছে। বোধ হয় বাবা এখন মাঝের ঘরে চলে এসেছেন। তবে স্বরটা কেমন কাঁপা-কাঁপা, সুস্থ নয়।

ছোট মার গলা শুনতে পেল ও, 'নিবে গেছে।'

'অ্যাই!' গর্জনটা অদ্ভুতভাবে গোঙাল যেন, 'সারাদিন খ্যাটন মারছ, একটা কাজ বললে পাওয়া যাবে না, না?'

'আঃ! আস্তে কথা বল।' ছোট মা যেন ধমকে উঠলেন।

'ও বাবা, আবার গলায় তেজ হয়েছে দেখছি। ঝেড়ে বিষ নামিয়ে দেব?'

জবাবে ছোট মা বলল, 'অনিমেষ এসেছে।'

প্রথমে বোধ হয় বুঝতে পারেননি বাবা, 'কে এসেছে? আবার কে জুটল?'

ছোট মা বলল, 'অনিমেষ—অনি।'

এবার চটপট বাবার কেমন হয়ে যাওয়া গলাটা কানে এল, 'অনি? অনি এসেছে। কোথায়?'

'ভেতরে, খাচ্ছে।' খুব নির্লিপ্ত ছোট মার গলা।

'তুমি আনালে?'

'না, বাবা পাঠিয়েছেন তোমাকে দেখতে। অসুখের খবর পেয়েছেন কার মুখে। কাল বাবারও পা ভেঙেছে।'

'সে কি। কি করে?'

'রিকশার ধাক্কা লেগে। আজ হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবেন। তবু ছেলেকে পাঠিয়েছেন তোমায় দেখতে, আর তুমি—।' কেমন ধরা-ধরা লাগল ছোট মার গলা।

'অ্যাই, আগে বলোনি কেন যে ও এসেছে? ছেলেকে দ্যাখাতে চাও, না? প্রতিশোধ নিতে চাও, না?'

'তুমি আমাকে কিছু বলার সুযোগ দাওনি। রোজ রোজ তুমি যা কর, আমি আর পারি না—।' এবার যেন কেঁদে ফেলল ছোট মা।

সঙ্গে সঙ্গে বাবা বলে উঠলেন, 'অ্যাই, চুপ! খবরদার এ ঘরে দাঁড়িয়ে তুমি কাঁদবে না। ছেলেকে শোনাচ্ছ বুঝতে পারছি। খবরদার, কোন নালিশ করবে না।'

ছোট মা বলল, 'চমৎকার। তোমার নামে আমি ঐটুকু ছেলের কাছে নালিশ করব? গলায় দড়ি জোটে না তার চেয়ে!'

বাবা বললেন, 'গুড, গুড। তা সে কোথায়? অনেকদিন পরে এল, না?'

অনির খুব লজ্জা করছিল। বাবার গলা তার আসার খবর পেয়ে অদ্ভুতভাবে যে পাল্টে গেল এটা টের পেয়ে লজ্জাটা যেন আরো বেড়ে গেল। মা বেঁচে থাকলে বাবা কি কখনও এরকম ভাবে কথা বলতে পারতো? বাবার গলা ক্রমশ এদিকে এগিয়ে আসছে। ওর ইচ্ছে করছিল দৌড়ে এখান থেকে চলে যায়, বাবার সঙ্গে এই মুহূর্তে দেখা না হলেই যেন ভাল হয়।

মহীতোষ এলেন। খুব শব্দ করে। জুতো মশমশিয়ে। বারান্দায় পা দিয়ে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে যেন অবাক হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। এই কয় মাসে লাউডগার মত চড় চড় করে বেড়ে গেছে শরীরটা, মাথায় মহীতোষকে ধরতে আর দেরি নেই। নিজের ছেলেকে এখন হঠাৎ লোক-লোক বলে মনে হল মহীতোষের। চোখাচোখি হতেই গলা ঝাড়লেন মহীতোষ, 'কখন এলে?'

অনি কয়েক পা এগিয়ে এসে বাবাকে প্রণাম করল। প্রণাম সেরে উঠতে উঠতে ওর খেয়াল হল ছোট মাকে প্রণাম করেনি। এখন চারপাশে ছোট মাকে দেখতে পেল না। বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'একটু আগে।'

বাবার চেহারাটা এরকম হয়ে গেল কি করে? কেমন রোগা-রোগা, চোখের তলায় কালি, গাল ভাঙা। মাথার চুল লালচে-লালচে মাঝে মাঝে চিকচিক করছে। অসুখটা কি! মহীতোষ বললেন, 'স্কুল বন্ধ?'

'না। অসুখের খবর শুনে দাদু জোর করে পাঠালেন।'

www.MurchOna.com

'অসুখ? কার অসুখ? আরে না, না, কে এসব বাজে কথা রটায়। আমি ভাল আছি। স্কুল যখন খোলা তখন তোমার আসা উচিত হয়নি। তোমার মা থাকলে রাগ করতেন। তোমার এখন ফার্স্ট ডিউটি অধ্যয়ন! তোমার মায়ের ঘরে গিয়েছ?' মহীতোষ চোখ বড় বড় করে তাকালেন।

অনির হঠাৎ মনে হল বাবা ঠিক স্বাভাবিক ভাবে কথা বলছেন না। কথাগুলো যেন অসংলগ্ন এবং সেটা তিনি নিজেও টের পাচ্ছেন। মায়ের ঘর মানে? যে ঘরে মায়ের ছবি আছে সেই ঘর? ও না বুঝে ঘাড় নাড়ল।

মহীতোষ বললেন, 'গুড। ও ঘরে গিয়ে চুপচাপ করে বসে থাকলে দেখবে, 'ইউ ক্যান ফিল হার।' অনি লক্ষ্য করল কথাটা বলার সময় বাবার চোখ কেমন জ্বলজ্বল করে উঠল। ওর মনে পড়ল ছোট মা খবর দেওয়া সত্ত্বেও বাবা দাদুর অ্যাক্সিডেন্টের কথা বলছেন না কিছু। ও ঠিক করল, না বললে সেও কিছু জানাবে না। কারণ ওর মনে হল বাবার মাথায় এখন অন্য কোন চিন্তা রয়েছে, দাদুর কথাটা একদম ভুলে গিয়েছেন।

ছোট মাকে রান্নাঘর থেকে জলখাবার নিয়ে বের হতে দেখে বাবা হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন, 'আচ্ছা, তুমি তাহলে আজকের দিনটা থাক অনি। স্কুল কামাই করা ঠিক নয়। দাদুর ওখানে তোমাকে রেখেছি—হ্যাঁ, দাদুর নাকি পা ভেঙে গেছে, রিকশার সঙ্গে ধাক্কা লেগে?'

অনি ঘাড় নাড়ল, 'কাল বিকেলে হয়েছে, হাসপাতালে ছিলেন। আজ প্লাস্টার করে বাড়ি পাঠিয়ে দেবে।'

এবার যেন মহীতোষের কানে শোনা চেহারাটাকেই সামনাসামনি দেখতে পেল অনি, 'অ্যাঁ! দাদুকে হাসপাতালে রেখে তুমি চলে এসেছ? আশ্চর্য অকৃতজ্ঞ ছেলে। লেখাপড়া শিখে তুমি বাঁদর তৈরী হচ্ছ? যে তোমাকে বুকে আগলে রেখেছে তার প্রতি কর্তব্য বলে কিছু নেই? ছি ছি ছি!'

জীবনে এই প্রথম কেউ তাকে এসব শব্দ দিয়ে তৈরী কড়া বাক্য শোনাল। অনি বাবার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ সমস্ত শরীরে একটা আলোড়ন অনুভব করল। তারপর কোন রকমে বলল, 'আমি আসতে চাই নি, দাদু জোর করে পাঠালেন।' এখন অনির আর কান্না পাচ্ছিল না, এত শক্ত কথা শুনেও ওর ভেতরে কোন অভিমান হচ্ছিল না। বরং ও খুব শক্ত হয়ে সিঁটিয়ে দাঁড়াল।

'তুমি আসতে চাওনি, গুড গুড। তা এই প্রথম বাপ-মায়ের কথা মনে পড়ল? গিয়েছ তো অনেকদিন, আমরা এখানে কেমন আছি খোঁজ রেখেছ! "আমি আসতে চাইনি"—তা তো বলবেই!' মহীতোষ কেমন ঠাট্টা অথচ রাগরাগ গলায় বললেন। এর জবাব কি দেবে অনি? মা থাকতে বাবা তাকে আনতে চান নি। এখন এলেও দোষ, না এলেও দোষ। অনি কোন কথা বলছে না দেখে মহীতোষ ছেলের দিকে তাকালেন। তারপর দু'পা এগিয়ে অনির কাঁধে হাত রাখলেন, 'রাগ করো না, একটু বুঝতে শেখো। তোমার মা তো তোমার জন্যই মারা গেলেন!'

চমকে উঠল অনি, 'আমার জন্য?'

ঘাড় নাড়ালেন মহীতোষ, 'হ্যাঁ। তোমার জেলে যাবার ভবিষ্যৎ-বাণীটা শোনার পর থেকেই ছটফট করছিল। না হলে বৃষ্টির মধ্যে কেউ ঐ অবস্থায় ছাদে আসে। আমিও দোষী, বুঝলি অনি, আমি যদি তখনই হাসপাতালে নিয়ে যেতাম—। ওর চলে যাওয়ার জন্য আমরা সবাই দায়ী!'

হঠাৎ ছোট মার গলা মহীতোষকে যেন বাধা দিল, 'অনেক হয়েছে, ছেলেটা এল আর সঙ্গে সঙ্গে ওকে নিয়ে পড়লে। ওকে ছেড়ে দাও।' লুচির থালাটা টেবিলের ওপর রাখল ছোট মা।

মহীতোষ ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার মা আমার সঙ্গে এভাবে কোনদিন কথ বলেনি।'

অনি কোন উত্তর দিল না। বাবার দিকে না তাকিয়ে আস্তে আস্তে উঠোনে নেমে এল। এই মুহূর্তে ও বাবাকে যেন সহ্য করতে পারছিল না।

বাইরের খোলা মাঠে একরাশ ছাগল গলায় ঘন্টি বেঁধে টুং টাং শব্দ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনি আচ্ছন্নের মত সেখানে এসে দাঁড়াল। এখন মনে হচ্ছে এই বাড়িতে ওর কোন জোর নেই। নিজের বাড়ি বলে ও আর ভাবতে পারছে না। এখন যদি জলপাইগুড়িতে চলে যেতে পারত! ও ঠিক করল বিকেলের বাসে ফিরে যাবে। বাবা কি করে এত বদলে গেলেন? বাবার এই চেহারাটা জলপাইগুড়িতে ওরা কেউ টের পায়নি।

www.MurchOna.com

সামনের আসাম রোড দিয়ে হুস হুস করে গাড়ি ছুটে যাচ্ছে। একরাশ মদেসিয়া মেয়ে পিঠে টুকরি বেঁধে চা পাতি নিয়ে ফ্যাক্টরীর দিকে ফিরে যাচ্ছে। অনি কোয়ার্টারগুলোর সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। মাথার ওপর ঠা-ঠা রোদ এখন। বিশু বা বাপীরা এখন নিশ্চয়ই স্কুলে। সীতাদের বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে অনি শুনতে পেল কেউ তার নাম ধরে ডাকছে। ও দেখল বাড়ির জানলায় সীতার ঠাকুমা বসে আছেন। ওকে তাকাতে দেখে হাত নেড়ে ডাকলেন। ঠাকুমাকে দেখে অনির খুব ভাল লাগল। অনি যখন এখানে থাকত তখন ঠাকুমা রোজ বিকেলে ওদের বাড়িতে পিসীমার কাছে বেড়াতে আসতেন। ঠাকুমার কাছে ওরা কত মজার গল্প শুনেছে।

গেট খুলে বাগান পেরিয়ে বারান্দায় উঠল অনি। সীতাদের কোয়ার্টারটা একই রকম আছে, চোখ বন্ধ করে ও ঘোরাফেরা করতে পারে। বাঁ দিকের ঘরে ঠাকুমা বসে আছেন। ওকে দেখেই ফোকলা দাঁতে বলে উঠলেন, 'আয় দাদু, কাছে এসে বস, কখন এলি?'

ঠাকুমার চেহারা একই রকম আছে। বিছানার ওপর ছড়ানো পা দুটো দেখল অনি, বেশ ফোলা ফোলা। 'চোখে বড় কম দেখি আজকাল, তাই ভাবলাম সত্যি দেখছি তো। কি লম্বা হয়ে গেছিস দাদু, আয় কাছে এসে বস।'

হাত বাড়িয়ে বিছানার একটা ধার দেখিয়ে দিতে অনি সেখানে বসল, 'কেমন আছ ঠাকুমা?'

'ওমা, গলার স্বর দ্যাখ, একদম ব্যাটাছেলে ব্যাটাছেলে লাগছে। তা হ্যাঁ দাদু, এখান থেকে চলে গিয়ে আমাদের এমন করে ভুলে যেতে হয়?' ঠাকুমা তাঁর শির বার করা হাত অনির গায়ে বোলাতে লাগলেন।

মনটা কেমন হয়ে যাচ্ছিল অনির, আস্তে আস্তে বলল, 'তুমি একইরকম আছ।'

'সে কি! দু'রকম হতে যাবো কেন? কিন্তু আজকাল একদম হাঁটতে পারি না রে, বাতে পেড়ে ফেলেছে, পা দুটো দ্যাখ, কলাগাছ। কবে যে ছাই যমের রুচি হবে! সে বেটি তো স্বার্থপরের মত কলা দেখিয়ে চলে গেল!' ঠাকুমার শেষ কথাটা শুনে অনি ওঁর মুখের দিকে তাকাতেই তিনি কেঁদে ফেললেন, 'গৃহপ্রবেশে যাবার আগে আমায় বলে গেল তোমার ওপর সব দায়িত্ব, এবার দিদি নেই। তা আমি বসে বসে আটখানা কাঁথা সেলাই করে রেখেছিলাম, মাধুর বড় ইচ্ছে ছিল মেয়ে হোক এবার।' ডুকরে ওঠা কান্নাটাকে কোনরকমে সামলে আবার বললেন, 'তা সেসব কাঁথা আমার কাছে পড়েই রইল। মহীকে এত করে জিজ্ঞাসা করলাম, বাঁচাতে পারলি না কেন? জবাব দেয় না।'

মায়ের কথা ঠাকুমা এভাবে বলবেন আন্দাজ করতে পারেনি অনি। এসব কথা শুনেও ওর কান্না পাচ্ছে না কেন আজ? হঠাৎ ঠাকুমা গলা নামিয়ে যেন কোন গোপন কথা বলছেন এই ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোর সৎমা বড় ভাল মেয়ে রে। এত লোককে দেখলাম, মেয়ে দেখলে আমি চিনতে পারব না? বেশ মেয়ে, কিন্তু বড় দুঃখী। তুই ওকে কষ্ট দিস না ভাই।'

হাসতে চেষ্টা করল অনি, 'কি যা-তা বলছ! আমি কষ্ট দিতে যাব কেন?'

ঠাকুমা যেন কি বলতে গিয়ে বললেন না। তারপর প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বললেন, 'তোর দাদু কেমন আছে রে?'

অনি দাদুর খবরটা দিতেই মাথা নাড়তে লাগলেন বুড়ী, 'এই বয়সে পা ভাঙলে কি আর জোড়া লাগে! দেখেশুনে তো রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হয়। তা হ্যাঁ দাদু, তেনার পা সেরে গেলে শিগ্‌গীর একবার নিয়ে আসতে পারবি?'

'কেন?'

'দরকার আছে ভাই। নইলে যে সব ভেসে যাবে। আমি তো বিছানা থেকে উঠতে পারি না, আমার কথা কে শোনে! কিন্তু আমার কানে তো সবই আসে। দাদুভাই, আমাদের সবাইকে ভগবান নিজের নিজের জায়গায় থাকতে দিয়েছেন, আমরা যদি বাড়াবাড়ি করি তবে তিনি সইবেন কেন? তা তুই কিন্তু মনে করে তেনাকে বলিস!'

ব্যাপারটা কেমন অস্পষ্ট অথচ কিছু একটার ইঙ্গিত পাচ্ছে অনি। ও জানে ঠাকুমাকে, এ বিষয়ে বেশী প্রশ্ন করে লাভ হবে না।

ঠাকুমা হঠাৎ চিৎকার শুরু করলেন, 'ও বউমা, দ্যাখ কে এসেছে! তোমার বন্ধুর ছেলে গো।'

www.MurchOna.com

সাধারণত চা-বাগানের এই সব কোয়ার্টারের রান্নাঘর একটু দূরে, উঠোন পেরিয়েই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। সেখানে থেকে মহিলাকণ্ঠে সাড়া এল।

অনি বলল, 'সীতা কোথায়? স্কুলে?'

'সে মুখপুড়ি গলা ফুলিয়ে বিছানায় কাৎ হয়ে আছে। যা না, পাশের ঘরে গিয়ে দ্যাখ না, দুদিনের জ্বরে কি চেহারা হয়েছে!'

অনি উঠে পাশের ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। এখানে দাঁড়িয়েই ও সীতাকে দেখতে পেল। একটা বড় খাটের ঠিক মধ্যিখানে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। মুখটা ঘামে ভর্তি। চোখ দুটো বোজা— অঘোরে ঘুমুচ্ছে। শব্দ না করে পাশে এসে দাঁড়াল অনি। বোধ হয় জ্বর ছাড়ছে ওর, বালিশ অবধি ঘামে ভিজে গেছে। ঘুমোলে মানুষের মুখ কেমন আদুরে আদুরে হয়ে যায়।

ডাকতে মায়া হল অনির, ফিরে যাবে বলে ঘুরতেই ও সীতার মাকে দেখতে পেল। রান্না করতে করতে বোধ হয় ছুটে এসেছেন, 'ও মা, অনি কখন এলি?' দেখেছেন মা, কি লম্বা হয়ে গেছে!'

ঠাকুমা বললেন, 'ওদের শুষ্টির ধাত লম্বা হওয়া।'

'এই তো আজ সকালে।' অনি হাসল।

'তোর নাকি এত পড়ার চাপ যে আসবার সময় পাস না?' সীতার মা বললেন।

অনি বলল, 'কে বলল?'

'তোর নতুন মা!' কথাটা বলেই ভদ্রমহিলা চট করে শাশুড়ীর দিকে তাকালেন। তারপর হেসে উঠলেন, 'দাঁড়িয়ে কেন, বস। আজকে নাড়ু বানিয়েছি, খেয়ে যা। ছেলেবেলায় ও নাড়ু খেতে ভালবাসত, না মা?'

ঠাকুমা হাসলেন, 'একবার হেমের ঠাকুরঘরের নাড়ু চুরি করে খেয়েছিল বলে দশবার ওঠ-বোস করেছিল।'

অনি বলল, 'আজ থাক ঠাকুমা। আমি এইমাত্র খেয়ে আসছি।'

ঠাকুমা বললেন, 'থাক মানে? এ বাড়ি থেকে না খেয়ে যাবি? বড় হয়ে গেছিস বুঝি! আর ও মেয়েটা যদি ঘুম থেকে উঠে শোনে যে তুই এসে না কথা বলে চলে গেছিস তাহলে আমাকে আস্ত রাখবে?'

সীতার মা বললেন, 'তুমি ওকে ডেকে তোল, অবেলায় ঘুমোচ্ছে। আমি তোমার নাড়ু নিয়ে আসছি।' রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন তিনি।

অনি আবার সীতার দিকে ফিরে তাকাল। ঠোঁটটা ঈষৎ ফাঁক হয়ে থাকায় সাদা দাঁত চিকচিক করছে। মুক্তোর মত ঘামের ফোঁটা কপালময়, গলায় ছড়ানো। রুক্ষ একরাশ চুল ফেঁপে ফুলে বালিশটাকে অন্ধকার করে রেখেছে। হঠাৎ অনির খুব অস্বস্তি হতে আরম্ভ করল। ও ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ঠাকুমা পাশের ঘরের খাটে বসে খোলা দরজা দিয়ে তাকে দেখছেন। চোখাচোখি হতে হেসে বললেন, 'কি কি হল, চেঁচিয়ে ডাক। মেয়েটা একটু কালা আছে।'

হঠাৎ অনির মনে পড়ল ছেলেবেলায় সীতা কানে একটু কম শুনতো। ও এবার ঝুঁকে পড়ে চেঁচিয়ে ডাকল, 'সীতা, সীতা!'

আচমকা ঘুম ভেঙে গেলে যে অস্বচ্ছতা থাকে সেটা কাটিয়ে উঠতে একটু সময় লাগল সীতার। মুখের সামনে একটি অনভ্যস্ত মুখ দেখতে পেয়ে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল।

একটু সময় সামলে উঠতে দিয়ে অনি বলল, 'খুব ভয় পেয়ে গেছিস, না?'

খুব দ্রুত খাটের ওপর বাবু হয়ে বসে গায়ের চাদরটা শরীরে জড়িয়ে নিতে নিতে সীতা হাসতে চেষ্টা করল, দুর্বলতায় হাসিটা সচ্ছল হল না, 'শেষ পর্যন্ত আমাদের মনে পড়ল?'

জবাব দিতে গিয়ে কথা আটকে গেল অনির। সীতা কেমন বড়দের মত কথা বলছে। এখন ও বসে আছে গায়ে চাদর জড়িয়ে কিন্তু তবু কেমন বড় বড় দেখাচ্ছে। যুৎসই উত্তর খুঁজে না পেয়ে সামান্য হাসল অনি, 'জ্বর বাধিয়ে বসে আছিস?'

'এই একটু। কখন আসা হল?' সীতার বোধ হয় অস্বস্তি হচ্ছিল, খাট থেকে নেমে দাঁড়াল।

অনি বলল, 'সকালে। তুই শো, উঠলি কেন?'

www.MurchOna.com

'সারাক্ষণই তো শুয়ে আছি। তা নিজের থেকে আমাদের বাড়িতে আসা হয়েছে, না ঠাকুমা ডাকল?' সীতা চোখ বড় বড় করল।

এখন এই মুহূর্তে সত্যি কথাটা বলতে অনির ইচ্ছে করছিল না। ওকে ইতস্তত করতে দেখে সীতা ঘাড় ঘুরিয়ে পাশের ঘরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঠাকুমা, তুমি ওকে ডেকেছ না?'

বুড়ী প্রথমে ঠাওর না করতে পারলেও শেষে বললেন, 'ও আসব আসব করছিল আর আমিও ডেকে ফেললাম, কেন কি হয়েছে?'

সীতা বলল, 'জলপাইগুড়ির জেলা স্কুলে পড়ে তো, আমাদের এখানে আসা মানায় না।'

ঠাকুমা হেসে বললেন, 'পাগলি।'

অনি ঘাড় নাড়ল, 'ঠিক ঠিক। এখনও বাচ্চা আছিস তুই।'

চোখের কোণে তাকাল সীতা, 'তাই নাকি? এখনও হাফ প্যান্ট পরা হয় কিন্তু!'

অনি চট করে জিভটা সামলে নিল। ও সীতাকে বলতে পারত যে, সে-ও ফ্রক পরে, কিন্তু ক্রমশ টের পাচ্ছিল সীতা যেন ওর চেয়ে অনেক বেশী বুঝে কথা বলে। সেই ছেলেবেলায় সীতা, যে কিনা শক্ত হাতে হাত ধরলে কেঁদে ফেলত, সে কেমন করে কথা বলছে দ্যাখ।

প্রসঙ্গ ঘোরাতে চাইল অনি, 'বিশু বাপীদের খরব কি রে?'

পিঠের ফুলে থাকা ডানগোছের চুলটাকে সামনে এনে সীতা আঙুলে তার ডগা জড়াতে জড়াতে বলল, 'বিশু তো কুচবিহারে জেঙ্কিংস স্কুলে পড়ছে। চিঠি লেখালেখি পর্যন্ত হয় না?'

ঘাড় নাড়ল অনি, 'না'।

'চমৎকার! আমি ভাবলাম শুধু আমিই বঞ্চিত। আর বাপীর কথা না বলাই ভাল। অন্যের কাছে শুনলেই হয়।' সীতা গম্ভীর মুখে বলে আবার খাটে পা ঝুলিয়ে বসে পড়ল। বোধ হয় দাঁড়াতে ওর কষ্ট হচ্ছিল।

'কেন, কি হয়েছে ওর?'

'খুব খারাপ হয়ে গিয়েছে বাপী। মেয়েদের টিটকিরি দেয়, সাইকেল নিয়ে পেছনে পেছনে ঘোরে। রাঙ্গারহাট স্কুলে ভর্তি হয়েছিল, যায়ই না।' মুখ বাঁকাল সীতা।

'তোকে কিছু বলেছে?' বাপীর চেহারাটাও এই বর্ণনার সঙ্গে মেলাতে পারছিল না।

'ইস, অত সাহস আছে? একদিন রাস্তায় হঠাৎ দাঁড়িয়ে বলেছিল—এই সীতা, রাবণ এলে খবর দিস, কি অসভ্য ছেলে!'

হেসে ফেলল অনি, 'তুই কি বললি?'

'আমি খুব চেঁচামেচি করে উঠতে ও পালিয়ে গেল। যাবার আগে কেমন ঘাবড়ে গিয়ে বলে গেল, তুই আমাদের সেই সীতা তো রে, বড় হয়ে গেলে তোরা সব কেমন হয়ে যাস। ও চলে গেলে দম ফেলে বাঁচি বাবা।' সীতা বুকে হাত রাখল, 'জানি না, আমার সামনে যিনি আছেন তিনি শহরে এ সব করেন কিনা! দেখে তো মনে হয়, খুব শান্তশিষ্ট।'

হঠাৎ অনি আবিষ্কার করল যে, সীতা ওকে এতক্ষণ ধরে তুই বা তুমি কোনটাই বলছে না। এভাবে সম্বোধন না করে কথা বলা খুব সহজ নয়, কিন্তু সীতা বেশ অবলীলায় তা চালিয়ে যাচ্ছে।

এই সময় সীতার মা এক ডিশ খাবার হাতে ঘরে এলেন। অনি বলল, তিল আর নাড়কেলের নাড়ুতে ডিসটা সাজানো, সন্দেশও আছে।

সীতার মা বললেন, 'নাও, খেয়ে নাও। তুমি যা ভালবাস তাই দিলাম।'

খাবার দেখে আঁতকে উঠল অনি, 'এখনও পেট ভরাট, এত খেতে পারব না।'

সীতা হঠাৎ হেসে উঠল শব্দ করে, 'ও ঠাকুমা, শুনছ, তোমার নাড়ুগোপাল বলছে খেতে পারবে না, শহরের জল পেটে পড়লে সব পালটে যায়।'

অনি একটু ধমকের গলায় বলল, 'খুব পাকা পাকা কথা বলছিস তুই।'

সীতার মা বললেন, 'ঠিক বলেছ তুমি। ভীষণ অসভ্য মেয়ে। ভাবছি এবার ওকে এখানকার স্কুল থেকে ছাড়িয়ে জলপাইগুড়িতে তপুদের স্কুলে পাঠিয়ে দেব। হোস্টল আছে, বেশ হবে তখন।'

www.MurchOna.com

পাশের ঘরে খাটের ওপর বসে ঠাকুমা বললেন, 'মেয়ে হয়েছে যখন, তখন পরের ঘরে তো যাবেই একদিন, এখন থেকে বাড়ির বাইরে পাঠানোর কি দরকার?'

সীতার মা বললেন, 'না, এখানে ওর পড়াশুনা হচ্ছে না।'

'ঠাকুমা বললেন, 'জন্মেছে তো হাঁড়িখুনতি ঠেলতে—বিদ্যে নিয়েও তো সেই একই গতি। মেয়েকে পড়াশুনা করে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হতে দেবে?'

চট করে কথাটার জবাব দিলেন না সীতার মা, 'যাই বলুন, শহরের ভাল স্কুলে পড়লে চেহারাই অন্যরকম হয়ে যায়। এই দেখুন আমাদের অনিকে, এখানকার ছেলেদের চেয়ে কত আলাদা, দেখলেই বোঝা যায়।'

সীতা ফুট কাটল, 'নাড়ুগোপাল, নাড়ুগোপাল!'

সীতার মা মেয়েকে ধমক দিলেন।

অনি যতটা পারে খেল, তারপর খানিকক্ষণ গল্প করে চলে আসার জন্য উঠল। ঠাকুমা আবার দাদুকে বলার জন্য অনিকে মনে করিয়ে দিলেন। বাইরে এখন রোদ নেই বলা যায়। একটা বিরাট মেঘ ভুটানের পাহাড় থেকে ভেসে এসে এই স্বর্গছেঁড়ার ওপর চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। তাই চারধার কেমন ছায়া-ছায়া।

সীতা বাইরের দরজা অবধি হেঁটে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কবে যাওয়া হবে?'

অনি বলল, 'বোধ হয় কাল।'

কেমন উদাস গলায় সীতা বলল, 'আজ বিকেলে কি বাপীর সঙ্গে আড্ডা মারা হচ্ছে?

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাল অনি, 'কেন?'

'এখানে এলেই হয়।' সীতা দরজার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ওর গায়ে এখন চাদর নেই। জ্বর না থাকলেও তার ছাপটা মুখে স্পষ্ট। ওর শরীর এবং পায়ের দিকে তাকাতেই অনির মনে হল—সীতা খুব বড় হয়ে গেছে। সেই কামিনটার মত সীতার শরীর এখন। চাহনিটা দেখে বোধ হয় সীতা সোজা হয়ে দাঁড়াল, 'বিকেলে না এলে আর কথা বলব না। অসভ্য।' বলে সীতা দ্রুত পায়ে ভেতরে চলে গেল।

হঠাৎ অনির বুকের ভিতর কি যেন কেমন করে উঠল। সীতাকে আর একবার দেখার জন্য মুখ ফিরিয়ে ও দেখল জানলায় বসে ঠাকুমা ওর দিকে চেয়ে আছেন।

বাগানের এলাকা ছাড়িয়ে আসাম রোড ধরে বাজারের দিকে হাঁটতে বেশ অবাক হয়ে গেল অনি। দুপাশে এত দোকানপাট হয়ে গেছে যে, জায়গাটাকে চেনাই যায় না। আগে যেসব জায়গায় শুধু হাটবারে ত্রিপল টাঙিয়ে দোকান বসত সেখানে বেশ মজবুত কাঠের দোকানঘর দেখতে পেল সে। দোকানদারদের অধিকাংশই অচেনা, বোঝা যাচ্ছে বাইরে থেকে প্রচুর লোক স্বর্গছেঁড়ায় এসে স্থায়ী আস্তানা গেড়ে বসেছে। ওয়োর-কাটার মাঠটা ছাড়িয়ে আগে নদী, ওপারের ধানক্ষেত স্পষ্ট দেখা যেত, এখন সব আড়ালে পড়ে গিয়েছে।

বিলাসের মিষ্টির দোকানটা বেশ বড় হয়েছে যেন, নতুন শো-কেসের মধ্যে মিষ্টির থালাগুলো দূর থেকে দেখা যায়। বিলাসকে কাছেপিঠে দেখল না সে। আঙরাভাসা নদীর পুলটার ওপরে এসে দাঁড়াল অনি। নীচে লকগেটের তলা দিয়ে সেই রকম জল প্রচন্ড স্রোতে ফেনা ছড়িয়ে বয়ে যাচ্ছে ওদের কোয়ার্টারের পিছন দিয়ে ফ্যাক্টরীর হুইল ঘোরাতে। অনির মনে পড়ল বাপী একবার বলেছিল, এখান থেকে সাঁতরে বাড়ির পেছনে অবধি যাবে, আর যাওয়া হয়নি। বাপীটা এরকম হয়ে গেল কি করে? মেয়েদের টিটকিরি দিলে কি লাভ হয়? বরং সীতার মত মেয়েরা তো চেঁচামেচি করবে। তা ছাড়া খামোকা টিটকিরি দেবেই বা কেন?

ভরত হাজামের দোকানটা নেই। সেখানে এখন বেশ বড়সড় সেলুন হয়েছে, ওপরে সাইনবোর্ডে নাম পড়ল অনি, 'কেশচর্চা'। রাস্তা থেকেই ভেতরের বড় বড় আয়না, চেয়ার দেখা যায়। বুকে সাদাকাপড় বেঁধে তিনজন লোক চুল কাটছে খদ্দেরের। সেই ল্যাংড়া কুকুর বা ভরত হাজাম, কাউকে কাছে পিঠে চোখে পড়ল না। নাচ বুড়িয়া নাচ, কাঙ্কে পর নাচ—অনি হেসে ফেলল।

www.MurchOna.com

চৌমাথায় এসে অনির চমক আরো বেড়ে গেল। স্বর্গছেঁড়া যেন রাতারাতি শহর হয়ে গিয়েছে। পুরো চৌমাথা ঘিরে পান সিগারেট, রেস্টুরেন্ট আর স্টেশনারি দোকানে ছেয়ে গেছে। ওপাশের পেট্রলপাম্পের গায়ে অনেক নতুন নতুন সাইনবোর্ড ঝুলছে। সকাল পেরিয়ে যাওয়া এই সময়টায় আগে স্বর্গছেঁড়ার রাস্তায় লোকজন থাকত না বললেই চলে, এখন জলপাইগুড়ির মত জমজমাট হয়ে আছে। এমন সময় কুচবিহার-জলপাইগুড়ি রুটের একটা বাস এসে স্ট্যান্ডে দাঁড়াতে অনি সেদিকে তাকাল। দুতিনজন কুলি মাল বইবার জন্য ছুটে গেল সেদিকে। তাদের একজনের দিকে নজর পড়তে অনি সোজা হয়ে দাঁড়াল, ঝাঁড়িকাকু। হাফপ্যান্ট আর ময়লা একটা ফতুয়া মতন পরে বাসের মাথার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে, স্বর্গছেঁড়ায় এখন কেউ মালপত্র নিয়ে নামল না। অনির মনে হচ্ছিল, ও ভুল দেখছে। সেই ঝাঁড়িকাকু এখন কুলিগিরি করছে! ভিড়টা একটু হালকা হতে ঝাড়িকাকু ঘুরে দাঁড়াতে রাস্তায় এপাশে দাঁড়ানো অনির সঙ্গে চোখাচোখি হল। অনি দেখল, প্রথমে যেন চিনতে পারেনি চট করে, তারপর হঠাৎ ঝাড়িকাকুর চেহারাটা একদম অন্য রকম হয়ে গেল। যেন অনিকে দ্যাখেনি এমন ভান করে দ্রুত পা চালিয়ে অন্যদিকে চলে যেতে চাইল। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে অনি আর দেরি করল না। পেছন পেছন দৌড়ে গিয়ে চিৎকার করতে লাগল, 'ও ঝাড়িকাকু, ঝাড়িকাকু!'

কয়েক পা হেঁটে বোধ হয় আর এড়াতে পারল না, ঝাঁড়িকাকু দাঁড়িয়ে পড়ল। হাঁপাতে হাঁপাতে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াল অনি, 'আরে, তুমি আমাকে দেখেও চলে যাচ্ছিলে কেন?' ঝাড়িকাকুর একটা হাত ধরল সে। খুব বুড়িয়ে গেছে ঝাড়িকাকু। মুখে কাঁচা-পাঁকা খোঁচা খোঁচা দাড়ি। গাল ভেঙে গেছে। হাতময় শিরা জড়ানো। অনি প্রথমেই টের পেল, ওর হাতে ধরা খড়খড়ে শক্ত হাতটা থরথর করে কাঁপছে। তারপরই মুখ বিকৃত করে অতবড় মানুষটা একটা কান্না চাপবার চেষ্টা করে যেতে লাগল প্রাণপণে। কারো চোখে জল দেখলেই অনির চোখ কেমন করে ওঠে, 'এই, তুমি কাঁদছ কেন?'

এবার হাউমাউ করে উঠল ঝাড়িকাকু, 'তোর বাবা আমাকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে রে এই একটুখানি দেখেছি যে মহীকে সে আমাকে দূর করে দিল।'

এরকম একটা দৃশ্য প্রকাশ্যে চৌমাথায় ঘটতে দেখে মুহূর্তেই বেশ ভিড় জমে গেল। দুতিনজন কুলিগোছের লোক ঝাড়িকাকুকে বারংবার জিজ্ঞাসা করতে লাগল, কি হয়েছে? কোন শালা মেরেছে? ঝাড়িকাকু কারো কথার জবাব দিচ্ছিল না বটে, কিন্তু অনির খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। সবাই তার দিকে সন্দেহের চোখে যে তাকাচ্ছে এটা বুঝতে পারছিল সে। যারা অনিকে চিনতে পারছে তারা কেউ কেউ বলতে লাগল, 'নিজের হাতে মানুষ করেছে—এ বাবা নাড়ির বাঁধনের চেয়ে বেশী।' ভিড়টা যখন বেশ বড়সড় হয়ে উঠেছে, এমন সময় দু'তিনটে সাইকেল খুব জোরে ঘন্টি বাজাতে বাজাতে ওদের পাশে এসে ব্রেক কষে দাঁড়াল। 'কি খেলা হচ্ছে, পকেটমার নাকি?' গলাটা খুব চেনা-চেনা মনে হল অনির, সামনের মানুষের আড়াল থাকায় দেখতে পাচ্ছিল না। আরো দুজন কি একটা বলে এগিয়ে আসতেই ভিড়টা চট করে হালকা হয়ে গেল। অনি দেখল, একটা লম্বাটে ছেলে এসে ওদের দেখে ভ্রু কুঁচকে বলে উঠল, 'ক্রাইং কেস!'

সে আবার কি!' ওপাশে সাইকেলে ভর দিয়ে কথাটা যে বলল তাকে এবার দেখতে পেল অনি। চোখাচোখি হলে সে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর অনি কিছু বোঝার আগেই বাপী তীরের মত ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল। ঝনঝন করে একটা সাইকেলকে মাটিতে পড়ে যেতে শুনল সে। সেদিকে কান না দিয়ে বাপী ততক্ষণ একনাগাড়ে কি সব বলে গিয়ে শেষ করল, 'গুড বয় হয়ে শেষ পর্যন্ত আমাকে ভুলে গেলি, অনি?'

ভীষণ বিহ্বল হয়ে পড়েছিল অনি, 'না, ভুলব কেন? তুইও তো আমাকে চিঠি দিস না?'

বাপী বলল, 'ভেবেছিলাম দেব, কিন্তু এত বানান ভুল হয়ে যায় না যে লজ্জা করে। আমি না খুব খারাপ হয়ে গেছি, সবাই বলে।'

'কেন? খারাপ হতে যাবি কেন?' অনির কেমন কষ্ট হচ্ছিল।

'দূর শালা, তা আমি জানি নাকি। এই শোন, এখন বীরপাড়ায় যাচ্ছি, একটা ঝামেলা হয়েছে, সামলাতে হবে। বিকেলবেলায় দেখা হবে, হ্যাঁ?' অনি ঘাড় নাড়তেই বাপী দৌড়ে সাইকেলটাকে মাটি

www.MurchOna.com

থেকে তুলে লাফিয়ে সিটে উঠল। অনি দেখল ওর দুই সঙ্গীকে নিয়ে তিনটে সাইকেল দ্রুত বীরপাড়ার দিকে চলে গেল।

বোধ হয় অন্য একটা ঘটনা সামনে ঘটে যাওয়ায় ঝাড়িকাকু সামনে নিয়েছিল এরই মধ্যে। বাপীরা চলে গেলে কয়েকজন দূর থেকে ওদের দেখতে লাগল কিন্তু আগের মত কাছে এসে ভিড় করল না। অনি দেখল লঙ্কাপাড়া থেকে একটা প্রাইভেট বাস এসে স্ট্যান্ডে দাঁড়াতেই কুলিরা সেদিকে ছুটে গেল। ঝাড়িকাকু একবারও বাসটার দিকে না তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কখন এলি? কর্তাবাবু কেমন আছে?'

'সকালে। দাদুর পা ভেঙে গেছে কাল, এমনিতে ভাল আছে।'

'সে কি? পা ভাঙল কেন? এই বুড়ো বয়সে—পড়ে গিয়েছিল?'

'না, রিকশায় ধাক্কা লেগেছিল।'

শুনে ঝাড়িকাকু জিভ দিয়ে কেমন একটা চুক চুক শব্দ করল।

'দিদি কেমন আছে?'

'ভাল। কিন্তু তুমি কেমন আছ?'

'আমি ভাল নেই রে।' ঝাড়িকাকু ওকে নিয়ে হাঁটতে লাগল স্কুলের রাস্তায়।

যদিও শরীর দেখেই বোঝা যায় তবু অনি জিজ্ঞাসা করল, 'কেন?'

'আমার যে কেউ নেই রে, একা একা কি ভাল থাকা যায়।' অনি কথাটা শুনে ঝাড়িকাকুর হাতটা চট করে জড়িয়ে ধরে হাঁটতে লাগল। ঝাঁড়িকাকু বলল, 'তুই আমার সঙ্গে হাঁটছিস দেখলে মহী রাগ করবে।'

'কেন, রাগ করবে কেন? তুমি কি আমার পর?'

'তুই যে কবে বড় হবি!'

'আমি তো বড় হয়েছি, তোমার চেয়ে লম্বা!'

'এই বড় নয়। যে বড় হলে মহীর মত আমাকে চড় মারা যায়!'

'কেন তোমাকে মেরেছিল বাবা? কি করেছিলে তুমি?

'কি হবে সেকথা শুনে! হাজার হোক মহী তোর বাবা, বাবার নিন্দে কোন ছেলের শুনতে নেই।' মুখ ঘুরিয়ে নিল ঝাড়িকাকু।

তবু অনি জেদ ধরল, 'মা বলত সত্যি কথা বললে শুনলে কোন পাপ হয় না!'

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল ঝাঁড়িকাকু, 'মা! তোর মায়ের কথা মনে আছে?'

অবাক হয়ে গেল অনি, 'কেন থাকবে না! সব মনে আছে।'

'আমি খবরটা শুনে বিশ্বাস করতে পারিনি। এই সেদিন কর্তাবাবু মহীকে বিয়ে দিয়ে নিয়ে এলেন তোর মাকে। তারপর তুই এলি—কি যে হয়ে যায় সব! তোর মা চলে গেল মহীটা একদম ভেঙে পড়েছিল। তখন রোজ রাত্রে ওর ঘরে শুতাম আমি। একা শুলেই কান্নাকাটি করত। ওর খাটের পাশে মাটিতে শুয়ে আমি শুধু তোর মায়ের কথা ছাড়া সব গল্প করতাম।' ঝাড়িকাকু কথা থামিয়ে একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলল।

এসব খবর অনির জানা নেই। ঝাড়িকাকু কোন রকমে তখন বাবাকে রান্না করে খাওয়াচ্ছে—এই খবরটাই শুনেছিল শুধু। তাই বাকিটা শোনার জন্য বলল, 'তারপর?'

বাঁ হাতের ডানায় চট করে মুখটা ঘষে নিয়ে ঝাড়িকাকু বলল, 'তারপর যখন তখন মহীর আবার বিয়ের কথা উঠল তখন ও কিছুতেই রাজী হচ্ছিল না। আমারও পছন্দ ছিল না। কিন্তু অন্য বাবুরা বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ওর মত করিয়ে বিয়ে দিয়ে দিল।' হঠাৎ ওর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ঝাড়িকাকু বলল, 'তোর নতুন মায়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে?'

হেসে ফেলল অনি, 'বারে! কেন হবে না?'

ঝাড়িকাকু বলল, 'বড় ভাল মেয়ে রে। বিয়ের পর বছর তিনেক তো বেশ ভাল ছিল সবই। আমি ভাবতাম, যাক, এই ভাল হয়। তোর মায়ের অভাব টের পেতে দিত না মেয়েটা। এমন কি আমার সঙ্গে থেকে গরুর কাজও শিখে নিয়েছিল। যে গেছে তার জন্যে মানুষ কতদিন দুঃখ করতে পারে। কিন্তু এই মেয়েটা রাতারাতি যেন এই বাড়ির লোক হয়ে গেল।'

www.MurchOna.com

'আরে! তুমি আমাদের বড়বাবুর নাতি না?'

অনি মুখ ঘুরিয়ে দেখল, একজন বৃদ্ধ মতন লোক ওর দিকে তাকিয়ে আছেন। মাথা নাড়ল অনি, 'হ্যাঁ।'

'বড়বাবু কেমন আছে?' বৃদ্ধ যেখানে দাঁড়িয়ে তার পিছনে বিরাট স-মিল। অনি এতক্ষণে চিনতে পারল। ওঁর নাম হারাণচন্দ্র পাল। খুব বড়লোক। দু-তিনটে স-মিল আছে, বাস-ফাস, জমি-টমি আছে। দাদুর কাছে শুনেছে অনি, একদম ছোটবেলায় ইনি স্বর্গছেঁড়ায় এসে মুড়ি বিক্রি করতেন। পা ভাঙার কথাটা বলতে গিয়েও ঘাড় নাড়ল অনি। ক্লাসে সংস্কৃতের স্যার পড়া জিজ্ঞাসা করলে মন্টু এইরকম ভাবে ঘাড় নাড়ে। হ্যাঁ কিংবা না দুটোই হয়।

'ভাল, ভাল। তুমি তো বেশ বড় হয়ে গেছ হে। কিন্তু এত রোগা কেন? তালপাতার সেপাই। আরে দেশ গড়তে গেলে স্বাস্থ্য ভাল চাই। সেই পনেরই আগস্ট সকালে ফ্ল্যাগ তুলেছিলে তুমি, যতই বড় হও, দেখেই চিনেছি। হেঁ হেঁ। বেশ বেশ।' বৃদ্ধ হাসি-হাসি মুখ করে ছবির মত দাঁড়িয়ে আছেন দেখে ওরা আবার হাঁটতে লাগল। সাতচল্লিশ সালের পনেরই আগস্টের কথা বৃদ্ধ বলতেই ওর বেশ রোমাঞ্চ হচ্ছিল। স্বর্গছেঁড়ায় অনেকেই নিশ্চয়ই মনে করে রেখেছে তার কথা। উঃ, ফ্ল্যাগটা কি দারুণ উড়েছিল।

ভবানীমাস্টারের মুখটা মনে পড়তেই ও দেখা করার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠল। ঝাড়িকাকু চুপচাপ কিছু ভাবছিল। ও বলল, 'চল, স্কুলে যেতে যেতে সব শুনব।'

'কেন, স্কুলে কি হবে?' ঝাড়িকাকু ব্যাপারটা পছন্দ করল না।

'ভবানীমাস্টারকে দেখে আসি।'

'কাকে?'

'ভবানীমাস্টারকে দেখে আসি।'

'কাকে?'

'ভবানীমাস্টার। আমাদের পড়াত না? ভবানীমাস্টার, নতুন দিদিমণি!'

'ও। সে স্কুলে তো উঠে গিয়েছে। এখন হিন্দুপাড়ায় বিরাট স্কুল হয়েছে। তোমাদের সেই নতুন দিদিমণির বিয়ে হয়ে গিয়েছে মরাঘাটে। আর ভবানীমাস্টারের খুব অসুখ, বাঁচবে না।'

'কি হয়েছে?' অনি সেই মুখ মনে করতে চেয়ে স্পষ্ট দেখে ফেলল।

'শরীর নাকি অবশ হয়ে গেছে। কলোনিতে আছে, আমি দেখিনি।'

একটা অদ্ভুত নিঃসঙ্গতা-বোধ অনিমেষকে ঘিরে ধরল আচমকা। এইসব মানুষ এবং এই পরিচিত জায়গাটা যদি এমনি করে তার চেহারা পালটে একদম অচেনা হয়ে যায় তাহলে কি করবে।

অনি জিজ্ঞাসা করল, 'কলোনিতে কোথায় উনি আছেন তুমি জানো?'

ঝাড়িকাকু ঘাড় নাড়ল। তারপর বলল, 'কেন?'

'আমি যাব। তুমি চল আমার সঙ্গে, খুঁজে নেব।' অনি জোর করে ঝাড়িকাকুর হাত ধরে কলোনির দিকে হাঁটতে লাগল। দুপাশে কাঁচা কাঠের গন্ধ বেরুচ্ছে। স-মিলগুলো থেকে একটানা করাত চালাবার শব্দ হচ্ছে। একটা ট্রাক্টর চা-পাতা বোঝাই ক্যারিয়রকে টেনে নিয়ে ফ্যাক্টরীর দিকে চলে গেল।

অনি পুরোনো কথার খেই ধরে জিজ্ঞাসা করল, 'তারপর কি হল? বাবা তোমাকে মারল কেন?'

ঝাড়িকাকু বলল, 'এসব কথা থাক।'

'তুমি বার বার থাক ব'লো না তো!' অনি প্রায় ঝাঁঝিয়ে উঠল।

ঝাড়িকাকু বিব্রত হয়ে ওর দিকে তাকাল। এই ছোট্ট মানুষটাকে খুব দ্বিধায় পড়েছে বোঝা যাচ্ছিল। তারপর যেন বাধ্য হয়ে বলল, 'তোর নতুন মাকে নিয়ে তোর বাবা মাঝে মাঝে কুচবিহার যেত ডাক্তারের কাছে। শেষে একদিন দুজনের মাঝে কি ঝগড়া! মেয়েটাকে সেইদিন প্রথম কথা বলতে দেখলাম। লোকে বলে, মহী নাকি বাচ্চা-বাচ্চা করে ক্ষেপে গিয়েছিল। থাক, তুই এসব কথা শুনিস না।—'

'আঃ! বলো বলছি।' অনি অধীর হয়ে পড়ল।

www.MurchOna.com

'তারপর মহী মদ খেতে লাগল। প্রথমে লুকিয়ে লুকিয়ে খেত। কোথা থেকে ও একজন লোককে ধরে এনেছিল যে নাকি ছবির সামনে বসে ভূত নামাতে পারে। রোজ রাত্রে দরজা বন্ধ করে ওরা নাকি তোর মাকে নামাত। একদিন তোর মায়ের একটা ছবি বিরাট করে বাঁধিয়ে নিয়ে এসে খুব ধূপধুনো দিতে লাগল। জানলা দরজা বন্ধ করে দিল। নাকি ও তোর মায়ের সঙ্গে ওখানে এসেই কথা বলতে পারে। কত অন্যায় করেছে সব নাকি এখন খেয়াল পড়ছিল। তোর নতুন মা কেমন চুপচাপ হয়ে যেতে লাগল। একদিন ঘরে ঝাঁট দিতে গিয়ে আমি জানলাটা খুলেছিলাম, সে সময় ও মদ খেয়ে বাড়ি ফিরল। জানলা খোলা দেখে কি হম্বিতম্বি, আমি আর পারলাম না, বললাম, এরকম করলে আমি কর্তাবাবুকে সব বলে দেব। এই শুনে ও আমাকে মারতে লাগল। বলল, চাকর চাকরের মত থাকবি। একে মাতাল, তারপর ইদানীং ওর মাথার ঠিক নেই, আমি চুপচাপ মার খেতে লাগলাম। তাই দেখে নতুন বউ ছুটে এসে ওকে ধরতে মহী বলল, 'ও, খুব দরদ। এই মুহূর্তে তুই বেরিয়ে যা। আমি চলে এলাম।'

'আসার সময় কিছু বলল না?'

'তোর নতুন মা আমাকে অনেক করে বলেছিল, ক্ষমা চেয়েছিল মহীর হয়ে। কিন্তু যে বাড়িতে সারাজীবন কাটিয়ে এলাম নিজের দিকে না তাকিয়ে, সেই বাড়ির ছেলে চড় মারলে আর থাকা যায়। কর্তাবাবু যাওয়ার সময় আমার সব মাইনের টাকা মহীর কাছে দিয়ে গিয়েছিলেন, সেটা আর ফেরত নিইনি। চলে আসার সময় ও মনে করে দেয়নি। যদি কোনদিনই ইচ্ছে হয় তো দেবে, আমি চাইব না।'

'কেন চাইবে না, তোমার নিজের টাকা না?' শক্ত হয়ে গিয়েছিল অনি এসব কথা শুনে। ছোট মায়ের মুখের কাটা দাগটা যে কোত্থেকে এল এতক্ষণে বুঝতে আর অসুবিধে হচ্ছে না। অনি দেখল ও বাবার ওপর রাগতে পারছে না। অদ্ভুত নিরাসক্ত হয়ে বাবার মুখটা মনে করার চেষ্টা করল। বাবা যেন অনেক দূরের মানুষ, তাঁর কোন ব্যাপারই তাকে স্পর্শ করছে না। কিন্তু ছোটমায়ের জন্য ওর কষ্ট হতে লাগল। বাবা যখন বিয়ে করেছিল তখনও ওর কিছু মনে হয়নি, এখনও হল না। শুধু ওর মনে হল, ও বাড়িতে দুজন খুব কষ্ট পাচ্ছে, একজন ছোটমা আর একজন যাঁকে ছবিতে পুরে দরজা-জানলা বন্ধ করে রাখা হয়েছে।

অনি আবার প্রশ্নটা করতে ঝাড়িকাকু বলল, 'সব সময় কি চাওয়া যায়। টাকা চাইলেই তো ও চাকর বলে দিয়ে দিত। ও নিজে থেকেই দেবে।'

'দাদুকে বললে না কেন? তুমি তো জলপাইগুড়িতে যেতে পারতে!'

'লজ্জা করছিল। তাছাড়া এসব শুনলে কর্তাবাবু কষ্ট পাবে। তাই একজনকে দিয়ে কাল খবর পাঠিয়েছিলাম যে দেখা হলে বলতে যে মহীর খুব অসুখ।' এ বাড়ির ছেলে হয়ে মদ খায় কি করে? বড়দা যে ত্যাজ্যপুত্র হয়েছে ভুলে গেল! আর মহীর মত শান্ত ছেলে, আঃ! নিশ্চয় ভূতে পেয়েছে ওকে। এরকম হলে বাগানের কাজ থাকবে না ওর। লোকে বলছে ওর নাকি মাথার ঠিক নেই। আমি তো আর যাই না যে দেখব।'

অনি ঝাড়িকাকুর দিকে তাকাল। দাদুকে গিয়ে সব কথা বলতে হবে। শুনলে নিশ্চয়ই দাদু বাবাকে ত্যাজ্যপুত্র করে দেবেন। কিন্তু তাহলে ছোট মায়ের কি হবে? কি করা যায় বুঝতে পারছিল না অনি! বাবাকে কি ভূতে পেয়েছে? বন্ধ জানলা-দরজার অন্ধকার ঘরে বসে যদি মায়ের সঙ্গে কথা বলতে পারে, তবে তো সে মায়ের ভূত! কথাটা মনে হতেই ও হেসে ফেলল। মা কখনো ভূত হতে পারে না। ওসব বুজরুকি। ও ঠিক করল ব্যাপারটা কি আজ রাত্রে দেখবে!

কলোনির মুখটাতে এসে ঝাড়িকাকু কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিল ভবানীমাস্টার কোথায় থাকেন। আগে স্বর্গছেঁড়ার এই অঞ্চলটায় লোকবসতি ছিল না। ওপাশে হিন্দু পাড়ায় কুলিলাইনটা অবশ্য ছিল কিন্তু সে বানারহাটের রাস্তায়। এদিকটায় খুঁটিমারি ফরেস্টের গা ঘেঁষে স্বর্গছেঁড়া টি এস্টেটের অন্য প্রান্ত। খাসমহলের এই জায়গাগুলো তখন আগাছা জঙ্গলে ভরতি ছিল। সাতচল্লিশ সালের পর ওপারের মানুষেরা এপারে আসতে শুরু করলে এইসব জায়গাগুলোর চেহারা পাল্টে গেল রাতারাতি। অনি এই প্রথম এমন একটা জায়গায় এল যাকে কলোনি বলে। কলোনি শব্দটা এর আগে ও শোনেনি। ভেতরে ঢুকে ও দেখল সরু রাস্তার দুপাশে কাঠ আর টিনের ছোট ছোট বাড়ি, এর উঠোনের গায়ে ওর শোওয়ার ঘর। সদর অন্দর কিছু নেই। বোঝাই যায় যাঁরা এসেছেন তাঁরা বাধ্য হয়ে এখানে আছেন।

www.MurchOna.com

ছোট্ট একটা কাঠের বাড়ির গায়ে আলকাতরা বোলানো, দরজা বন্ধ, ওরা জানল এখানেই ভবানীমাস্টার থাকেন। একটা ভাঙা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওরা দরজার গায়ে এসে দেখল একটা মা-কুকুর তার তিন-চারটে বাচ্চাকে চোখ বুজে শুয়ে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছে। বোধহয় এসময় কারো আসার কথা নয় বলে সে খুব বিরক্ত হয়ে দুবার ডাকল। বন্ধ দরজায় শব্দ করতেই ভেতরে কেউ খুব আস্তে কিছু বলল। কয়েকটা বাচ্চা ওদের দেখছিল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে, তাদের একজন বলল, দরজা খোলাই আছে, জোরে ঠেললেই খুলে যাবে। সত্যি দরজাটা খোলাই ছিল। অনি ভেতরে ঢুকেই ভবানীমাস্টারকে দেখতে পেল। ঘাড় ঘুরিয়ে অতিকষ্টে দরজার দিকে ঠিকরে বেরোনো দুটো চোখে যিনি তাকিয়ে আছেন তাঁকে দেখে পাথর হয়ে গেল অনি। সমস্ত শরীর বিছানার সঙ্গে লেপ্টানো, বিছানাটা অপরিষ্কার। মাথার পেছনে জানলাটা খোলা।

'কে? সামনে এস—', অদ্ভুত একটা শব্দ বেরুল গলা থেকে। বুঝতে কষ্ট হয়।

অনি পায়ে পায়ে ভবানীমাস্টারের সামনে এল। ঝাড়িকাকু ঢুকল না ঘরে। অনি দেখল দুটো চোখ ক্রমশ তার মুখের ওপর স্থির হল এবং সেই চোখের দিকে বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না।

মাস্টারমশাইয়ের শরীর শুকিয়ে চিমসে হয়ে গেছে কিন্তু মুখখানা প্রায় একই রকম আছে। যদিও কাঁচাপাকা দাড়িতে সমস্ত মুখ ঢাকা তবু চিনতে কোন অসুবিধে হবার কথা নয়। একটা ঘড়ঘড়ে শব্দ বেরুল গলা থেকে, 'অ-নি-মে-ষ!'

তাড়াতাড়ি ঘাড় নাড়ল অনি, 'হ্যাঁ।' ভবানীমাস্টার তাকে চিনতে পেরেছেন।

'অ-নে-ক বড় হ-য়ে-ছ।' ঘড়ঘড় শব্দটা উচ্চারণের অনেকটা ঢেকে দিচ্ছিল। কথা বললে হয়তো কষ্ট বেড়ে যাবে, অনি বলল, 'কথা বলবেন না।'

ভবানীমাস্টার হাসলেন, 'প্যা-রা-লা-ইসিস।'

এমন সময় বাইরের থেকে একটা আওয়াজ ভেসে এল, 'কে আইছে জনলাম, দুদিন পরেই তো মরব, এখন আইয়া কামটা কি? অ। আপনারা আইছেন, উনার কেউ হন নাকি?'

সঙ্গে সঙ্গে ঝাড়িকাকুর গলা শুনল অনি, 'না, না। মাস্টারের ছাত্র এসেছে।'

উত্তরে সেই মহিলাকণ্ঠ বিরক্ত হল, 'এখন আর পড়াতেই পারব নাকি উনি! উনি যাইলে আমার পরান জুড়ায়, আর পারি না।'

ভবানীমাস্টার বললেন, 'তো-তো-মার মনে আ-ছে পতাকা তু-লে-ছিলে?'

অনি বলল, 'হ্যাঁ। আপনার সব কথা মনে আছে আমার।'

'বড় হও বাবা, বড় হও।' কথাটা বলতে বলতে চোখের কোল বেয়ে একটা সরু জলের ধারা বেরিয়ে এসে কানের দিকে চলে গেল। অনি আর দাঁড়াতে পারছিল না। শায়িত মানুষকে প্রণাম করতে নেই। ও চট করে এগিয়ে গিয়ে হাতের চেটো দিয়ে ভবানীমাস্টারের চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে দৌড়ে বাইরে চলে এল।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর কাঁঠাল গাছতলায় এসে দাঁড়াল অনি। বাড়ি ফেরার পর থেকে ছোট মার সঙ্গে কথাই হচ্ছে না প্রায়। এমন কি অনিকে খাবার দেবার সময় মনে হচ্ছিল রান্নাঘরে ওঁর খুব কাজ, সামনে দাঁড়িয়ে গল্প করার সময় পাচ্ছেন না। উঠোনে ডাঁই করা বাসন অথচ বাড়িতে কাজের লোক নেই—বাবার ওপর অনি ক্রমশ চটে যাচ্ছিল। ছোট মাকে এখন সব কাজ করতে হয়। বিয়ের পর পায়েসের বাটি হাতে নিয়ে ওর ঘরে আসা ছোট মার সঙ্গে এখন কেমন রোগা জিরজিরে হয়ে যাওয়া ছোট মার কোন মিল নেই। সত্যি বলতে কি ছোট মার জন্য ওর কষ্ট হচ্ছিল।

অনির খাওয়া হয়ে যাবার পর মহীতোষ এলেন। ভাগ্যিস একসঙ্গে খেতে বসা হয়নি। তখন বাবার পাশে চুপচাপ শব্দ না করে চিবিয়ে যাওয়া, একটা দমবন্ধ-করা পরিবেশে কথা না বলে খাবার গেলা—অনির মনে হল ও খুব বেঁচে গেছে। কাঁঠাল গাছতলায় দাঁড়িয়ে বাবার গলা শুনতে পেল সে, 'অনি কোথায়?' ছোট মার জবাবটা স্পষ্ট হল না। মহীতোষ গলা চড়িয়ে বললেন, 'এই রোদ্দুরে টো টো করে না ঘুরে মায়ের কাছে গিয়ে বসতে তো পারে। ভক্তি নেই, বুঝলে, আজকালকার ছেলেদের মাতৃভক্তি নেই।' ছোট মার গলা শোনা গেল না।

www.MurchOna.com

অনি ঘুরে দাঁড়াল। ও ভাবল চেঁচিয়ে বাবাকে বলে যে মাকে ও যে রকম ভালবাসে তা বাবা কল্পনা করতে পারবে না। কিন্তু বলার মুহূর্তে যেন অনির মনে হল কেউ যেন তাকে বলল, কি দরকার, কি দরকার! কিছুদিন হল অনি এই রকম একটা গলা মনে মনে শুনতে পায়। যখনই কোন সমস্যা বড় হয়ে ওঠে, তার খুব অভিমান বা রাগ হয়, তখনই কেউ একজন মনে মনে তাকে নিষেধ করে। এই নিষেধ যদি চুপচাপ মেনে নেওয়া যায়, তাহলে কোন ক্ষতি হয় না। ক'দিন আগে একটা ব্যাপার হয়েছিল। ওদের স্কুলে একজন নতুন টিচার এসেছেন দক্ষিনেশ্বর থেকে, খুব ভক্ত লোক। আর বেশ ভাল লেগেছিল দেখতে। একদিন হলঘরে প্রেয়ারের পর উনি ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে দিলেন 'ওঁ ভগবতে শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ।' ওরা ভেবেছিল এটা মাস্টারমশাই-এর নিছক খেয়াল। দিন সাতেক পরে হঠাৎ ক্লাসে এসে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন লাইনটা কার স্পষ্ট মনে আছে, কে লিখতে পারবে? কেউ খেয়াল করেনি, ফলে এখন ঠিকঠাক সাহস পাচ্ছিল না। অনি সঠিক জবাব দিতে উনি ওকে কাছে ডেকে বললেন, 'চিরকাল লাইনটা মনে রাখবে। সুখে কিংবা দুঃখে, বিপদে-আপদে মনে মনে লাইনটা বলে নিজের কপালে মা শব্দটা লিখবে। দেখবে তোমার অমঙ্গল হবে না।' কথাটা বলে ওর মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'রামকৃষ্ণ কে ছিলেন জানো তো?' ঘাড় নেড়েছিল অনি।

'গুড! তিনি ছিলেন পরম সত্য, পরম আনন্দ। তাঁর আলোর কাছে কোন আলো ঘেঁষতে পারে না।'

কথাগুলো তখন ভাল করে বুঝতে না পারলেও মনে মনে তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে নিয়েছিল অনি। তারপর থেকে এই প্রক্রিয়াটাকে অনেকবার কাজে লাগিয়েছে ও। যেমন, বিকেল ফুরিয়ে সন্ধ্যে হয়ে গেলে দেরি করে বাড়ি ফেরার জন্য বুকটা যখন ঢুকঢুক করে ওঠে চট করে ওই চারটে শব্দ আওড়ে কপালে মা লিখলে অনি লক্ষ্য করেছে কোন গোলমালে পড়তে হয় না। এই আজকে যখন ঝাড়িকাকুকে চৌমাথায় ছেড়ে ও বাড়ি ফিরল তখন মনে হচ্ছিল এখন বাবার মুখোমুখি হতে হবে, একসঙ্গে খেতে হবে। বাড়িতে ঢোকার আগে প্রক্রিয়াটা করতে ফাঁড়া কেটে গেল।

রামকৃষ্ণকে ভগবান মনে করে প্রণাম করার একটা কারণ থাকতে পারে কিন্তু এটা অনিমেষের কাছে স্পষ্ট নয় মাস্টারমশাই কেন 'মা' শব্দটা কপালে লিখতে বলেছিলেন? আশ্চর্য, শব্দটা লেখার পর সারা শরীরে মনে কেমন একটা নিশ্চিন্তি সৃষ্টি হয়।

সারা দুপুর ওর প্রায় টো-টো করেই কেটে গেল। ওদের বাড়ির পেছনের বাগানের সেই চেনা-চেনা গাছগুলো অদ্ভুত বড়সড় আর অগোছালো হয়ে গিয়েছে। সেই বুনো গাছগুলো যাদের বুকে জোনাকির মত হলুদ ফুল ফুটতো তেমনি ঠিকঠাক আছে। এই দুপুরে ঘুঘুগুলো একা একা হয়ে যায় কেন? এমন গলায় কি কষ্টের ডাক যে ডাকে! অনি ঘুরতে ঘুরতে নদীর কাছে এসে দেখল জলেরা এখনও তেমনি চুপচাপ বয়ে যায়।

একসময় সূর্যটা খুঁটিমারির জঙ্গলের ওপাশে মুখ ডোবালে স্বর্গছেঁড়া ছায়া-ছায়া হয়ে গেল। এখন একরাশ পাখির চিৎকার আর মদেসিয়া কুলিকামিনদের ভাঙা ভাঙা গান জানান দিচ্ছিল রাত আসছে। নদীর ধারে ধারে অনি চা-বাগানের মধ্যে চলে গিয়েছিল। ছোট ছোট পায়েচলা পথ, দু পাশে ঠাসবুনোট কোমরসমান চায়ের গাছে ফুল ফুটেছে, শেডট্রিগুলোতে ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়াপাখি বসে সবুজ করে দিয়েছে। এখন চা-বাগানের মধ্যে কেউ নেই। লাইনে ফেরার জন্য পথ সংক্ষেপ করে কোন কোন কামিন মাথায় বোঝা নিয়ে দূর দূর দিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ এই নির্জন পরিবেশে বিশাল সবুজের অঙ্গীভূত ঢেউ-এ দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে অনির মনে হতে লাগল ও খুব একা, ভীষণ একা। ওর মা নেই, বাবা নেই, কোন আত্মীয় বন্ধু নেই। ঠিক এই মুহূর্তে ও দাদু বা পিসীমার কথা ভাবতে চাইছিল না। ওঁদের বিরুদ্ধে অনির কোন অভিযোগ নেই। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওঁরা যেন কেমন চুপচাপ হয়ে যাচ্ছেন। পৃথিবীর কিছুই যেন তাঁদের স্পর্শ করে না তেমন করে। তোমাদের দুটো জননী, একজন গর্ভধারিণী অন্যজন ধরিত্রী—যিনি তোমাকে বুকে ধারণ করেছেন। নতুন স্যারের সেই কথাগুলো মনে হতেই এই নির্জন সন্ধ্যা-নামা সময়টায় চা-বাগানের ভিতর দিয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে গলা কাঁপিয়ে গাইতে লাগল, 'ধন-ধান্য-পুষ্প-ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা।'

sumanahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

না, বাড়িতে ইলেকট্রিক আসেনি। অনিরা প্রথম যখন জলপাইগুঁড়িতে গেল তখনই মহীতোষ সব বন্দোবস্ত করে কলকাতা থেকে ডায়নামো আনবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা আসেনি। ফলে এখন রাত্রে এ বাড়িতে হ্যারিকেন জ্বলে। দুটো নতুন জিনিস দেখল অনি, সন্ধ্যে চলে গেলেও ক্লাবঘরে হ্যাজাক জ্বলল না, কেউ এল না তাস খেলতে। আর সব বাবুরা সাইকেলে চেপে টর্চ জ্বালতে জ্বালতে যে যার কোয়ার্টারে ফিরে গেলেও মহীতোষ ফিরলেন না। অথচ রাত হয়ে গেছে বেশ, চা-বাগানে যে রাতটায় কুলি লাইনে মাদল বাজা শুরু হয়ে যায়। অনি ঠিক বুঝতে পারছিল না ও কোন ঘরে থাকবে। যদি বাইরের ঘরে থাকতে হয় তা হলে মহীতোষ ফেরার আগেই খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়লেই ভাল। সন্ধ্যের পর বাড়ি ফিরলে ছোট মা একবার জিজ্ঞাসা করেছিল, 'খাবে না?' সত্যি সারাদিন এত ঘুরেও একটুও ক্ষিদে পায়নি অনির। ও না বলেছিল, ছোট মা আর কথা বাড়ায়নি। সামনের মাঠে গাঢ় অন্ধকার নেমেছে। আসাম রোড দিয়ে মাঝে মাঝে হুস হুস করে হেডলাইট জ্বালিয়ে গাড়ি ছুটে যাচ্ছে। অনি ঠিক করল কাল সকালের ফার্স্ট বাসে ও জলপাইগুড়ি ফিরে যাবে।

একটু বাদে ও খিড়কি দরজা খুলে উঠোন পেরিয়ে ভেতরে এল। ঘরের মধ্যে দিয়ে এলে মায়ের ছবির ঘরটা পার হতে হবে যেটা অনি কিছুতেই চাইছিল না। রান্নাঘরের বারান্দায় উঠে ও দেখল দরজাটা খোলা। ভিতরে কাঠের উনুনে কিছু একটা ফুটছে আর উনুনের পাশে উবু হয়ে গালে হাত দিয়ে ছোট মা বসে আছে। জ্বলন্ত কাঠের লাল আগুনের আভা এসে পড়েছে গালে, স্থির হয়ে কোন ভাবনায় ডুবে থাকা চোখের পাতায়, চুলে, কাপড়ে। চারপাশের অন্ধকারে ছোট মাকে কাঠের উনুনের আঁচ মেখে এখন একদম অন্য রকম দেখাচ্ছিল। অনি এসে দরজায় দাঁড়াতেও ছোট মার হুঁস হল না। ভাগ্যিস এখানে চুরিচামারি বড় একটা হয় না।

অনি রান্নাঘরে ঢুকতে ছোট মা চমকে সোজা হয়ে বসল, তারপর অনিকে দেখে আঁচলটা ঠিক করে নিল, 'ওমা তুমি? সারাদিন কোথায় ছিলে?'

'ঘুরছিলাম।' অনি খুব আস্তে উত্তরটা দিল। ও রান্নাঘরটা দেখছিল। মা যখন ছিল তখন এরকম ব্যবস্থা ছিল না। বোধ হয় কাজ করার সুবিধে অনুযায়ী মানুষ সব কিছু নিজের মত করে নেয়। ছোট মা ওর মুখের ওপর দৃষ্টিটা রেখেছিল, চোখাচোখি হতে বলল, 'খিদে পেয়েছে?'

অনি ঘাড় নাড়ল, 'না। আচ্ছা, একটা লম্বা কাঠের পিঁড়ি ছিল, ওপরে গোলাপের ফুল আঁকা, সেটা কোথায়?'

অবাক হল ছোট মা, 'কেন?'

অনি বলল, 'ঐ পিঁড়িটায় আমি বসতাম। রাত্তির বেলায় খুব ঘুম পেয়ে গেলে এই ঘরে পিঁড়িটায় বসে খেয়ে নিতাম।'

কথা শুনে ছোট মা হাসল, তারপর উঠে পাশের ঘরে গিয়ে সেই পিঁড়িটাকে এনে মাটিতে পেতে দিল, 'বোস, গল্প করি।'

অনি পিঁড়িটায় বসে বেশ আরাম পেল, 'আজকাল ক্লাবে তাস খেলা হয় না?'

প্রশ্নটা করতেই ছোট মা ঘাড় নাড়ল, 'না।'

'কেন?'

তরকারিতে হয়তো খুন্তি চালাবার কোন দরকার ছিল না, তবু ছোট মা সেটা নিয়ে কিছুক্ষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ল, তারপর বলল, 'জানি না।'

'বাবা কখন আসবে?'

অনির দিকে পেছন ফিরে তরকারি নামাতে নামাতে ছোট মা বলল, 'ওঁর ফিরতে দেরি হবে, তুমি খেয়ে শুয়ে পড়। কালকে আবার যেতে হবে তো।'

এখানে থাকতে যদিও তার একটুও ইচ্ছা করছিল না তবুও এখন অনির কেমন রাগ হয়ে গেল, 'বাঃ, তুমি তো আমাকে একসময় আসবার জন্য চিঠি লিখেছিলে, এখন চলে যেতে বলছ কেন?'

মুখটা পলকে কালো হয়ে গেল ছোট মার। অনি দেখল, নিজেকে খুব কষ্টে সামলে নিচ্ছে ছোট মা। তারপর বলল, 'তখন তো তোমার এত পড়াশুনা ছিল না।'

হঠাৎ সোজা হয়ে বসল অনি, 'ঝাড়িকাকুকে বাবা তাড়িয়ে দিয়েছে কেন?'

ছোট মা দু চোখ তুলে ওকে দেখল, 'তাড়িয়ে দিয়েছে কে বলল?'

www.MurchOna.com

'আমার সঙ্গে ঝাড়িকাকুর দেখা হয়েছিল।' অনির কেমন জেদ ধরে যাচ্ছিল। ছোট মা কি ওকে খুব বাচ্চা ভেবেছে? এভাবে কথা লুকিয়ে যাচ্ছে কেন?

'এসব কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করো না, আমি বলতে পারব না।'

'তুমি আমাকে বন্ধু বলেছিলে না?'

ছোট মা কোন উত্তর দিল না। উঁচু করে রাখা দুটো হাঁটুর ওপর গাল রেখে চুপ করে রইল। অনি বলল, 'বাবা আগে এমন ছিল না, মা থাকতে বাবা একদম অন্য রকম ছিল।'

খুব গাঢ় গলায় ছোট মা বলল, 'কি জানি! বোধ হয় আমি খারাপ, তাই।'

উত্তেজনায় সোজা হয়ে বসল অনি, 'তুমি মিথ্যা কথা বলছ।'

হঠাৎ ঝট করে উঠে বসল ছোট মা, 'বেশ, আমি মিথ্যা কথা বলছি। আমার খুশী তাই বলছি।'

'কেন? মিথ্যে কথা বললে—।' অনি কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। কেউ অন্যায় করছে এবং এরকম জেদের সঙ্গে স্বীকার করছে—কখনো দ্যাখেনি সে।

খুব কাটা-কাটা গলায় ছোট মা বলল, 'উনি যা করছেন করুন তবু আমাকে এখানে থাকতে হবে। আমার পেটে বিদ্যে নেই যে রোজগার করব। ভাইদের কাছে গলগ্রহ হয়ে থাকার চেয়ে এখানে অপমান সহ্য করা অনেক সুখের। নিজের জন্যে মিথ্যে বলতে হবে, আমাকে আর প্রশ্ন করবে না তুমি।'

অনি চুপ করে গেল। ছোট মার কথাগুলো বুঝে উঠতে সময় লাগল। ওর হঠাৎ মনে হল এতক্ষণ ও যে-ভাবে কথা বলেছে সেটা ঠিক হয়নি। জলপাইগুড়িতে প্রথম পরিচয়ের দিন যাকে বন্ধু এবং নিজের চৌহদ্দির মধ্যে বলে মনে হয়েছিল, এখন এই রাত্রে তাকে ভীষণ অচেনা মনে হতে লাগল। কিন্তু ছোট মা তাকে একটা চূড়ান্ত সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। বাবার এই সব কাজ না বলে অত্যাচার বলা ভাল, ছোট মাকে মুখ বুজে সহ্য করতে হচ্ছে তার ভাইদের কাছে গিয়ে থাকা সম্ভব নয় বলে। ছোট মা যদি লেখাপড়া শিখতো তাহলে চাকরি করতে পারত, সেটাও সম্ভব নয়। আচ্ছা, আজ যদি বাবা তাকে—। সঙ্গে সঙ্গে অনি যেন চোখের সামনে সরিৎশেখরকে দেখতে পেল, পেয়ে বুকে বল এল। দাদু জীবিত থাকতে তার কোন ভয় নেই। কিন্তু দাদুকে আজকাল কেমন অসহায় লাগে মাঝে মাঝে, পিসীমার সঙ্গে টাকাপয়সা নিয়ে প্রায়ই কথা-কাটাকাটি হয়। হোক, তবু তার দাদু আছে কিন্তু ছোট মার কেউ নেই। ও গম্ভীর গলায় বলল, 'তুমি চিন্তা করো না। আমি পাস করে চাকরি করলে তুমি আমার কাছে গিয়ে থাকবে। বাবা কিছু করতে পারবে না।'

উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে ছোট মা বলল, 'ছি! বাবাকে কখনো অসম্মানের চোখে দেখতে নেই, ভুল বুঝতে পারলে তিনি ঠিক হয়ে যাবেন।'

অনি কিছুতেই বুঝতে পারছিল না, বাবার বিরুদ্ধে কিছু বললেই ছোট মা একদম সমর্থন করে না কেন? ছোট মা উঠে মিটসেফ থেকে একটা বিরাট জামবাটি বের করে ওর সামনে এনে রাখল, 'তোমার জন্যে করেছি। বাড়িতে তো আর দুধ হয় না, অনেক কষ্টে এটুকু যোগাড় করতে পেরেছি।' অনি দেখল জামবাটির বুক-টেটম্বুর পায়েসের ওপর কিসমিসগুলো ফুলে ফেঁপে ঢোল হয়ে আছে, একটা তেজপাতা তিনভাগ শরীর ডুবিয়ে কালো মুখ বের করে আছে। চোখাচোখি হতে ছোট মা বলল, 'ভাল না হলেও খেতে হবে অনি, দিদির মত হয়নি আমি জানি।'

অনি হাসল, ছোট মা সেই প্রথম দিনের কথাটা এখনও মনে রেখেছে।

'এ বেলা একদম নিরামিষ, তোমার খেতে অসুবিধে হবে খুব।'

ছোট মার কথা শুনে হাসল অনি, 'এতখানি পায়েস পেলে আমার কোন খাবারের আর দরকার নেই।' একটা চা-চামচ দিয়ে ধারের দিকের একটু পায়েস নিয়ে মুখে দিয়ে বলল, 'ফাইন।' তারপর চোখ বুজে সেটাকে ভালভাবে গলাধঃকরণ করে বলল, 'পিসীমার চেয়ে একটু কম ভাল হয়েছে, তবে মায়ের চেয়ে অনেক ভাল। পিসীমা ফার্স্ট, তুমি সেকেন্ড, মা থার্ড।'

অনির কথা শুনে বেশ মজা পাচ্ছিল ছোট মা। সারাদিন এবং সেই একটু আগেও যে অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, ছেলেটা খেতে আরম্ভ করার পর থেকে সেটা টুপ করে চলে গেল। যে যা ভালোবাসে তাকে সেটা তৈরী করে খাওয়াতে যে এত ভাল লাগে এর আগে এমন করে জানা ছিল না। কি তৃপ্তির সঙ্গে খাচ্ছে ছেলেটা। আর এই সময় প্রচন্ড জোরে একটা শব্দ উঠল, কেউ যেন মনের সুখে দরজায় লাথি মারছে। খেতে খেতে চমকে উঠে অনি বলল, 'কিসের শব্দ?'

www.MurchOna.com

ছোট মার খুশীর মুখটা মুহূর্তেই কালো হয়ে গেল যেন, রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে কোনরকমে বলে গেল, 'তুমি খাও, আমি আসছি।'

শব্দটা থামছে না, ঘড়ির আওয়াজের মত বেজে যাচ্ছে। তারপর দরজা খোলার শব্দ হতে একটা হুঙ্কার এদিকে ভেসে এল। খাওয়ার কথা ভুলে গিয়ে অনি সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল, তারপর এক ছুটে বাঁধানো উঠোন পেরিয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ল। ছোট মার ঘরে একটা ছোট্ট ডিমবাতি জ্বলছে, এত অল্প আলো যে চলতে অসুবিধে হয়। মায়ের ছবির ঘরের দরজায় এসে থমকে দাঁড়াল ও। বাবা কথা বলছেন, জড়িয়ে জড়িয়ে, কোন কথার শেষটা ঠিক থাকছে না, 'কোথায় আড্ডা মারছিলে, আমি দুঘন্টা ধরে নক করছি খেয়াল নেই, অ্যাঁ?'

ছোট মা বলল, 'অনিকে খেতে দিচ্ছিলাম!'

'অনি? হু ইজ অনি? মাই সন? সন বড় না ফাদার বড়, অ্যাঁ? আমার আসবার সময় কেন দরজায় বসে থাকোনি, অ্যাঁ?'

ছোট মা খুব আস্তে বলল, 'কাল ছেলেটা চলে যাবে, আজকের রাতটায় এসব না করলেই নয়?'

'জ্ঞান দিচ্ছ? সেদিনকার ছুঁড়ি আমাকে জ্ঞান দিচ্ছে, অ্যাঁ! বিনে পয়সায় মা হয়েছ, মা-গিরি দেখাচ্ছ? ভাল, ভাল। মাধু গিয়ে আচ্ছা প্রতিশোধ নিয়েছে। নইলে একটা বাঁজা মেয়েছেলে কপালে জুটল!' গলাটা টলতে টলতে মায়ের ঘরে চলে এল, 'অ্যাই, ধূপ জ্বলছে না কেন?'

ছোট মা দৌড়ে মহীতোষের পাশ দিয়ে এসে বোধ হয় ধূপ জ্বেলে দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ তার গলা থেকে একটা আর্তনাদ উঠল, 'উঃ!'

কৌতূহলে অনিমেষ এক পা বাড়াতেই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। ছোট মার ডান হাতের কব্জিটা বাবার মুঠোয় ধরা, বাবা সেটাকে মোচড়াচ্ছেন। সমস্ত শরীর বেঁকিয়ে ছাড়বার চেষ্টা করেও পারছে না ছোট মা। বাবা সামনের দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'শাস্তি দিচ্ছি, অন্যায় করলেই শাস্তি পেতে হবে, হুঁ হুঁ বাবা!'

বাবার দৃষ্টি অনুসরণ করে অনি মাধুরীর ছবিটা দেখতে পেল। অতবড় ছবিটার ওপর দুটো চাইনিজ লণ্ঠনের আলো পড়ায় মুখটা একদম জীবন্ত। সকালে ছবিটায় অদ্ভুত একটা বিমর্ষ ভাব দেখতে পেয়েছিল অনি, এখন সেটা নেই যেন। বরং উল্লাসময় এক ধরনের উপভোগ করার অভিব্যক্তি মায়ের মুখে। চোখ দুটো কি খুব চকচক করছে! না, আলো পড়ায় ওরকম হয়েছে। ছবির মাকে ওর একদম পছন্দ হচ্ছিল না! ও মহীতোষের দিকে তাকাল। এখনও উনি ছোট মাকে শাস্তি দিয়ে যাচ্ছেন, ছোট মা ইচ্ছে করলে ঠেলে ফেলে দিতে পারেন বাবাকে কিন্তু দিচ্ছে না। অনি যেন শুনতে পেল কে যেন তার কানের কাছে বলে গেল, বল, বল ভয় কিসের? অনি সঙ্গে সঙ্গে মহীতোষকে বলল, 'ছোট মাকে মারছেন কেন?'

মহীতোষ পাথরের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন, দু চোখ কুঁচকে লক্ষ্য করার চেষ্টা করলেন কে বলছে। এই সময় তাঁর শরীরের নিম্নভাগ স্থির ছিল না। অনিকে চিনতে পেরে বললেন, 'আমি যে মারছি তোমাকে কে বলল? তোমার এই মা বলেছে? তুমি একে মা বল তো, অ্যাঁ?'

অনি দেখল ছোট মা সামান্য জোর দিয়ে নিজের হাতটা বাবার মুঠো থেকে ছাড়িয়ে নিল। মহীতোষ বলল, 'গতরে জোর হয়েছে দেখছি!'

'মেরে ছোট মার গালে দাগ কে করে দিয়েছে? অনি প্রশ্নটা এমন গলায় করল যে মহীতোষ প্রাণপণে সোজা হবার চেষ্টা করলেন। ছোট মা মুখে আঁচল দিয়ে বিস্ফারিত চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। দুই পা এগিয়ে এক হাত বাড়িয়ে মহীতোষ বললেন, 'অনি, পুত্র, পুত্র আমার! এখানে এস, এই বুকে মাথা রেখে শুনে যাও।'

অনি কিছু বোঝার আগেই মহীতোষ কয়েক পা টলতে টলতে হেঁটে এসে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। অনির স্পর্শ শরীরে পেতেই ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন তিনি, 'মাধু, দ্যাখো, কে আমার বুকে এসেছে, অ্যাঁ!'

এই প্রথম অনিমেষ জ্ঞানত পিতার আলিঙ্গন পেল এবং সেই আলিঙ্গনে ওর সমস্ত শরীর গুলিয়ে উঠল যেন। বাবার মুখ দিয়ে যে বিশ্রী ক্লেদাক্ত গন্ধ বের হচ্ছে তা সহ্য করতে পারছিল না অনি। তীক্ষ্ণ গলায় ও চিৎকার করে উঠল, 'আপনি মদ খেয়েছেন?'

www.MurchOna.com

প্রশ্নটা শুনেই ছোট মা পেছনে দাঁড়িয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল। মহীতোষ ছেলেকে জড়িয়ে ধরে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকে চমকে দিলেন, 'আঃ, ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ ক'রো না তো, পিতাপুত্রের কথাবার্তার মধ্যে ফ্যাঁচফ্যাঁচানি! হ্যাঁ বাবা, ইয়েস, আমি ড্রিঙ্ক করেছি। ইউ মে আস্ক মি, হোয়াই? লুক অ্যাট হার!' এক হাতের আঙ্গুল তীরের মত মাধুরীর ছবিটার দিকে বাড়িয়ে মহীতোষ বললেন, 'দ্যাখো ও কেমন খুশী হয়েছে। ইওর মাদার! তোমাকে ও পেটে ধরেছিল, হোলি মাদার। ওর খুশীর জন্য খেয়েছি।'

'আপনি কি ওঁর খুশীর জন্য ছোট মাকে মারেন?' গলাটা এত জোরে যে মহীতোষ দু হাতের মধ্যে দাঁড়ানো প্রায় তাঁর চিবুক অবধি লম্বা ছেলের মুখ দেখবার চেষ্টা করে বললেন, 'ইউ আনফেথফুল সন, কোনদিন নিজের মাকে ছোট করে দেখবে না। আমি প্রত্যেক রাত্রে মাধুরীর সঙ্গে কথা বলি। এখানে, এই ঘরে দাঁড়িয়ে, ডু ইউ নো?'

অনির আর সহ্য হচ্ছিল না গন্ধটা, এক ঝটকায় মহীতোষের হাতের আড়াল সরিয়ে ও বলল, 'আমার মা কখনো পেত্নী হতে পারেন না। আপনি মিথ্যে বলছেন!'

'কি? আমি মিথ্যে বলছি? আমি মিথ্যে বলছি!' হাত বাড়িয়ে খিমছে ধরলেন মহীতোষ ছেলেকে। মাতাল হলেও বাবার গায়ের জোরের সঙ্গে পেরে উঠছিল না অনি, 'মাকে যদি আপনি এত ভালবাসেন, মা যদি—না, তাহলে আপনি মদ খেতেন না, ছোট মার উপর অত্যাচার করতেন না। শুনেছি ভূতে ধরলে মানুষ অন্যরকম হয়ে যায়, আপনার সেরকম হয়েছে।'

সঙ্গে সঙ্গে তাকে ছেড়ে দিয়ে মহীতোষ ছোট মার দিকে ছুটে গেলেন, 'তুমি ওকে এসব শিখিয়েছ, আমার ছেলেকে আমার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছ।'

দুহাতের আড়ালে মুখ রেখে ছোট মা সেই চাপা কান্নার মধ্যে গলা ডুবিয়ে বলে উঠল, 'আমি বলিনি, বিশ্বাস করো, আমি কিছু বলিনি।'

কিন্তু কথাটা একদম বিশ্বাস করলেন না মহীতোষ, রাগে উন্মাদ হয়ে বলে চললেন, 'কাল সকালে বেরিয়ে যাবে, তোমাকে আমার দরকার নেই, একটি বাঁজা মেয়েছেলের মুখ দেখা পাপ। তোমার জন্য সে এই কয় বছর আমার কাছে আসছিল না, তুমি আমার ছেলেকে—।'

প্রচন্ডভাবে মাথা নেড়ে হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে কেঁদে উঠল ছোট মা, 'আমি কাউকে কিছু বলিনি।'

বোধ হয় সমস্ত শরীরের ওজন দিয়ে মহীতোষ ডান হাতখানা শূন্যে তুলেছিলেন, যেটার লক্ষ্য ছিলো ছোট মার গাল। ঠিক সেই পলকে অনিমেষ যেন শুনতে পেল, যাও, ছুটে যাও। কিছু বোঝার আগেই সে তীরের মতো এগিয়ে গিয়ে মহীতোষের ডান হাত চেপে ধরে ওদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল। ব্যালেন্স সামলাতে না পেরে মহীতোষ ছেলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছিলেন, অনি নিজেকে বাঁচাতে সরে দাঁড়াতেই নেশাগ্রস্ত শরীরটা দুম করে মাটিতে পড়ে গেল। পড়ে যাওয়াটা এত দ্রুত ঘটে গেল এবং একটা মানুষ যে পুতুলের মত সোজা চিৎ হয়ে পড়তে পারে অনি বুঝতে পারেনি। মেঝের ওপর পড়ে থাকা নিথর শরীরটার দিকে ওরা বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে ছিল। যেন বিশ্বাস করাই যায় না যে এই লোকটাই এতক্ষণ এখানে ছিল। অনির আগে ছোট মা চিৎকার করে ছুটে গেলেন মহীতোষের কাছে। অনি দেখল ছোট মা বাবার মাথাটা কোলের ওপর নিয়ে প্রাণপণে ডাকছেন। বাবার মাথাটা একটা পাশ বার বার ঘুরে যাচ্ছে। যন্ত্রণায় ঠোঁট দুটো বেঁকে গেছে। হাত-পা টান-টান, শরীরে কোন আলোড়ন নেই। প্রথমে সন্দেহের চোখে তাকাচ্ছিল অনিমেষ, বাবার ওপর আর কোনরকম শ্রদ্ধা ছিল না তার, এই মুহূর্তে। বাবা মদ খায়, ছোট মাকে মারে, আর মৃতা মায়ের নাম করে যা ইচ্ছে বলে—। এখন যে এভাবে পড়ে আছে তা স্বাভাবিক নয়। বাবার জোরের সঙ্গে সে পারবে না কিছুতেই, তাই ওই সামান্য ঠেলায় এভাবে পড়ে যাওয়াটাও বিশ্বাস করা যায় না।

'তুমি, তুমি ওকে মারলে?' হঠাৎ ফোঁস করে উঠল ছোট মা। থতমত হয়ে অনি দেখল বাবার মাথা থেকে বেরিয়ে আসা রক্ত ছোট মার শাড়ি ভিজে যাচ্ছে।

'আমি!' কোনরকমে বলল সে।

'কেন মাতাল মানুষটাকে ঠেলে দিলে! আমাকে মারলে তোমার কি এসে যেত, যদি আমাকে মেরে সুখ পায়, পাক না। তোমার কি তাতে?' নিজের আঁচলটা বাবার মাথায় চেপে ধরে ছোট মা ডুকরে ডুকরে কথাগুলো বলল।

www.MurchOna.com

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে অনি চারপাশে অনেকগুলো মুখ দেখল, নড়ে নড়ে ভেঙেচুরে যাচ্ছে। মুখগুলো কার? নাকি একজনের মুখ হাজার হয়ে যাচ্ছে! শিরশিরে একটা শীতল বোধ ওর শিরদাঁড়ায় উঠে এল। মুহূর্তেই কপাল ভিজে যাচ্ছে ঘামে। ও দেখল মায়ের ছবিটা বড় বেশী উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

অদ্ভুত একটা ভয় ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ও কি বাবাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল? না, কখনো নয়। গলা প্রায় বুজে যাচ্ছিল অনির, ও কথা বলল, 'বিশ্বাস করো আমি ইচ্ছে করে করিনি। আমি ভাবিনি, বাবা পড়ে যাবেন।'

হঠাৎ যেন ছোট মার গলার স্বর বদলে গেল। খুব ধীরে ছোট মা বলল, 'ওকে একটু ধরবে অনি। খাটের ওপর শুইয়ে দিই।'

মহীতোষকে শুইয়ে দিতে ওদের একটু কষ্ট হল, দেহটা বেশ ভারী। ছোট মার হাত মাথার কেটে যাওয়া জায়গায় আঁচল চেপে রেখেছে। অনি বলল, 'আমি একছুটে ডাক্তারবাবুকে ডেনে আনছি!'

ও যেই বেরুতে যাবে এমন সময় ছোট মার ডাক শুনল। দরজা অবধি পৌঁছে ঘুরে দাঁড়িয়ে পেছনে তাকাল সে। ছোট মার মুখটা অস্পষ্ট। পাশে বাবার শরীরটা আবছা দেখা যাচ্ছে। ওদের পেছনে দেওয়ালে মায়ের ছবিটা ঝকঝক করার সামনেটা কেমন হয়ে গিয়েছে। ছোট মা যেন অনেক দূর থেকে তাকে বলল, 'অনি, আমার একটা কথা রাখবে?'

গলার স্বরে এমন একটা মমতা ছিল যে অনি স্পষ্ট শুনতে পেল কে যেন তাকে বলছে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। ও বলল, 'হ্যাঁ।'

'তুমি সরে গিয়েছ বলে ও পড়ে গেছে এ কথা যেন কেউ জানতে না পারে, কেউ না।' ছোট মার প্রত্যেকটা কথা স্পষ্ট।

'মানে?'

'ও নিজেই তার সামলাতে পারেনি, এ কথা সবাই জানবে!'

'কিন্তু বাবা—?'

'মাতাল মানুষের কোন খেয়াল থাকে না। জেগে উঠলে যা বলব বিশ্বাস করবে।'

অনি বুঝতে পারছিল না কেন ছোট মা এ কথা বলছে। সবাই যদি শোনে অনি বাবাকে ফেলে দিয়েছে, তাহলে—। ওর বুকের ভেতর থেকে অনেক অনেকদিন পরে একটা কান্নার দমক উঠে এল গলায়, 'কেন?'

ছোট মা বলল, 'আমার জন্য। আর জানতে চেয়ো না। কেউ যেন জানতে না পারে, মনে থাকে যেন। যাও, দেরি করো না। ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনো।'

কখনো কখনো অন্ধকার বন্ধুর মত কাজ করে। এখন স্বর্গছেঁড়ায় গভীর রাত। ঘুটঘুটে অন্ধকারে জোনাকিরা ঘুরে বেড়ায়, লাইনে মাদল বাজে। সার দেওয়া কোয়ার্টারের দরজাগুলো বন্ধ। মাঠের মধ্যে দিয়ে দৌড়ে ডাক্তারবাবুর কোয়ার্টারের দিকে যেতে যেতে এই অন্ধকারটা যদি শেষ না হতো তাহলে যেন ও বেঁচে যেত। বাবার যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে কি করবে সে?

ডাক্তারবাবুর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ও বুক ভরে নিঃশ্বাস নিল। তারপর অন্ধকারে উচ্চারণ করল, 'ওঁ ভাগবতে শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ।' একটা ঘোরের মধ্যেও মা শব্দ আঙুলের ডগা গিয়ে কপালে লিখতেই অদ্ভুত শান্ত হয়ে গেল শরীরটা। মাধুরী ওকে জড়িয়ে ধরলে যেমন হতো।

নিশ্চিন্তে ডাক্তারবাবুর দরজার কড়া নাড়তে লাগল অনিমেষ।

॥ ৬ ॥

বালির চরের ওপর দিয়ে ওরা তিনজন হেঁটে যাচ্ছিল। এখন তিস্তার জল একটা খাতেই বয়ে যাচ্ছে, সেটা বার্নিশের দিকে। ফলে এদিকের বিরাট চরটা শুকিয়ে খটখট করছে। চরে নেমে কিছুটা গেলেই কাশ গাছের জঙ্গল চাপ বেঁধে ওপরে উঠে গেছে। জেলা স্কুলের মুখোমুখি নদীর বুকের জঙ্গলটা বেশ ঘন, দিব্যি লুকিয়ে থাকা যায়। মাঝে মাঝে পায়ে চলার পথ আছে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। সেনপাড়ার ওদিক থেকে গরীব মেয়েরা তিস্তায় কাঠ কুড়োতে যায়। পাহাড় থেকে ভেঙে পড়া গাছের শরীর তিস্তায়

www.MurchOna.com

ভাসতে ভাসতে আসে। মেয়েরা সাঁতরে সাঁতরে সারাদিন ধরে সেগুলো জড়ো করে নদীর ধারে। বিকেলে সেগুলো মাথায় মাথায় চলে যায় পাড়ায়। তারপর টুকরো হয়ে রোদে শুকিয়ে বাবুদের রান্নার জ্বালানির জন্য বিক্রি হয়ে যায়। জঙ্গলের যেখানে শুরু সেখানে কিছু লোক তরমুজের খেত করে দিনরাত পাহারা দেয়। এখন তরমুজ পাকার সময়। আর কদিন বাদেই জঙ্গলটা একদম সাদা হয়ে যাবে। দারুণ কাশফুল ফুটবে তখন।

অনি এর আগে দুই-তিনবার বালির চরে এসেছে, জঙ্গলে ঢোকেনি। মন্টুর এসব জায়গা খুব চেনা। প্রায়ই টিফিনের সময় স্কুল পালিয়ে ও একা একা এখানে ঘোরে। এই জঙ্গলে কোন হিংস্র জানোয়ার সচরাচর থাকে না কিন্তু শিয়াল তো আছে। মাঝে একবার তিস্তার জলে ভেসে এসে একটা বাচ্চা বাঘ এখানে লুকিয়ে ছিল। অতএব ভয় যে একদম নেই তা বলা চলে না। জঙ্গলে ঘুরে ও কি দ্যাখে কিছুতেই বলতে চায় না, জিজ্ঞসা করলে বিজ্ঞের মত হাসে। তপন থাকে আশ্রমপাড়ায়, সব কটা দেশাত্মবোধক গান ওর মুখস্থ। অথচ ও নতুন স্যারকে নিয়ে খারাপ খারাপ রসিকতা করে।

জঙ্গলে ঢোকার আগে তরমুজ খেত। পাকাপাকি কোন ব্যাপার নয়, জল এলেই পালিয়ে যেতে হবে তবু খেতের বাউণ্ডারী দেওয়া হয়েছে। মাঝে মাঝে খুঁটি পুঁতে সেগুলোর মধ্যে দড়ি বেঁধে দেওয়ায় আলাদা হয়েছে খেতগুলো। ওদের তিনজনকে বালির চর পেরিয়ে সেদিকে যেতে দেখে একজন হেঁকে উঠল, 'কে যায়? কারা যায়?'

মন্টু বলল, 'আমি গো বুড়োকর্তা। সঙ্গে আমার বন্ধুরা।'

অনি দেখল খেতের মধ্যে অনেক জায়গায় লাঠির ডগায় কাকতাড়ুয়ারা ছেঁড়া জামা পরে হাওয়ায় দুলছে। তেমনি একজন শুধু মাথায়, চোখ মুখ আঁকা কালো হাঁড়িটাই যা নেই, বালির ওপর উবু হয়ে বসে এক হাতের আড়ালে চোখের রোদ্দুর ঢেকে ওদের দেখছে। মন্টুর কথা শুনে একগাল হাসল বুড়ো, 'অ খোকাবাবু, তাই কও! এত চোরের আওন যাওন বাড়ছে আজকাল যে চিনতে পারি না। কালকের ফলটা মিষ্টি ছিল?'

'হ্যাঁ, খুব মিষ্টি ছিল।' মন্টু বলল।

'যাও কই?'

'এক আনি পয়সা আছে, একটা তরমুজ দেবে?'

বুড়ো হাসল, 'বোঝলাম।'

'তাহলে যাওয়ার সময় নিয়ে যাব, কেমন?' কথাটা বলে ও চাপা গলায় অনিদের বুঝিয়ে দিল, 'যাওয়ার সময় প্রত্যেকে একটা করে নিয়ে যাব, বুঝলি!'

তপন বলল, 'পয়সা?'

মন্টু খিঁচিয়ে উঠল, 'আমাকে পয়সা দেখাচ্ছিস? আমি তোদের মত বাচ্চা নাকি?'

জঙ্গলের ভিতর ঢুকে পড়লে আর হাকিমপাড়া দেখা যায় না। শুধু দূরে জেলা স্কুলের মত লাল ছাদটা চোখে পড়ে। জঙ্গল সরিয়ে সামান্য এগিয়ে একটা খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল ওরা। চারধারে জঙ্গল, মাঝখানে টাকের মত পরিষ্কার বালি। হঠাৎ মন্টু বলল, 'এই অনি, আজকে আমাকে কেমন দেখাচ্ছে বল তো!'

অনি মন্টুকে ভাল করে দেখল। ওর মাথার চুল বেশ কোঁকড়া, গায়ের রঙ খুব ফর্সা। কিন্তু ওকে তো অন্য রকম কিছু দেখাচ্ছে না। রোজকার মত য়ুনিফর্ম পরাই আছে। ওর মুখ দেখে মন্টু সেই বিজ্ঞের হাসিটা হাসল। এই হাসিটা দেখলে অনির নিজেকে খুব ছোট বলে মনে হয়। মন্টু ওদের বন্ধু, এক ক্লাসে পড়ে, কিন্তু ও অনির চেয়ে অনেক বেশী কিছু জানে। মন্টু হাসিটা শেষ করে জিজ্ঞাসা করল, 'আজকে আসবার সময় করবাড়ির দিকে তাকাসনি?'

অনি ঘাড় নেড়ে না বলল।

তপন বলল, 'মুডিং ক্যাসেল পায়চারি করছিল বারান্দায়।'

মন্টু বলল, 'জানলার ফাঁক দিয়ে রম্ভার চোখ দুটো তো দেখিসনি তোরা, আহা! তখনই বুঝতে পেরেছিলাম আমাকে আজ অন্যরকম দেখাচ্ছে!'

www.MurchOna.com

ওদের স্কুলের উল্টোদিকে যে বিরাট বাড়িটা অনেকখানি বাগান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেটা এখানকার মিউনিসিপ্যালিটির অন্যতম কর্তা শ্রীবিরাম কর মহাশয়ের। মন্টু একদিন ওকে দেখিয়েছিল বাড়ির গেটের গায়ে ওঁর নামের আগে কে যেন 'অ' অক্ষরটা লিখে গেছে। মানেটা ঠাওর করতে পারেনি প্রথমটায়। মন্টু বলেছিল, 'তুই একটা গাড়ল। নতুন স্যারের চ্যালা হয়ে বুদ্ধু রয়ে গেলি। তারপর মুখ খারাপ করে কথাটার মানে বুঝিয়ে দিয়েছিল। কান-টান লাল হয়ে গিয়েছিল অনিমেষের। অথচ মন্টু খারাপ ছেলে ভাবতে পারে না। ক্লাসে যে কোন প্রশ্নের উত্তর ঠিকঠাক দেয়। অ্যানুয়াল পরীক্ষার সময় ইচ্ছে করে দুটো উত্তর না লিখে ছেড়ে দেয় যাতে ফার্স্ট না হতে পারে। নতুন স্যার কারণটা জিজ্ঞেস করাতে ও বলেছিল, 'ফার্স্ট হলে ঝামেলা। ক্লাসের ক্যাপ্টেন হতে হয়, সবাই গুড বয় ভাবে।' সবাই অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে ছিল। নতুন স্যারও।

মন্টু যে সব খারাপ কথা জানে, অনিমেষ তা জানে না। সেই জন্যে মন্টু ওর চেয়ে যেন এক হাত এগিয়ে আছে। তপনটা মুখে কিছু বলে না। কিন্তু মন্টুর সব ইঙ্গিত ও চটপট বুঝতে পারে। আলাউদ্দিন খিলজীর চিতোর আক্রমণটা ক্লাসে পড়ানো হয়ে গেলে তপন আর মন্টু দুজনে মিলে দেবলাদেবীর নাচ ওদের দেখাল। নাচটা দেখতে খুব বিশ্রী, তখন মেয়েদের ঢং করে দেবলাদেবী সাজছিল আর মন্টু আলাউদ্দিন খিলজী। নাচ শেষ হলে মন্টু বিজ্ঞের মত জিজ্ঞাসা করেছিল, 'পৃথিবীতে সবচেয়ে আরাম কিসে পাওয়া যায়?

কে যেন বলেছিল, 'ঘুমুতে সবচেয়ে আরাম।'

পেটুক অজিত বচলেছিল, 'খুব পেটভরে রসগোল্লা খেতে দারুণ আরাম।'

তপন মাথা নেড়ে বলেছিল, 'ধুস। একবার খেলার মাঠে আমার পেট কামড়েছিল। উঃ, কি যন্ত্রণা। দৌড়ে বাড়ি ফিরছি, কপালে ঘাম জমে যাচ্ছে। তারপর একসময় আর পা যেন চলতে চায় না। যখন ল্যাট্রিন থেকে বেরিয়ে এলাম, ওঃ, তখন এত আরাম এত হাল্কা লাগল—এরকম আর হয় না।'

তপনের বলার ভঙ্গীতে ব্যাপারটা এত জীবন্ত ছিল সবাই যেন বুঝতে পেরে একমত হয়ে গেল। কিন্তু মন্টু বলল, 'তপন অনেকটা ঠিক কথা বলেছিস কিন্তু পুরো নয়। আচ্ছা অনিমেষ, ট্রয়ের যুদ্ধটা কার জন্য হয়েছিল?'

'হেলেনের জন্য।' তপন উত্তরটা দিয়ে দিল।

'লঙ্কাকাণ্ড?'

"সীতার জন্য।' উত্তরটা অনেকগুলো মুখ থেকে বুলেটের মত ছুটে এল।

'আলাউদ্দীন খিলজী কেন চিতোর আক্রমণ করেছিল?'

'পদ্মিনীর জন্য।'

সবাই হেসে উঠতেই মন্টু সেই বিজ্ঞের হাসিটা হেসে হাত তুলে ওদের থামাল, 'আমরা কেন মুভিং ক্যাসেলকে মাসিমা বলে ডাকি?'

এবার কিন্তু কোন শব্দ হল না, চট করে উত্তরটা খুঁজে না পেয়ে এ ওর মুখের দিকে চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। শুধু তপন খিকখিক করে হেসে উঠল। অনি বুঝতে পারছিল না এর সঙ্গে আরামের কি সম্পর্ক। মুভিং ক্যাসেল হল বিরাম কর মশাই-এর স্ত্রী। গোলগাল লম্বা এবং প্রচণ্ড ফরসা মহিলা। বাংলায় বলা হয় চলন্ত দুর্গ, পেছন থেকে দেখলে মনে হয় ওঁর শরীরের মধ্যে অনেকে লুকিয়ে থাকতে পারে। দারুণ সাজেন মহিলা, ওঁর মেয়েরাও ঠিক পাত্তা পায় না। জলপাইগুড়ি শহরের মেয়েরা খুব একটা উগ্র নয়, বরং স্কুলগুলোর সুবাদে একটা গোঁড়া রক্ষণশীল ভাব বজায় আছে। অবশ্য ইদানীং বাইরের কিছু মেয়ে আসার পর হাওয়া বদলাতে শুরু করলেও দেখলেই বোঝা যায় কে বাইরের! সেক্ষেত্রে মিসেস বিরাম কর যাঁকে সবাই মুভিং ক্যাসেল বলে সত্যিই ব্যতিক্রম। গায়ের রঙ ফরসা বলেই হাতকাটা লাল সরু ব্লাউজ যে ওঁকে মানাবে একথা ওঁর চেয়ে বেশী কেউ জানে না। অনি পেছন থেকে ওঁর রিকসায় চলে যাওয়া শরীর দেখে একদিন ভেবেছিল বোধ হয় চাপ-চাপ মাখন দিয়ে ওঁকে তৈরি করা হয়েছে। বিরাম কর মহাশয়ের নাম ছেলেরা রেখেছে ফড়িংদা। মন্টু বলে ওর এক দাদা নাকি বারো বছর আগে জেলা স্কুলে পড়ত, তারাও নাকি এই একই নামে ওঁদের ডেকে গেছে। মিউনি-

www.MurchOna.com

সিপ্যালিটির ইলেকশনের সময় ফড়িংদার চেয়ে মুভিং ক্যাসেলকে বেশী ব্যস্ত দেখায়। মুভিং ক্যাসেলের তিন মেয়েরই নাম, শুধু ওদেরই, জলপাইগুড়ি শহরে আর কারো নেই। তিনজনেই মায়ের কাছ থেকে গমের মত রং পেয়েছে, জেলা-স্কুলের ছেলেরা কাকে ফেলে কাকে দেখবে বুঝে উঠতে পারে না। মেয়েগুলো এমন নির্লিপ্তের মত তাকায় যে কাউকে দেখছে কিনা বুঝে ওঠা সম্ভব নয়। মন্টুর অবশ্য নিশ্চিত ধারণা যে রম্ভা ওর দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকে। রম্ভা সবচেয়ে ছোট। মেনকা উর্বশী রম্ভা। মেনকাই শুধু শাড়ি পরে। নতুন স্যারের সঙ্গে কর-বাড়ির খুব ভাল হয়েছে। হোস্টেলের ছেলেরা বলে প্রায়ই, নতুন স্যার রাত্রের মিল অফ করে মুভিং ক্যাসেলের নেমন্তন্ন খান। এখন তাই জলপাইগুড়ির দেওয়ালে দেওয়ালে নিশীথ+মেনকা লেখাটা দেখা যাচ্ছে। নতুন স্যারকে নিয়ে এসব ব্যাপার অনির খুব খারাপ লাগে।

মন্টু বলল, 'কেউ পারলি না তো! পারবি কি করে, তোরা তো আর নভেল পড়িস না!'

অনি বলল, 'এর সঙ্গে আরামের কি সম্বন্ধ?'

মন্টু হাসল, 'চিরকাল মেয়েদের জন্য যুদ্ধ হয়েছে, কত রাজ্য ছারখার হয়ে গিয়েছে, তাই তা থেকে যে আরাম হয় সেটার কোন তুলনা হয় না। মানুষ তো কষ্ট পাবার জন্য এসব করে না। সে তোরা ঠিক বুঝবি না।' সত্যি ব্যাপারটা ওরা ঠিক বুঝল না এবং অনি মনে মনে একমত হল না।

এখন তরমুজের খেত পেরিয়ে কাশবনের ভেতর সরু পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তপন বলল, 'গুল মারিস না। রম্ভা দেখেছে বলে তুই অন্যরকম হয়ে গেছিস, না? রম্ভা আজকাল আমার দিকেও তাকায়। আমি গান গাই জানে বোধ হয়।'

চট করে ঘুরে দাঁড়াল মন্টু, 'খুব খারাপ হয়ে যাবে তপন। মুখ সামলে কথা বলবি। রম্ভা ইজ মাই লাভার, আই লভ রম্ভা।'

ভেংচি কাটল তপন, 'ইস্! তুই জেনে বসে আছিস না যে রম্ভা তোকে ভালবাসে?'

একটু থতমত হয়ে মন্টু বলল, 'আমি বললেই বাসবে।'

তপন চিৎকার করে উঠল, 'এঃ, তোর কেনা চাকর না? যখনই হুকুম করবি তখনই ভালবাসবে! আবার ডাঁট মারা হচ্ছে!'

'আলবৎ মারব। তুই কি পুরুষমানুষ যে রম্ভা তোকে চাইবে? পরিস তো একটা ঢলঢলে প্যান্ট, আবার কথা!' মন্টুর কথাটা শুনে তপন হাঁ হয়ে গেল। অনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে ওদের কথা শুনছিল। ওর মনে হচ্ছিল যে কোন মুহূর্তে ওরা মারামারি শুরু করে দেবে। কার কথাটা যে সত্যি বুঝতে পারছিল না ও। এতদিন ধরে মিশে অনি ওদের এই ব্যাপারটার কথা একটুও টের পায়নি বলে নিজেই অবাক হচ্ছে।

তপন বলল, 'তুই পুরুষ নাকি? পুরুষ হলে দাড়ি কামায়, বুঝলি! তুই দাড়ি কামাস?'

মন্টু হঠাৎ খেপে গিয়ে দুই হাত আকাশে নেড়ে চ্যালেঞ্জ করে বসল, 'ঠিক আছে তপন, তুই যখন প্রমাণ চাস তো প্রমাণ দেব। অনি, তুই শুনলি সব, আমি চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করছি। বেশ তোর প্যান্ট খোল, আমরা দেখব।'

কেমন আমসি হয়ে গেল তপনের মুখ। বোধ হয় এত অবাক হয়ে গিয়েছিল যে কোন কথা বলতে পারল না। অনিও চমকে গিয়ে মন্টুর দিকে তাকাল।

সেইরকম বিজ্ঞের হাসি হাসল মন্টু, 'কাওয়ার্ড! শুধু মুখেই জগৎ জয় করিস। বেশ দ্যাখ আমার দিকে।' এই বলে ঝটপট করে ওর চাপা প্যান্ট খুলে ফেলল। প্যান্ট খোলার সময় অনি চট করে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল। ও দেখল মন্টু বালির ওপর ওর শার্ট প্যান্ট ছুঁড়ে দিল। তারপর শুনল মন্টু বলছে, 'এবার দ্যাখ।' খুব সঙ্কোচে মুখ ফেরাল অনি। কোমরে হাত রেখে গোড়ালি উঁচু করে ব্যায়ামবীরের মত মন্টু ঘুরে ঘুরে নিজেকে দেখাচ্ছে। ওর পরনে একটা সাদা ল্যাঙট, ব্যায়াম করার সময় অনেকে পরে। আর সঙ্গে সঙ্গে অনির খুব খারাপ লাগতে আরম্ভ করল। ওর নিজের একটাও জাঙ্গিয়া নেই, ল্যাঙট তো দূরের কথা। দাদু ওকে সুন্দর জামাকাপড় কিনে দেন কিন্তু ওর যে একটা জাঙ্গিয়া দরকার তা কারো খেয়াল হয় না। এখন এই মুহূর্তে ও অনুভব করল জাঙ্গিয়া ল্যাঙট না পরলে পুরুষমানুষ হওয়া যায় না। মন্টু বলল, 'দ্যাখ, পুরুষমানুষ কাকে বলে। তুই লাইফে ল্যাঙট পরেছিস?'

www.MurchOna.com

তপন খুব ঘাবড়ে গিয়েছিল। কি বলবে বুঝতে না পেরে অনির দিকে তাকল। তারপর মুখ নিচু করে ও বলল, 'বুদ্ধদেব বলেছেন মনটাই সব, শরীর কিছু নয়।'

'ওসব বাক্যি বইতে থাকে।' ফের জামাপ্যান্ট পরতে পরতে মন্টু বলল, 'রম্ভা যদি আমাকে এই ড্রেসে দেখত তাহলে একদম ম্যাড হয়ে যেত।'

কথাটা শুনে অনি হেসে ফেলল, 'ম্যাড হলে তো কামড়াবে!'

'দ্যুস! সে ম্যাড নাকি? তোদের সঙ্গে কথা বলে সুখ নেই।' তারপর গলার স্বর ভারী করে বলল, 'তপন, ফ্রেণ্ডশীপ রাখতে চাস তো ল্যাঙ মারতে যাস না। আমি তোর চেয়ে আগে পুরুষ হয়েছি, আমার চান্স আগে। একেই শালা আমি জ্বলে পুড়ে মরছি। কদমতলার একটা ছেলে রোজ বিকেলে ওদের বাড়ির সামনে নাকি তিনবার সাইকেলের বেল বাজিয়ে যায়। বল তোরা, এসব কি ভাল কথা?'

তপন যেন ততক্ষণ এইসব কথা কিছুই শুনতে পায়নি এমন ভান করে সামনের জঙ্গল দু'হাতে সরাতে সরাতে বলল, 'আর ফ্যাচফ্যাচ করিস না। যা দেখাবি বলেছিলি তা কোথায়, নাকি সব গুল?'

শার্টের বোতাম আটকে মন্টু বলল, 'এ শর্মা গুল মানে না। চল দেখাচ্ছি, এই যে অনিমেষচন্দর, চল, দেখব তোমার শরীর কেমন ঠাণ্ডা থাকে!' কথাটা শুনে অনিমেষের কান গরম হয়ে গেল আচমকা।

জঙ্গলটা ধরে খানিক এগোতেই কয়েকটা মিহি গলা শুনতে পেল অনিমেষ। আওয়াজটা কানে যেতে মন্টু হাত নেড়ে ওদের থামতে বলল। ও মুখে কোন কথা বলছে না কিন্তু ইশারা ইঙ্গিতে এমন একটা পরিবেশ চটপট তৈরী করে ফেলল যে অনিমেষের মনে হল ব্যাপারটা ভাল হচ্ছে না। মন্টু এখন প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে, ওরা পেছন পেছন। মাথার ওপর কাশগাছ ছাদের মত ছেয়ে রয়েছে, দূর থেকে কেউ ওদের বুঝতে পারবে না। হাঁটু দুটো ক্রমশ জ্বালা করতে লাগল বালিতে ঘষা লেগে। কি একটা সরসর করে ওদের পাশ দিয়ে দ্রুত চলে যেতে অনি ফিসফিস করে বলল, 'এই, আজ বাড়ি চল।'

তপন বলল, 'দূর বোকা, ওটা তো শিয়াল।'

মন্টু হাসল, 'ফক্স দেখে ভয় পাচ্ছিস, টাইগ্রেস দেখে কি করবি?' আর ঠিক সেই সময় একগাদা হাসি ছিটকে এল ওদের দিকে। মেয়েলি গলায় কে যেন কি একটা কথা বলে উঠল চেঁচিয়ে! আর একটু এগোতেই জঙ্গলটা পাতলা হয়ে এল। জলের শব্দ হচ্ছে ছলাৎ ছলাৎ করে। অনিমেষ দেখল মন্টু কাশগাছ সরিয়ে ছোট্ট একটা ফাঁক তৈরি করেছে। অনিমেষ আর তপন ওর পাশে মাথা রাখতেই পুরো নদীটা সিনেমার মত ওদের সামনে উঠে এল। তিস্তার জল এখন অত ঘোলা নয়, করলা নদীর চেয়ে একটু অপরিষ্কার। নদীটা এখানে বাঁক নিয়েছে সামান্য। প্রথমে কাউকে নজরে এল না অনিমেষের, শুধু একটা মেয়ে গান গাইছে এটা বুঝতে পারছিল। গানের সুরটা অদ্ভুত মিষ্টি অথচ কেমন কান্না-কান্না গলায় মেয়েটি গাইছে। ওকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না বটে কিন্তু বুঝতে অসুবিধে হয় না যে গাইছে তার খুব দুঃখ। আর এই সময় অন্য কেউ হাসাহাসি করছে না আগের মতন। শুধু ছলাৎ ছলাৎ শব্দ যেন সেই গানের সঙ্গে আবহ-সঙ্গীতের মত বেজে যাচ্ছিল। ভাল করে কান পাতল অনি, মেয়েটি গাইছে—

'এখে অঙ্গে এখ সঙ্গে
ওহে পরভু মুই
নাই রহিম মুই ঘরেরে পরভু,
হামু না যামু অরণ্যে জঙ্গলেরে।'

মন্টু ফিসফিসিয়ে বলল, 'মেয়েটা ঘরে থাকবে না বলছে, জঙ্গলে চলে যাবে রে।'

হঠাৎ তপন বাঁদিকে সরে গিয়ে জঙ্গলটা ফাঁক করল। করেই খুব উত্তেজিত হয়ে ওদের ডাকল। অনিমেষ নড়বার আগেই মন্টু ঝাঁপিয়ে পড়ে জায়গা করে নিয়েছে। ফুটোতে চোখ রেখে অনিমেষ দেখতে পেল প্রায় আট-দশজন মেয়ে ছোট ছোট কাঠ জল থেকে পাড়ে টেনে তুলছে। দুজন সাঁতরে নদীর মধ্যে চলে গেল। আর একটু দূরে বালির ওপর বসে জলে পা ডুবিয়ে একটি প্রৌঢ়া চোখ বন্ধ করে গান গাইছে যা ওরা এতক্ষণ শুনতে পাচ্ছিল।

মন্টু বলল, 'কি রে , কেমন দেখছিস?'

www.MurchOna.com

আর তখনই ওর নজরে পড়ল, মেয়েগুলোর কেউ শাড়ি জামা পরে নেই। কোমর থেকে একটা কাপড় গোল করে জড়িয়ে রেখেছে সবাই। ওপরে কাশগাছের গায়ে অনেকগুলো জামাকাপড় স্তূপ করে রাখা আছে, বোধ হয় জলে ভিজে যাবে বলে এই পোশাকে সবাই জলে নেমেছে। ওদের নিশ্চয়ই বেশী জামাকাপড় নেই। কিন্তু ওদের দিকে তাকিয়ে অনির কেমন লজ্জা-লজ্জা করতে লাগল। এখন এই নির্জন নদীর তীরে এতগুলো নারীর বিভিন্ন আকারের বুক দেখতে দেখতে ওর শরীরে অদ্ভুত একটা সিরসিরানি জন্ম নিল। তাকিয়ে থাকতে ওর ক্রমশ কষ্ট হতে লাগল, আর তখনি ওর কানে এল মন্টু বলছে, 'কিরে অনি, তোর মুখ এত লাল হয়ে গেল কি করে?'

তপন বলল, 'বেদিং বিউটি একেই বলে, আহা! থ্যাঙ্ক ইউ মন্টু।'

দূরে তিস্তার মধ্যিখানে সেই মেয়ে দুটো কিছু বলে চেঁচিয়ে উঠতে টপাটপ এরা কয়েকজন জলে ঝাঁপ দিল। অনি দেখল তিস্তার ঠিক মাঝবরাবর একটা বিরাট গাছের গুঁড়ি ভেসে যাচ্ছে। গুঁড়িটার অনেকখানি জলের নিচে ডোবা কিন্তু যেটুকু দেখা যাচ্ছে তা থেকে এর আকৃতিটা বোঝা যায়, এটাকে দেখতে পেয়েই মেয়েগুলোর মধ্যে দারুণ উল্লাস ছড়িয়ে পড়েছে। এতক্ষণ যে গান গাইছিল সে এখন উঠে দাঁড়িয়ে দুটো হাত মুখের দুপাশে আড়াল করে সাঁতরে যাওয়া মেয়েগুলোকে নির্দেশ দিচ্ছিল। আগের মেয়ে দুটো যে লম্বা লম্বা দড়ি কোমরে বেঁধে নিয়ে গিয়েছে অনি তা দ্যাখেনি। এখন সেগুলোর ডগা চটপট ভেসে যাওয়া গুঁড়িটার গায়ে গিঁট দিয়ে বেঁধে ফেলে ওরা নিশ্চিন্ত হল। গুঁড়িটা কিন্তু ভেসেই যাচ্ছে। ততক্ষণে অন্য মেয়েরা গিয়ে সেই দড়িগুলোর প্রান্ত ধরে ফেলেছে। হঠাৎ একটা অদ্ভুত সুরেলা চিৎকার থেমে থেমে ভেসে আসতে লাগল। গুঁড়িটা এত বড় যে মেয়েদের সরাসরি টেনে আনার সাধ্যি নেই। তাই ওরা ওটাকে স্রোতের টানে চলে যেতে দিয়ে মাঝে মাঝে হেঁচকা টানে একটু একটু করে তীরের দিকে সরিয়ে আনছে। আর টানবার সময় সেই সুরেলা চিৎকার বোধ হয় ওদের শক্তি যোগাচ্ছে বেশী করে। মগ্ন হয়ে ওদের পরিশ্রম দেখছিল অনি। মেয়েগুলোর শক্তি ওদের শরীর দেখে আঁচ করা যায় না।

নতুন স্যার কয়েক দিন আগে ওদের কয়েকজনকে নিয়ে শিকারপুর চা-বাগানের কাছে একটা জঙ্গলে গিয়েছিলেন। সেখানে একটা পড়ো মন্দির আছে। জলপাইগুড়ি থেকে যেতে খুব বেশী সময় লাগে না। মন্দিরটা তিস্তা থেকে খুব দূরে নয়। লোকে বলে ওটা নাকি দেবীচৌধুরাণীর প্রতিষ্ঠিত কালী মন্দির। ডাকাতি করার আগে এ অঞ্চলে এলে পূজো দিয়ে যেতেন। এই তিস্তার ওপর দিয়ে দেবীচৌধুরাণীর বজরা ভেসে যেত কল্পনা করতেও রোমাঞ্চ হয়। এখন ওর মনে হল এই সব মেয়েরা পরিশ্রমের দিক দিয়ে দেবীচৌধ্‌রাণীর চেয়ে একটুও কম নয়। গাছের গুঁড়িটা স্রোতের টানে ক্রমশ চোখের আড়ালে চলে গেলেও অনি বুঝতে পারল সেটা তীরের দিকে চলে এসেছে। এবার মেয়েগুলো যদি তীরের ওপর উঠে গুণ-টানার মত করে গুঁড়িটাকে এখানে টেনে নিয়ে আসে তাহলে ওদের নির্ঘাৎ দেখতে পাবে। বার্নিশ কিং সাহেবের ঘাটে গুণ-টানা দেখছে ও। এখান থেকে সরে যাওয়া দরকার। অনি পাশ ফিরে তাকিয়ে বন্ধুদের দেখতে পেল না। একটু আগেও ওরা এখানে ছিল, এত সন্তর্পণে এখান থেকে সরে গিয়েছে যে সে টের পায়নি। এদিকে মেয়েগুলোর চিৎকার বেশ দ্রুত এগিয়ে আসছে, বোঝা যাচ্ছে পাড়ে উঠে পড়েছে ওরা, এবার গুণ-টানা শুরু হবে।

মাথা নিচু করে ভেঙে-যাওয়া কাশবনের চিহ্ন দেখে ও জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়ল। খানিক দূর আসার পর ও বন্ধুদের দেখতে পেল। অনি যে পা টিপে টিপে ওদের পেছনে এসেছে তা যেন ওরা টের পেল না। দুজনেই হাঁটু গেড়ে বসে সব কিছু দেখছে। অনি তপনের পিঠের ওপর হাত রাখতেই ভীষণ চমকে উঠে ওকে দেখতে পেয়ে নিঃশ্বাস ফেলে সে, 'উঃ চমকে দিয়েছিলি!' কথাটা একটু জোর হয়ে যেতেই পাশ থেকে মন্টু ওর পেটে জোরে চিমটি কাটল। তপনের মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে ব্যথা লেগেছে খুব কিন্তু সেটা ও হজম করে নিল। কি দেখছে ওরা বোঝার জন্য অনি কাশবনের মধ্যে মাথা গলিয়ে দিল। প্রথমে বুঝতে পারেনি, পরে স্পষ্ট হল, সামনের এক চিলতে খোলা বালির ওপর দুটো শরীর প্রচণ্ড আক্রোশে কুস্তি লড়ছে। অনেকক্ষণ ধরে লড়াইটা হচ্ছিল। অনি দেখতে আসার সময়টায়

www.MurchOna.com

একজনকে প্রায় কব্জা করে ফেলেছে প্রতিদ্বন্দ্বী। এরকম এক নির্জন জঙ্গলের মধ্যে ওরা ক্লান্ত করছে কেন বুঝতে না পেরে অনি হাঁ করে দেখল বিজয়ী উঠে দাঁড়াল, বিজিত শুয়ে আছে চিৎ হয়ে বালিতে। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল অনি। এরা দুজনেই মেয়েমানুষ। যে শুয়ে আছে অসহায়ের ভঙ্গীতে, একটা হাত চোখের ওপর আড়াল করে, তার বয়স হয়েছে, শরীরটা কেমন ঢলঢলে। যে জিতল, তার উঠে দাঁড়ানোতে একটা গর্ব ফেটে পড়ছিল যা তার অল্প বয়সের সঙ্গে দারুণ মানিয়ে যাচ্ছিল। তার দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। খুব গর্বিত ভঙ্গিমায় সে ছেড়ে রাখা জামাকাপড় পরতে লাগল। হঠাৎ ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অনির মনে হল শরীরে যেন অনেক জ্বর এসে গেছে। গলা, জিভ শুকনো। একটু একটু করে কপালে ঘাম জমছে। পায়ে কোন সাড়া নেই। যুবতী যাবার সময় থুক করে শুয়ে থাকা প্রৌঢ়ার দিকে একদলা থুতু ফেলে চলে গেল, প্রৌঢ়া সেই ভঙ্গীতেই পড়ে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর হঠাৎ উপুড় হয়ে চাপা গলায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। মন্টু ফিসফিস করে বলল, 'বেচারা বরটাকে হারাল।' এর আগে কি কথা হয়েছে মেয়ে দুটোর মধ্যে অনি শোনেনি তাই মন্টু কথাটা বলতে ও ঠিক বুঝতে পারল না। কিন্তু ওর শরীর এরকম করছে কেন?

মানুষের শরীরের মধ্যে যে আর একটা শরীর আছে এই প্রথম অনিমেষ অনুভব করল। ওর সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল। হঠাৎ কি একটা বোধ ওর মেরুদণ্ডে টোকা মারতেই ও তীরের মত জঙ্গল ভেদ করে দৌড়াতে লাগল। পেছনে মন্টুর চাপা গলায় ডাক পড়ে থাকল। ওর হাত পা ছড়ে যাচ্ছিল কাশগাছে, কিন্তু তরমুজের খেত পেরিয়ে বালিতে না আসা অবধি ও থামল না।

এই শরীরটা ওর চেনা ছিল না আশ্চর্য, এই সময় ও আর কানের কাছে সেই গলাটা শুনতে পাচ্ছিল না যে তাকে মাঝে মাঝে সঠিক পথ বলে দেয়।

পেছন ফিরে তাকিয়ে ও কাউকে দেখতে পেল না। এই বিরাট ফাঁকা বালির চরে দাঁড়িয়ে ওর মনে হল আজ সে যে কাজটা করে ফেলেছে তা কাউকে বলা যাবে না। দাদু পিসীমাকে একথা বলাই যায় না। তা ছাড়া দাদু পিসীমার সঙ্গে ক্রমশ যে ব্যবধান হয়ে যাচ্ছে সেটা প্রতিদিন ও টের পাচ্ছে। বাবার সঙ্গে যোগাযোগের প্রশ্নই ওঠে না। সেই ঘটনার পর বাবা নাকি খুব চুপচাপ হয়ে গেছেন। জলপাইগুড়িতে যখন আসেন তখন গম্ভীর হয়ে থাকেন। এমন কি ছোট মাও যেন অন্য রকম হয়ে গেছে। সেই ঘটনার কথা ভুলেও তোলে না, প্রয়োজন ছাড়া কথা বলে না।

না, কেউ নেই। মা বলতেন কোন কথা লুকোবি না অনি, আমার কাছে সব কথা খুলে বললে কোন পাপ হবে না। অনেক দিন পর অনির বুকটা টনটন করতে লাগল মায়ের জন্য। যত দিন যাচ্ছে রাত্তিবেলায় আকাশের দিকে তাকালে তারাগুলো তারাই থেকে যাচ্ছে, সূর্যের মত সেগুলো এক-একটা নক্ষত্র জানার পর এখন আর মা ওর সঙ্গে মনে মনে কথা বলেন না।

অল্পবয়সী মেয়েটার শরীরটা যেন চোখের সামনে থেকে সরানো যাচ্ছে না। সেই অনেক দিন আগে দেখা কামিনটার কথা চট করে মনে পড়ে গেল আজ। তখন তো এমন হয়নি। তখন তো মাকে স্বচ্ছন্দে সব কথা খুলে বলতে পেরেছিল। চকিতে ও কপালে মা শব্দটা লিখে কয়েক বছর আগে শেখা রামকৃষ্ণের প্রণাম-মন্ত্রটা উচ্চারণ করল। এবং এবার আশ্চর্যভাবে কোন কাজ হল না। কি একটা আক্রোশে ও লাথি মেরে একগাদা বালি ছড়িয়ে নিজের অজান্তে জেলা স্কুলের দিকে দৌড়তে লাগল।

॥ ৭ ॥

জেলা স্কুলের পাশে তিস্তার কিনারে একটা নৌকো বালিতে আটক হয়ে আছে জল শুকিয়ে যাওয়া থেকে। অনেকটা পথ দৌড়ে অনিমেষ সেখানে এসে থামল। এখন সমস্ত শরীরে কুলকুল করে ঘাম নামছে, জোর ওঠানামা করছে বুকটা। ও নৌকোর গায়ে ঠেস দিয়ে অনেক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। মন্টু বা তপনকে এখনও দেখা যাচ্ছে না। মন্টুরা এখানে প্রায়ই আসে। কেন আসে তা এতদিন জানতো না সে, আজ জানতে পেরে নিজেকে আরো ছেলেমানুষ বলে মনে হচ্ছিল। ইদানীং স্বাস্থ্য ভাল হচ্ছে বুঝতে পারছে ও। রোজ সকাল বিকেল ফ্রি-হ্যাণ্ড এক্সারসাইজ করে বেশ খিদে পায়। হাত ভাঁজ করলে বাইসেপগুলো চমৎকার ফুলে ওঠে। নতুন স্যার বলেছেন যে জাতির স্বাস্থ্য নেই তাদের কিছুই নেই।

www.MurchOna.com

তাই প্রতিটি কিশোর নাগরিকের উচিত নিজের শরীরের প্রতি যত্ন নেওয়া। স্কুল-জিমনাসিয়ামে বিকেলবেলায় খুব ভিড় হচ্ছে আজকাল। তা মাথায় ও পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি ছুঁয়ে ফেলেছে। পড়ার ঘরে স্কেল দিয়ে দেওয়ালে ছোট ছোট করে মাপ দিয়ে মাঝে মাঝেই উচ্চতাটা জরিফ করে নেয় অনিমেষ। বন্ধুদের মধ্যে অনেকেরই গোঁপের রেখা দেখা গেছে, কিন্তু ওর মুখ একদম পরিষ্কার। পিসীমা বলেন মাকুন্দদের নাকি গোঁফদাড়ি হয় না, তাই ভোরবেলায় তাদের মুখ দর্শন করলে অযাত্রা হয়। কি করে হয় ওর মাথায় ঢোকে না। বাচ্চা ছেলের মুখ দেখলে যদি অযাত্রা না হবে তো বয়স্ক মানুষের গোঁফ ছাড়া মুখ দেখলে তা হবে কেন? তাহলে যাদের মাথা জুড়ে টাক, একটাও চুল নেই, তাদের দেখলেও অযাত্রা হবে? পিসীমার সঙ্গে ও প্রাণপণে এসব তর্ক চালিয়েও জিততে পারে না শেষ পর্যন্ত। পিসীমার শেষ অস্ত্র, তুই এখনও ছোট—এসব বুঝবি না। হঠাৎ হেসে ফেলে অনিমেষ, তারপর মনে মনে বলল, আজ থেকে আমি আর ছোট নই, আমি এখন বড় হয়ে গেছি। একদিন মন্টু বলেছিল পেন্সিলের মুখটা ব্লেডের গোল গর্তে টাইট করে চমৎকার গোঁফ কামানো যায়। অনিমেষ ঠিক করল এবার মাঝে মাঝে ও এই কায়দাটা করবে, তাহলে গোঁফ বেরুতে দেরি হবে না মোটেই। আর হ্যাঁ, ওর জমানো চার টাকা ছয় আনা দিয়ে একটা জাঙ্গিয়া কিনতে হবে। একা যেতে পারবে না সে, মন্টুকে নিয়ে যেতে হবে দিনবাজারে। জাঙ্গিয়া না পারলে পুরুষমানুষ হওয়া যায় না।

চুপচাপ ও জেলা স্কুলের পাশের রাস্তাটায় উঠে এল। এখন প্রায় বিকেল। আকাশ সামান্য মেঘলা বলে রোদটা মোটেই গায়ে লাগেনি এতক্ষণ। মাঠের পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে অনিমেষ দেখতে পেল নতুন স্যার ওকে হাত নেড়ে ডাকছেন। এইসময় নতুন স্যারকে এখানে দেখতে পাবে ভাবেনি অনিমেষ। এতদিন হয়ে গেল নিশীথবাবু এখানে আছেন, তবু নতুন স্যার নামটা আংটির মত ওঁর সঙ্গে এঁটে আছে। আর একটা মজার ব্যাপার এই যে, অনিমেষ এতটা বড় হল তবু নতুন স্যার একই রকম আছেন। চেহারায় একটুও বুড়ো হননি। অনিমেষ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে চোখ দিয়ে মেপে দেখেছে যে তার আর নতুন স্যারের উচ্চতায় পার্থক্য খুব বেশি নয়!

কাছাকাছি হতে নতুন স্যার বললেন, 'কোথায় গিয়েছিলে অনিমেষ?'

অনিমেষ বলল, 'তিস্তার চরে বেড়াতে।'

নতুন স্যার যেন অবাক হলেন প্রথমটায়, তারপর হাসলেন, 'ও, তরমুজ খেয়ে এলে বুঝি, ওরা প্রায়ই কম্‌প্লেন করে স্কুলের ছেলেরা নাকি চুরি করে তরমুজ নিয়ে আসে।'

অনিমেষ বলল, 'না, আমি তরমুজ খাইনি।'

নতুন স্যার কথাটা শুনে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বোধ হয় এ ব্যাপারে আর কথা বাড়াতে চাইলেন না, 'ও গুড, হ্যাঁ শোন, তোমাকে একটা কথা বলার আছে। তুমি তো এখন বড় হয়েছ, তোমার সঙ্গে আমি ফ্র্যাঙ্কলি সব কথা বলে আসছি এতকাল তাই এই ব্যাপারটা বলতে কোন সঙ্কোচ অবশ্য আমি বোধ করছি না। কিন্তু তোমাকে আশ্বাস দিতে হবে, এটা কাউকে বলবে না!'

নতুন স্যার ওর মুখের দিকে চেয়ে কথা শেষ করতে অনিমেষ অবাক হয়ে গেল। সেই ক্লাস থ্রি থেকে আজ অবধি কোনদিন নতুন স্যার ওর সঙ্গে এমনভাবে কথা বলেন নি। অনিমেষ খুব বিচলিত গলায় বলল, 'না, না, স্যার। আমি কাউকে বলব না, আপনি যা বলেন তা আমি কখনো অমান্য করি না।'

শেষ কথাটা বলতে গিয়ে অনিমেষ হঠাৎ আবিষ্কার করল ওর গলাটা কেমন অদ্ভুত শোনাল নিজের কাছেই। খুব খুশী হয়ে নতুন স্যার ওর কাঁধে একটা হাত রেখে বললেন, 'আমি জানি। এই স্কুলে তুমিই একমাত্র আমার তৈরী। আমি বিরামদাকে বলেছি তোমার কথা।' ওর সঙ্গে কয়েক পা হেঁটে হঠাৎ গলার স্বর পাল্টে নতুন স্যার বললেন, 'আচ্ছা মন্টু ছেলেটা কেমন?'

আচম্বিতে প্রশ্নটা আসায় থতমত হয়ে গেল অনিমেষ। ওর চট করে মন্টুর সেই জাঙ্গিয়া পরা পোজটা মনে পড়ল। পড়তেই ওর মুখ-চোখ গরম হয়ে গেল। 'কেন?' কোনরকমে বলল সে।

নতুন স্যার বললেন, 'ওর সম্পর্কে অনেকে অনেক কথা বলে। এই এত অল্প বয়সে ও দেশের কথা না ভেবে নোংরা আলোচনা করে শুনতে পাই। তুমি তো ওর সঙ্গে মেশো, তাই জিজ্ঞাসা করছি।'

www.MurchOna.com

কোনরকমেই অনিমেষ মিথ্যে কথা বলতে পারছিল না। আবার আশ্চর্য, সত্যি কথাটা বলতে ওর একটুও ইচ্ছা করছে না। আসলে মন্টু যা বলে এবং আজ একটু আগেও যা দেখিয়েছে তার মধ্যে এমন একটা সরলতা থাকে যে ব্যাপারটা খারাপ হলেও অনিমেষের মনে হয় না যে খারাপ। এখন মন্টুর বিরুদ্ধে কিছু বললে নতুন স্যার নিশ্চয়ই তা হেডস্যারকে বলবেন এবং তাহলে মন্টুর কাছে ও মুখ দেখাবে কি করে? এই সময় নতুন স্যার আবার বললেন, 'আমার সন্দেহ হচ্ছে বিরামদার বাড়ির সামনে অশ্লীল অক্ষরটা মন্টুই লেখে।'

সঙ্গে সঙ্গে সজোরে ঘাড় নাড়ল অনিমেষ, 'না না, একদম মিথ্যে কথা, মন্টু কখনো লিখতে পারে না।'

ওকে আপাদমস্তক দেখে নতুন স্যার বললেন, 'তুমি বলছ?'

বেশ আত্মপ্রত্যয় নিয়ে অনিমেষ জবাব দিল, 'হ্যাঁ।'

এই কথাটা ওকে মিথ্যে বলতে হচ্ছে না। কথা বলতে বলতে ওরা বিরামবাবুর গেটের সামনে এসে গিয়েছিল। সেদিকে তাকিয়ে বিরক্তিতে মুখটা বেঁকালেন নতুন স্যার। অনিমেষ দেখল এখন বিরামবাবুর নামের আগে কাঠকয়লা দিয়ে অ অক্ষরটা লেখা আছে। বেশ উত্তেজিত গলায় নতুন স্যার বললেন, 'দেখেছ, কি রুচি স্বাধীন ভারতের ছেলেদের! ছি ছি ছি! বিরামদার মত একজন রেসপেক্টবল কংগ্রেসী কি এখানকার ছেলেদের কাছে একটু সৌজন্য আশা করতে পারেন না? আচ্ছা লেখাটা কি তোমার পরিচিত মনে হচ্ছে অনিমেষ?'

অনিমেষ কিছুক্ষণ দেখে ঠাওর করতে পারল না। অ অক্ষরটা তো এইরকমই হয়। তাকে লিখতে বললেও সে এইরকম লিখত। সরলভাবে ঘাড় নাড়ল সে। নতুন স্যার কয়েক পা হেঁটে হাত দিয়ে অ-কে মুছতে চেষ্টা করতে সেটা কেমন ঝাপসা হয়ে ধেবড়ে গেল। তারপর রুমালে হাত মুছতে মুছতে বললেন, 'এই ব্যাপারটা আর বেশীদিন চলতে দেওয়া যায় না। যে করছে তাকে ধরতে হবে। এ ব্যাপারে তোমাদের সাহায্য চাই অনিমেষ।'

কি সাহায্য করবে বুঝতে না পেরেও ঘাড় নাড়ল অনিমেষ। আর এই সময় ও দেখল গেটের ভেতরে বাগানে একটা ছোট্ট কুকুরকে চেনে বেঁধে মুভিং ক্যাসেল হেঁটে আসছেন। মুভিং ক্যাসেলের তুলনায় কুকুরটা এত ছোট যে ব্যাপারটা মানাচ্ছিল না। টকটকে লাল শাড়ি পরেছেন মুভিং ক্যাসেল, চোখ টেনে নেয়। হঠাৎ গেটের কাছে ওদের দেখতে পেয়ে দ্রুত এগিয়ে এলেন তিনি, 'ওমা, নিশীথ! কখন এলে? সারাদিন তোমার কথা ভাবছিলাম। ওখানে দাঁড়িয়ে কেন ভাই, ভেতরে এস।'

গলার স্বরটা এত মিহি এবং মোলায়েম এবং কাঁপা-কাঁপা যে অনিমেষ আজ অবধি কাউকে এভাবে কথা বলতে শোনেনি। ও অবাক হয়ে শুনল নতুন স্যার এতক্ষণ যে গলায় কথা বলছিলেন তা যেন মুহূর্তেই উধাও হয়ে গেল। কেমন বিগলিত ভঙ্গীতে নতুন স্যার বললেন, 'একটু দেরি হয়ে গেল, বিরামদা আছেন?'

অদ্ভুত একটা ভঙ্গিমায় মুভিং ক্যাসেল বললেন, 'আঃ বিরামদা আর বিরামদা, আমার কাছে বুঝি আসতে নেই? আমি না থাকলে তোমাদের বিরামদা বিরামদা হতো? আরে, ভেতরে এসো না।'

চট করে গেট খুলে ভেতরে গিয়ে অনিমেষের কথা মনে পড়তে নতুন স্যার ঘুরে দাঁড়ালেন। মুভিং ক্যাসেল ব্যাপারটা বুঝতে পেরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ছেলেটি কে?'

নতুন স্যার বললেন, 'আমার ছাত্র অনিমেষ।'

"অ। তুমি একদিন এর কথা বলেছিলে, না? বেশ বেশ। খুব মিষ্টি দেখতে তো। বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? এসো না আমাদের বাড়িতে।' মুভিং ক্যাসেল মাথা নেড়ে অনিমেষকে ডাকলেন।

কি করবে বুঝতে পারছিল না অনিমেষ। ওর মনে হল এখন চলে যাওয়াই উচিত, নাহলে নতুন স্যার হয়তো বিরক্ত হবেন। কিন্তু ও কিছু বলার আগেই নতুন স্যার ওকে ডাকলেন, 'এসো অনিমেষ।'

অনিমেষ ভেতরে এসে গেটটা বন্ধ করতেই মুভিং ক্যাসেলের কুকুরটা ওর পায়ের কাছে শরীর ঘষতে লাগল। একরত্তি কুকুরটার কাণ্ড দেখে ও অবাক। মুভিং ক্যাসেল শরীর দুলিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, 'আমার জিমির দেখছি পছন্দ খুব। তোমাকে ওর খুব ভাল লেগেছে।' বলে চেনটা অনিমেষের হাতে দিয়ে দিলেন।

www.MurchOna.com

নতুন স্যার মুভিং ক্যাসেলের পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছেন বারান্দার দিকে, পেছন পেছন কুকুর নিয়ে অনিমেষ। কয়েক পা হেঁটে প্রকৃতির ডাক শুনতে পেল জিমি। পেছনের দুই পা ভেঙ্গে বসে জলবিয়োগ করতে লাগল সে। চেন হাতে দাঁড়িয়ে খুব অস্বস্তিতে পড়ল অনিমেষ। এখানেই মানুষের সঙ্গে পশুর তফাৎ, মনে মনে ভাবল সে, যতই আদর করুন মুভিং ক্যাসেল একে, সময় অসময় জ্ঞানটা শেখাতে পারবেন না। কুকুরটা আনন্দে গুট গুট করে চলতে শুরু করলে অনিমেষ বারান্দার দিকে হাঁটতে আরম্ভ করল। লম্বা বারান্দার তিন দিক মানিপ্লান্টে ঢাকা তবে ভেতরে দাঁড়ালে সামনের রাস্তা এমন কি ওদের স্কুলের বারান্দা স্পষ্ট দেখা যায়। একটা বেতের চেয়ার এক কোণে খালি পড়ে আছে। মুভিং ক্যাসেল অনিমেষের হাত থেকে চেনটা নিয়ে জিমির গলা থেকে খুলে সেটাকে চেয়ারের গায়ে ঝুলিয়ে রেখে দিলেন। জিমি এখন তাঁর বুকের ওপর গুটিসুটি মেরে বসে আছে। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে মুভিং ক্যাসেল ঘাড় নেড়ে ডাকলেন, 'এসো।'

দেওয়াল জুড়ে গান্ধীজীর ছবি। বাবু হয়ে বসে চরকা কাটছেন। মুখে এমন একটা প্রশান্তি আছে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। বিরাট ফ্রেমে হাতে আঁকা এরকম জীবন্ত ছবি এর আগে দ্যাখেনি অনিমেষ। এদিকের দেওয়ালে আলমারি আর তাতে মোটা মোটা বই ঠাসা। আলমারির সামনে সাদা রঙের বেতের সোফাসেট। তার একটিতে একজন প্রৌঢ় বসে আছেন। মাথার চুলে সামান্য পাক ধরেছে, খুব রোগা এবং বেঁটে মানুষ। গায়ে ফিনফিনে আদ্দির গিলে করা পাঞ্জাবি। ওদের দেখে সোজা হয়ে বসলেন, 'আরে নিশীথ যে, এস এস, তোমার কথাই ভাবছিলাম।'

গলার স্বর এত সরু যে চোখ বন্ধ করে শুনলে বোঝা যাবে না যে কোন পুরুষমানুষ কথা বলছে! কিন্তু সরু হলেও এঁর বলার ধরনে এমন একটা সুর আছে যে সহজেই আকৃষ্ট করে। নতুন স্যার সোফাটায় বসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'শরীর কেমন আছে বিরামদা?'

বিরামবাবু বললেন, 'আমার তো চিরকেলে হাঁপানী রোগ, বাতাস চললেই বাড়ে। ভাল আছি, বেশ আছি—যতটা থাকা যায়। কিন্তু কিছু ব্যবস্থা হল?'

নতুন স্যার বললেন, 'এখনও হয়নি, তবে অ্যাদ্দিন তো তেমন চেষ্টাও হয়নি। আপনি কিছু চিন্তা করবেন না, কয়েকদিনের মধ্যে এটা যাতে বন্ধ হয় তার ব্যবস্থা করবো। আমার সঙ্গে বনবিহারীবাবুর কথা হয়ে গেছে, তাছাড়া হোস্টেলের ছেলেদের গ্রুপ করে ওয়াচ রাখতে বলেছি।'

বিরামবাবু সরু করে বললেন, 'স্ট্রেঞ্জ! কাদের জন্য কাজ করব বল? এই তো সব চেহারা। অবশ্য যারা খ্রীষ্টকে হত্যা করেছিল, গান্ধীকে গুলি করেছে, তারা যে আমার বাড়ির সামনে অশ্লীল অক্ষর লিখবে এটাই তো স্বাভাবিক, না?'

এই সময় মুভিং ক্যাসেল অনিমেষের পাশে দাঁড়িয়ে কেমন গলায় বলে উঠলেন, 'তোমার ঠাকুর্দার আর খেয়েদেয়ে কাজ ছিল না যে এরকম হতচ্ছাড়া নাম রাখল। বিরাম যে কারো নাম হয় জীবনে শুনিনি।'

বিরামবাবু হাসলেন, 'আসলে আমাদের সংসারে অনেক ছেলেমেয়ে আসছিল বলেই বোধ হয় ঠাকুর্দা আমার নামকরণের মাধ্যমে সবাইকে সতর্ক করে দিতে চেয়েছিলেন। তা এই ছেলেটি কে?'

নতুন স্যার কিছু বলার আগেই মুভিং ক্যাসেল বলে উঠলেন, 'নিশীথের ছাত্র। ভারী সুন্দর দেখতে, চিবুকটা দেখেছ?'

কথাগুলো তার মুখের দিকে তাকিয়ে এমন ভঙ্গিমায় বললেন উনি যে মুহূর্তে লাল হয়ে গেল অনিমেষ। কিন্তু ততক্ষণে নতুন স্যার বলতে শুরু করেছেন, 'ভীষণ সিরিয়স ছেলে এ, প্র্যাকটিক্যালি এই স্কুলে অনিমেষই আমার নিজের হাতের তৈরী। ও দেশের কথা ভাবে, কংগ্রেসকে ভালবাসে। ওকে নিয়ে এলাম আপনার কাছে, কারণ এই ইলেকশনে আমি চাই ও কাজ করুক। একটু প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা হোক।'

মুভিং ক্যাসেল বলে উঠলেন, 'কিন্তু এ যে একদম বাচ্চা ছেলে।'

বিরামবাবু হাসলেন, 'তুমি অবশ্য রান্নাঘরে ঢোক না, তাই বলে যে রাঁধে সে চুল বাঁধে না? আমরা কবে পলিটিক্স শুরু করি? আরে এসব কি তোমার এম-এ পাস করে চাকরি নেবার মত ব্যাপার?'

নতুন স্যার হাসলেন, তারপর অনিমেষের দিকে ফিরে বললেন, 'ব্যাস, তোমার সঙ্গে বিরামদার আলাপ হয়ে গেল।'

www.MurchOna.com

অনিমেষ বুঝতে পারছিল প্রণাম করলেই ভাল হয় কিন্তু সেটা করতে ওর একদম ইচ্ছে করছিল না। হাত জোড় করে নমস্কার করতেই বিরামবাবু মাথা দুলিয়ে বললেন, 'খুশী হলাম, বড় খুশী হলাম। আমাদের পার্টি অফিসে যাওয়া-আসা আরম্ভ কর।'

মুভিং ক্যাসেল জিমিকে নিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে অনিমেষের হাত ধরলেন, 'ব্যাস দীক্ষা হয়ে গেল তো, এবার তুমি আমার হেফাজতে। প্রথম দিন এলে, একটু মিষ্টিমুখ করে যাও, এস।' মুভিং ক্যাসেল ওর হাত ধরে অন্দরমহলে নিয়ে এলেন।

ভেতরে একটা প্যাসেজ, প্যাসেজের পাশ দিয়ে ঘরগুলো। অনিমেষের মনে হল ওরা ভেতরে আসার আগে কেউ কেউ এখানে ছিল, ওদের আসতে দেখে দ্রুত সরে গেল। জিমি এখন যেন ঘুমিয়ে আছে এমন ভঙ্গিমায় মুভিং ক্যাসেলের বুকে পড়ে আছে। ডানপাশের প্রথম ঘরটায় ওকে বসতে বলে মুভিং ক্যাসেল ভেতরে চলে গেলেন। অনিমেষ দেখল একটু সুন্দর খাট আর তাতে বিরাট বেডকভার জুড়ে নীল রঙের ময়ূর কাজ করা আছে। ঠিক সামনেই একটা হাতলহীন সোফা, ইচ্ছে করলে শোওয়াও যায়, অনিমেষ সেটায় বসল। সামনেই একটা অল্পবয়সী মেয়ের ছবি, ভীষণ সুন্দর দেখতে, তাকানোর ভঙ্গীটায় এমন অদ্ভুত আদুরেপনা আছে যে ভাল না লেগে যায় না। খুব চেনা চেনা মনে হতে ও বুঝে ফেলল ইনিই মুভিং ক্যাসেল, নিশ্চয় অনেক কালের ছবি, এখনকার চেহারার সঙ্গে মিল বলতে শুধু চোখে।

ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মুভিং ক্যাসেল ভেতরে এলেন, 'কি দেখছ?'

অনিমেষ মুখ নামিয়ে বলল, 'আপনার ছবি।'

খুব অবাক এবং খুশী হলেন মহিলা, 'ওমা, ছেলের দেখছি একদম জহুরীর চোখ। অনেকেই চিনতে পারে না। আমার মেজ মেয়ে বলে, মা কি ছিলেন আর কি হয়েছেন!' কথাটা শেষ করতে করতে বাচ্চা মেয়ের মত খিলখিল করে হেসে উঠলেন উনি। আর বোধ হয় চমকে গিয়ে জিমি চোখ মেলে ওঁর বুকের মধ্যিখানের খোলা উঁচু সাদা চামড়ায় চট করে জিভটা বুলিয়ে নিল। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেপে গেলেন মুভিং ক্যাসেল, 'আঃ, কি অসভ্য কুকুর রে বাবা, যা পছন্দ করি না তাই করবে! নাম তুই, কোল থেকে নাম!' ধমকে ওকে বিছানায় নামিয়ে দিতে কুকুরটা সুড়সুড় করে ময়ূরের পেটের ওপর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ল। যেন খুব পরিশ্রম হয়েছে এমন ভঙ্গিমায় মুভিং ক্যাসেল বিছানায় ধপ করে বসে পড়লেন, তারপর আঁচল দিয়ে জিমির লালা বুক থেকে মুছে বললেন, 'তোমরা কোথায় থাক?'

'টাউন ক্লাবের কাছে।' অনিমেষ বলল।

'ওমা তাই নাকি! একই পাড়ায় আছি অথচ এতদিন তোমাকে দেখিনি! তোমরা কয় ভাই বোন?'

'আমার ভাই বোন নেই, দাদু পিসীমার কাছে থাকি।'

'কেন, তোমার বাবা মা?'

'বাবা স্বর্গছেঁড়া চা-বাগানে আছেন।' অনিমেষ মায়ের কথাটা বলতে গিয়েও বলল না। ও দেখল পাশের দরজা দিয়ে একটি মেয়ে হাতে ছোট ডিশ নিয়ে ঘরে এল। মেয়েটি বেশ বড়, শাড়ি পরা, গায়ের রং ফরসা তবে খুব সুন্দরী নয়। একে অনিমেষ দেখছে রিকশা করে বই নিয়ে আনন্দচন্দ্র কলেজে যেতে। মেয়েটির নাম নিশ্চয়ই মেনকা। কারণ বিরাম করের তিন মেয়ের মধ্যে একজনই শাড়ি পরে এবং তার নাম তো এই। মেনকার হাতের ডিশে চারটে সন্দেশ।

মুভিং ক্যাসেল বললেন, 'মানু, এই ছেলেটির নাম অনিমেষ, আমাদের নিশীথের প্রিয় ছাত্র। বেশ মিষ্টি চেহারা, না?'

মেনকা হাসল, তারপর অনিমেষকে বলল, 'এটা খেয়ে নাও তো লক্ষ্মী ছেলের মত।'

খিদে ছিল কিন্তু সংকোচ হচ্ছিল ওর, 'না, আমি এত খেতে পারব না।'

কপট রাগের ভঙ্গি করল মেনকা, 'ইস, এট্টুকখানি ছেলে, আবার না না বলা হচ্ছে। দেখি হাঁ করো তো, আমি খাইয়ে দিচ্ছি।' একটা সন্দেশ হাতে তুলে অনিমেষের মুখের কাছে নিয়ে এল মেনকা। ব্যাপার সুবিধের নয় দেখে অগত্যা অনিমেষ ওর হাত থেকে ডিশটা নিয়ে নিল।

মুভিং ক্যাসেল এতক্ষণ ব্যাপারটা হাসি-হাসি মুখ করে দেখছিলেন, এবার বললেন, 'তা তুমি আমাকে কি বলে ডাকবে বল তো?'

www.MurchOna.com

সন্দেশটা গিলতে গিলতে অনিমেষ বলতে গেল মাসীমা, কিন্তু তার আগেই মেনকা বলে উঠল, 'দাঁড়াও, তোমাকে আমি হেল্প করছি। আচ্ছা বাপীকে তোমার নিশীথদা কি বলে, দাদা তো? বেশ, তাহলে মা হল তার বউদি। তুমি যদি বাপীকে বিরামদা বল, তাহলে তোমার বউদি হয়ে গেল।' হাসি-হাসি মুখটার দিকে তাকিয়ে অনিমেষ কিছুতেই বুঝতে পারছিল না, এত বড় মহিলাকে বউদি কি করে বলা যায়। তাছাড়া নতুন স্যারকে তো ও দাদা বলে ডাকে না। মেনকা বোধ হয় ওর সমস্যাটা বুঝেই বলল, 'এদিকে নিশীথদা আমাদেরও দাদা, কিন্তু তুমি আমাকে মেনকাদি বলবে। আসলে আমরা সবাই দাদা বৌদি দিদি। মাসীমা মেসোমশাই বলা এ বাড়িতে অচল।'

এই সময় অনিমেষ অনুভব করল দরজায় আরো কেউ দাঁড়িয়ে। মুখ ফিরিয়ে দেখতে ওর লজ্জা করছিল। মুভিং ক্যাসেল সেদিকে তাকিয়ে বললেন, 'আয়, জলটা দিয়ে যা, ছেলেটার গলা শুকিয়ে গেল বোধ হয়।' তারপর ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'অনিমেষ এই দ্যাখো, আমার আর দুই মেয়ে, উর্বশী আর রম্ভা।'

খুব অবাক হয়ে গেল অনিমেষ। কাচের গ্লাসে যে জল নিয়ে এসেছে তাকে দেখে ওর মনে হল দেওয়ালে টাঙানো ছবিটা থেকে যেন সে সটান নেমে এসেছে। হুবহু একরকম দেখতে। ছিপছিপে, পান পাতার মত মুখ, গায়ের রঙ কচি কলাপাতার মত, আর টানা টানা কি আদুরে চোখ দুটো। শুধু চুলগুলো ঘাড় অবধি ছাঁটা। কোঁকড়া কোঁকড়া চুল ফেঁপে ফুলে রয়েছে। সঙ্গের মেয়েটি ওর চেয়ে ছোট, কিন্তু কেমন যেন! চাহনিটা বড়দের মত আর তার মাথার চুল হাঁটু অবধি সটান নেমে এসেছে। বোঝাই যায় এটাই ওর গর্ব।

মেনকা ওর মুখ দেখে খিলখিল করে হেসে উঠতে ছোটটিও গলা মেলাল। শুধু ছবির মত মেয়েটি শব্দ না করে হাসল। অনিমেষ দেখল হাসলে ওর গজদাঁত দেখা যায়। সেটা যেন আরো সুন্দর। গজদাঁত তো বাবারও আছে, কিন্তু বাবাকে তো এমন দেখায় না। মেনকা বলল, 'কি, খুব ঘাবড়ে গেলে বুঝি! একদম অপ্সরাদের মধ্যে এসে পড়েছ! আমি মেনকা, ও উর্বশী আর এ রম্ভা!'

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে মুভিং ক্যাসেল বলল, 'বুঝতে পেরেছি। আমার ছবির সঙ্গে খুব মিল, না? উর্বশী আমার অতীত, কি বল?'

লজ্জায় লাল হয়ে অনিমেষ ঘাড় নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

উর্বশী বলল, 'জল।'

এত মিষ্টি গলার আওয়াজ যে অনিমেষ চট করে হাত বাড়িয়ে গ্লাসটা ধরল। কাচের গায়ে উর্বশীর লাল আভা ছড়ানো আঙুলগুলো আস্তে আস্তে আলগা হতে অনিমেষ ঢকঢক করে জলটা খেয়ে নিল। ঠিক এমন সময় দরজায় কেউ এসে দাঁড়াতে মেনকাদি দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অনিমেষ দেখল দরজায় এখন কেউ নেই এবং সেদিকে তাকিয়ে রম্ভার ঠোঁটের কোণটা কৌতুকে নেচে উঠল।

মুভিং ক্যাসেল এবার বললেন, 'অনিমেষ, তুমি তো আমাদের ঘরের ছেলে হয়ে গেলে, তোমার ওপর আমি দায়িত্ব দিলাম, স্কুলের কোন্ ছেলে গেটে লিখে যায় তা তোমাকে বের করতে হবে। কি লজ্জা বল তো! আবার ইদানীং নিশীথের সঙ্গে মানুর নাম এক করে দেওয়ালে দেওয়ালে লেখা হচ্ছে! সত্যি, এই শহরটার যা অবস্থা হচ্ছে ক্রমশ, আর থাকা যাবে না।'

অনিমেষের মনে পড়ে গেল শহরের দেওয়ালে দেওয়ালে এখন 'নিশীশ+মেনকা' লেখা আছে।

মুভিং ক্যাসেল উঠলেন, 'তোমরা গল্প করো আমি একটু কাজ সেরে নিই।' যাবার সময় বিছানা থেকে জিমিকে কোলে তুলে নিয়ে অনিমেষের চিবুক ডান হাতে নেড়ে দিয়ে গেলেন। হাতটা যখন নাকের কাছে এসেছিল অনিমেষ চাঁপা ফুলের গন্ধ পেল। উনি চলে গেলে রম্ভা বিছানায় ধপ করে বসে পড়ল। সেদিকে তাকিয়ে অনিমেষ চোখ সরিয়ে নিল। এই মেয়েটা ওর চেয়ে বয়সে ছোট কিন্তু পা দুটো কি মোটা-মোটা, তাকালে কেমন লাগে। ওর চট করে মনে পড়ে গেল—একটু আগে রম্ভাকে নিয়ে মন্টু আর তপনের ঝগড়াটার কথা! ইস, ওরা যদি জানতো এখন অনিমেষ কোথায় আছে! রম্ভার দিকে তাকালেই শরীরটা কেমন করে ওঠে।

উর্বশী ওর দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'গ্লাসটা!'

www.MurchOna.com

এতক্ষণ যে এটা হাতেই ধরা ছিল খেয়াল করেনি অনিমেষ, উর্বশীর বাড়ানো হাতে সেটা দিয়ে বলল, 'আমি যাই।'

সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'সে কি, যাই মানে? নিশীথদা তো এখন দিদির ঘরে গল্প করছে। একসঙ্গে এসেছ একসঙ্গে যাবে।'

অনিমেষের ভাল লাগছিল কিন্তু এই মেয়েটার বলার ধরনটা ওর পছন্দ হচ্ছিল না। ও দেখল উর্বশী ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। চোখাচোখি হতে বলল, 'কাজ আছে?'

মাথা নাড়ল অনিমেষ, 'না।'

রম্ভা বলল 'তুমি কোন ক্লাসে পড়?'

অনিমেষ বলল, 'নাইন।'

রম্ভা ছড়া কাটল, 'নাইন ফাইন। আমি হেভেনে, আর ও টাইট।' বলে ও পা দোলাতে লাগল।।

উর্বশী বলে উঠল, 'এই, পা দোলাস না, মা বারণ করেছে না?'

রম্ভা পা নাচানো বন্ধ করে বলল, 'দেখছ তো, তোমরা পা নাচালে দোষ নেই, যত দোষ মেয়েদের বেলায়।'

অনিমেষ বুঝল ওরা সেভেন আর এইটে পড়ে। কিন্তু ও যেন উঁচু ক্লাসে পড়েও ঠিক পাত্তা পাচ্ছে না!'

রম্ভা বলল, 'এই, কথা বলছ না কেন?'

অনিমেষ বলল, 'তোমরা কোন্ স্কুলে পড়?'

'তিস্তা গার্লস স্কুলে।'

'ওখানে তপুদি পড়ায়?'

'তপুদি? ওরে বাবা, খুব স্ট্রিক্ট। চেন নাকি?'

ঘাড় নাড়ল অনিমেষ, 'চিনি।'

রম্ভা বলল, 'তোমার সঙ্গে একটা ছেলে দুপুরবেলায় তিস্তার দিকে গেল, তার নাম কি?'

অনিমেষ অবাক হল, 'তুমি দেখেছ?'

'হুঁ। লম্বা মত, কোঁকড়া চুল, খুব ভাঁট মেরে আমাকে দ্যাখে।' রম্ভা হাসল।

'ও, মন্টুর কথা বলছ?' অনিমেষ বুঝল মন্টু ঠিকই বলে যে রম্ভা ওকে দেখেছে।

'মন্টু ফন্টু জানি না, ছেলেটা কেমন?' অবহেলাভরে কথাটা বলল রম্ভা।

'ভাল।' ঘাড় নাড়ল অনিমেষ :

'তোমার চেয়েও?' বলে খিলখিল করে হেসে উঠল রম্ভা।

সঙ্গে সঙ্গে অনিমেষের মনটা বিশ্রী হয়ে গেল। এই মেয়েটার কথাবার্তা খুব খারাপ, গায়ে কেমন জ্বালা ধরিয়ে দেয়।

'আমি ভাল না।' বেশ রেগে গিয়ে অনিমেষ জবাব দিল।

'কে বলল?' এবার প্রশ্নটা উর্বশীর।

হাসিটা যেন থামছিল না রম্ভার, দিদির গায়ে ঠেলা দিয়ে বলল, 'বোঝ।'

আর ঠিক তখনি বাইরে সাইকেলের বেল খুব দ্রুত বাজতে বাজতে চলে গেল। অনিমেষ দেখল রম্ভা খুব চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সাইকেলটা আবার বেল বাজিয়ে ঘুরে আসতে ও উঠে দাঁড়াল। তারপর যেন কোন কাজ মনে পড়ে গেছে এরকম ভঙ্গিমায় বলল, 'আমি আসছি।'

এই বলে আস্তে আস্তে যেন কিছুই জানে না এইভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অনিমেষ দেখল উর্বশীর মুখ থমথমে। রম্ভা চলে যেতে ও খাটের ওপর আলতো করে বসে বলল, 'তুমি কিছু মনে করো না, রম্ভাটা এই রকম। মায়ের কাছে এত বকুনি খায় তবু ঠিক হয় না। আমার এসব একদম পছন্দ হয় না।'

অনিমেষ কি বলবে বুঝতে পারছিল না। ও মনে মনে উর্বশীর কথার সঙ্গে যে একমত এটা জানাবার জন্যই চুপ করে থাকল। দুজনে ঘরে বসে আছে অথচ কেউ কথা বলছে না এখন। অদ্ভুত

www.MurchOna.com

নিঃশব্দ এই পরিবেশটা ওর খুব ভাল লাগছিল। বাইরের রাস্তায় যে এতক্ষণ সাইকেলের বেল বাজাচ্ছিল সে বোধ হয় চুপ করে গেছে, কারণ এখন কোথাও কোন শব্দ নেই।

হঠাৎ উর্বশীর দিকে মুখ তুলে তাকাতে ও দেখতে পেল যে ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে, যেন বেশ মজা পেয়ে গেছে, 'কি ভাবছিলে এতক্ষণ?'

'আমি? কই কিছু না তো?' অনিমেষ অবাক হল।

'আমি দেখলাম তোমার মন অন্য কোথাও চলে গেছে। আচ্ছা, তুমি সবচেয়ে কাকে বেশী ভালবাস? দেখি আমার সঙ্গে মেলে কি না।' উর্বশী বলল।

অনিমেষ এখন এই উত্তরটা দেবার জন্য আর ভাবে না। কিন্তু এই কয় বছর আগে অবধি ও চেঁচিয়ে বলতে পারত দেশকে ভালবাসি। কিন্তু এখন বুঝে নিয়েছে সত্যি সত্যি যে দেশকে ভালবাসে সে চেঁচিয়ে কথাটা সবাইকে জানায় না। এগুলো নিজের কাছে রেখে দিলে সুখ হয়। বিলিয়ে দিলে বড় খোলা হয়ে যায়।

অনিমেষ চুপ করে আছে দেখে উর্বশী বলল, 'বলতে লজ্জা করছে বুঝি? সব ছেলেমেয়েই মাকে ভালবাসে, তাই মাকে বাদ দিয়ে—'

ওকে কথা শেষ কতে না দিয়ে অনিমেষ বলল, 'না, আমার তো মা নেই।'

'মা নেই?' খুব অবাক হল উর্বশী, ওর গলাটা যেন কেমন হয়ে গেল।

'আমাকে খুব ছোট রেখে মা চলে গিয়েছেন।' অনিমেষ বলল।

'তোমার খুব কষ্ট, না?'

উর্বশীর মুখের দিকে তাকিয়ে অনিমেষের মনে হল, সত্যি সত্যি বেচারার মন খারাপ হয়ে গিয়েছে। ব্যাপারটা সহজ করতে ও বলল, 'প্রথম প্রথম খুব কষ্ট হতো, এখন ঠিক হয়ে গেছে। তাছাড়া নতুন স্যার বলেছেন, গর্ভধারিণী মা না থাকলে কি হয়, জন্মভূমি-মা আছেন, তাঁকে ভাল বাসলেই সব পাওয়া হয়ে যাবে।'

ভ্রূ কুঁচকে উর্বশী বলল, 'কে বলেছেন এ কথা?'

অনিমেষ বলল, 'নতুন স্যার, মানে নিশীথদা।'

সঙ্গে সঙ্গে খিলখিল করে হেসে উঠল উর্বশী, 'তুমি এসব বিশ্বাস কর! নিশীথদা এসব বলে বাবার মন ভেজায়, নইলে দিদির সঙ্গে লভ করতে পারবে না। এখন আমাদের পাশের ঘরে যাওয়া বারণ, জানো?'

ভীষণ অস্বস্তিতে পড়ল অনিমেষ, উর্বশী খারাপ শব্দ কিছু বলেনি কিন্তু নতুন স্যার সম্বন্ধে শোনাটা ও এমনভাবে সত্যি করে দিল! তবু অনিমেষ বলল, 'কেন?'

'আহা! বোঝ না যেন কিছু! ক্লাস নাইনে পড় না তুমি?' তারপর গম্ভীর গলায় বলল, 'নিশীথদা এখন দিদিকে বাংলা পড়াচ্ছে!'

'ও।' খুব ঘাবড়ে গেল সে।

'ওসব চিন্তা ছাড়ো, বুঝলে! দেশ-ফেশ কিছু না। নিজের মায়ের চেয়ে বড় কেউ নেই। সেসব ইংরেজ আমলে ছিল, তখন সবাই দেশকে স্বাধীন করতে চেষ্টা করত, এখন এসব চলে না।' উর্বশী বলল।

'যাঃ!' হাসল অনিমেষ, 'স্বাধীন হয়েছে বলে দেশ আর মা থাকবে না?'

উর্বশী মাথা নাড়ল, 'তুমি যদি এ কথা পাঁচজনকে বল তারা তোমাকে বোকা ভাববে। এই দ্যাখো, আমার বাবা নাকি বিয়াল্লিশের আন্দোলন না কি করেছিল। এখন এই শহরের নেতা, গান্ধীজীর শিষ্য, সবাই সম্মান করে অনেস্ট লোক বলে।' তারপর হঠাৎ গলা পাল্টে বলল, 'অথচ আমার মায়ের গায়ে দেখেছ কি বিলিতি সেন্টের গন্ধ, আমার জামাকাপড় কি দেখছ, দিদির যা আছে না, তোমার চোখ খারাপ হয়ে যাবে। বাবার অমত থাকলে এসব হতো?'

হাঁ করে কথাগুলো শুনছিল অনিমেষ। উর্বশী ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আজ থেকে একশ বছর আগে আমার মত মেয়ের বিয়ে হয়ে কত কি হয়ে যেত। এখন কেউ সেটা ভাবতে পারে? তেমনি দেশকে মা বলে পুজো করাটা তখনকার আমলে ছিল, বুঝলে?'

www.MurchOna.com

এত তাড়াতাড়ি অনিমেষ কথাটা হজম করতে পারছিল না, 'কিন্তু নতুন স্যার—'

ঠোঁট বেঁকাল উর্বশী, 'তোমার নতুন স্যারের কথা বলো না। যা ইয়ার্কি করে না, কান লাল হয়ে যায়। তুমি খুব বোকা ছেলে।'

এবার অনিমেষ উঠে দাঁড়াল।

এতদিন ধরে মন্টুরা যেসব কথা ওকে বলে বোঝাতে পারেনি, আজ এই মেয়েটা সে কথাই বলে তাকে কেমন করে দিচ্ছে।

ওকে দাঁড়াতে দেখে খাট থেকে নেমে এল উর্বশী, 'কি হল, যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ যাই, সন্ধ্যে হয়ে আসছে।' অনিমেষ বলল।

'কিন্তু তোমার নতুন স্যার—'

'থাক আমি একাই যাই।'

হঠাৎ চট করে উর্বশী ওর হাত ধরল, 'এই, আমাকে ছুঁয়ে বল, আজ আমি যেসব কথা বললাম তা তুমি কাউকে বলবে না।'

তুলোর মতন নরম স্পর্শ হাতের ওপর পেয়ে অনিমেষ চমকে ওর দিকে তাকাল। উর্বশীর চোখ দুটো কি আদুরে ভঙ্গীতে ওর দিকে চেয়ে আছে। অনিমেষ আস্তে আস্তে বলল, 'কেন?'

'এসব কথা কাউকে বলতে নেই। বাবা শুনলে আমাকে মেরে ফেলবে।' খুব চাপা গলায় উর্বশী বলল।

'তাহলে তুমি বললে কেন?' অনিমেষ ওর চোখ থেকে চোখ সরাচ্ছিল না।

'জানি না।' তারপর হেসে বলল, 'তুমি খুব বোকা বলে তোমাকে বন্ধু বলে ভাবতে ইচ্ছে করছে, তাই। কথা দাও।'

অনিমেষের বুকের ভেতরটা কেমন করতে লাগল, 'কিন্তু আমি যে—।'

ওকে থামিয়ে দেয় উর্বশী, 'তুমি কি খুব দুঃখ পেয়েছ?'

নিজের মনের কথাটা উর্বশীর মুখে শুনে ও মুখ তুলে তাকাতে দেখল পাশের দরজায় রম্ভা দাঁড়িয়ে ওদের দেখছে। চোখাচোখি হতে নিজের ঠোঁট কামড়ে সে দ্রুত সরে গেল।

গেট খুলে বাইরে এসে দাঁড়াতেই তিস্তার দিকে নজর গেল অনিমেষের। ছোট জটলা হচ্ছে একটা সাইকেলকে ঘিরে। উর্বশীর ঘর থেকে বেরিয়ে বিরামবাবুকে নমস্কার করে অনিমেষ একটা ঘোরের মধ্যে হেঁটে আসছিল। আসার সময় মুভিং ক্যাসেলকে দেখতে পায়নি ও। উর্বশীর কথাগুলো মনের মধ্যে যে অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে সেটা ও ঠিক সামলাতে পারছিল না। নতুন স্যার সম্পর্কে ওর কথাগুলো অনিমেষের এতদিনের সমস্ত ধারণাকে নড়বড়ে করে দিয়েছে। নতুন স্যার মেনকাদিকে ভালবাসেন, তাকে বাংলা পড়ান, আবার দেশকেও ভালবাসেন, অনিমেষকে জননীর মত তাঁকে গ্রহণ করতে বলেন। অনিমেষের মনে হয় এর মধ্যে দোষের কিছু থাকতে পারে না। এটা ও মেনে নিতে পারছিল। কিন্তু বিরামবাবু, যিনি এখানকার কংগ্রেসের নেতা, মিউনিসিপ্যালিটির কর্তা, তিনি মুভিং ক্যাসেলের বিলিতি সেন্ট, শাড়ির টাকা যোগান কি করে—। নতুন স্যার এসব কথা জেনে, জানাটাই স্বাভাবিক, এই বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছেন—এই ব্যাপারটি ও সহ্য করতে পারছিল না। ও বেশ বুঝতে পারছিল সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে একটা বিরাট ফাঁকি আছে। উর্বশী বলল, বিরামবাবুর মন ভিজিয়ে নতুন স্যার এ বাড়িতে আসার সুযোগ পান। অনিমেষের ভেতরটা টলমল করছিল।

আবার উর্বশী যে এত কথা বলল তার জন্য ওকে ওর একটুও খারাপ লাগছিল না। কি সহজে উর্বশী বাবা-মায়ের কথা ওকে বলে দিল। কেন? রম্ভা এমন কি মেনকাদিকেও ওর ঠিক পছন্দ হয়নি। উর্বশীর চোখ, লালচে আঙুল, গজদাঁত—অনিমেষ চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিল। বুকের মধ্যে একটা গভীর আরাম ক্রমশ জায়গা জুড়ে নিচ্ছিল।

এই সব ভাবতে ভাবতে অনিমেষ গেট খুলে বাইরে এল এবং তখনই জটলাটা ওর নজরে পড়ল। কয়েক পা এগোতেই মন্টুর গলা শুনতে পেল, মন্টু খুব চেঁচাচ্ছে। এই দৌড়ে ও কাছে গিয়ে দেখল, মন্টু একটা সুন্দর মত ছেলের জামার কলার মুঠোয় নিয়ে ঝাঁকাচ্ছে আর তপন একটা সাইকেল ধরে

www.MurchOna.com

দাঁড়িয়ে ক্রমাগত শাসিয়ে যাচ্ছে। ওদের ঘিরে পাঁচ-ছয়জন পথচলতি লোকের ভিড়, তবে সবার মুখ হাসি-হাসি। বোঝা যায় ওরা একটা মজার ব্যাপার দেখছে। যে ছেলেটিকে মন্টুরা ধরেছে তার বয়স ওদেরই মত বা সামান্য বেশী হতে পারে। ফরসা, ফুলপ্যান্ট পরা, কোমরে বেল্ট আছে আর মাথা জুড়ে একটা বিরাট সিঙাড়া। মন্টুর কথার জবাবে একটা কিছু বলতেই সে সপাটে একটা চড় মাড়ল ছেলেটার গালে, 'শালা, বেপাড়ায় লগ্‌গি মারতে এসেছিস আবার রোয়াবি মারা হচ্ছে! মেরে বাপের বাসি বিয়ে দেখিয়ে দেব, বুঝলি!'

ছেলেটার জামাপ্যান্ট বেশ দামী, বোঝা যায় বড়লোকের ছেলে এবং এ ধরনের আক্রমণে অভ্যস্ত নয়। সে বলল, 'মিছিমিছি মারছ, আমি এদিকে বেড়াতে এসেছিলাম।'

তপন দু-হাতে ধরা সাইকেলটা ঝাঁকিয়ে বলল, 'আবার মিথ্যে কথা! আমরা স্পষ্ট দেখলাম তিন-চারবার বেল বাজিয়ে বাড়ির সামনে ঘুরঘুর হচ্ছিল! জানলায় ও আসতেই বেল থেমে গেল। কোন্ পাড়ায় থাকিস, বল?'

কোনরকমে ছেলেটা বলল, বাবুপাড়ায়।'

মন্টু বলল, 'কেন এসেছিস এখানে?'

অনিমেষ একটা ব্যাপারে অবাক হচ্ছিল। এই ছেলেটির শরীর দেখে বোঝা যায় যে গায়ের জোর কম নয় মন্টুর থেকে। অথচ ও কেমন অসহায় হয়ে মন্টুর হাতের মুঠোয় নিজের জামার কলার ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এর আগেও বোধ হয় চড় ঘুঁষি পড়েছে, কারণ ওর গালে লাল দাগ ফুটে উঠেছে। ইচ্ছে করলে ও লড়ে পালিয়ে যেতে পারে, কিন্তু যাচ্ছে না কেন? ছেলেটাকে চুপ করে থাকতে দেখে মন্টু বাঁ হাত দিয়ে ওর চুলের সিঙারা খপ করে ধরে হ্যাঁচকা টান দিল। যন্ত্রণায় মাথা নোয়াতে নোয়াতে ছেলেটা বলে উঠল, 'আমাকে আসতে বলেছিল।'

মন্টু চট করে বাঁ হাতটা ছেড়ে দিয়ে বোকার মত উচ্চারণ করল, 'আসতে বলেছিল!'

'হ্যাঁ। আমার বোন ওর সঙ্গে পড়ে। বোনকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছিল।' ছেলেটি সোজা হয়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতে কথাগুলো বলল।

ফ্যাসফেসে গলায় মন্টু বলল, 'মিথ্যে কথা, একদম বিশ্বাস করি না। কোন প্রমাণ আছে?'

এতক্ষণে যেন একটু জোর পেয়েছে ছেলেটি পায়ের তলায়, দু হাত দিয়ে মন্টুর মুঠো থেকে নিজের জামাটা ছাড়িয়ে বলল, 'এসব ব্যাপারে কি কোন প্রমাণ থাকে? তবে যদি বিশ্বাস না কর ওকে ডেকে আনো, আমি তোমাদের সামনে জিজ্ঞাসা করব।'

সঙ্গে সঙ্গে মন্টু একটা ঘুঁবি মারল ছেলেটার মুখে, কিন্তু দ্রুত মুখটা সরিয়ে নেওয়ায় ঘুঁষিটা কাঁধে গিয়ে লাগল। যন্ত্রণায় ছেলেটা দু'হাতে কাঁধ চেপে ধরল। মন্টু বলছিল, 'শালা, ভদ্রলোকের মেয়েকে নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভজাতে চাও? কোন প্রমাণ-ফ্রমাণ নেই। আমি একদম বিশ্বাস করি না।'

হঠাৎ ছেলেটা রুখে দাঁড়াল, 'আমি এখানে আসি না আসি তাতে তোমাদের কি? তোমরা ওর কেউ হও?'

মন্টু বলল, 'আবার কথা হচ্ছে! আমি কেউ হই না হই সে জবাব তোকে দেব? আজ প্রথম দিন বলে ছেড়ে দিলাম; আবার যদি কোনদিন দেখি এইখানে টাঙ্কি মারতে তাহলে ছাল ছাড়িয়ে নেব। যাঃ।'

ছেলেটা ঘুরে সাইকেলটা ধরতে যেতে তপন বলল, 'লেগেছে তোর?'

একটু অবাক হয়ে কি বলবে বুঝতে না পেরে ছেলেটা বলল, 'না।' বোধ হয় নিজের কষ্টের কথা স্বীকার করতে চাইছিল না।

তপন হাসল। 'গুড। তাহলে ক্ষমা চা, বল, আর কোনদিন এসব করব না।'

ছেলেটা বলল, 'তোমরা আজ সুযোগ পেয়ে যা ইচ্ছে করে নিচ্ছ! বেশ, আমি ক্ষমা চাইছি।' তপন ওকে সাইকেলটা দিয়ে দিতে সে দৌড়ে লাফিয়ে তাতে উঠে পড়ে একটু নাগালের বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, 'এই শালারা, শোন, এর বদলা আমি নেব! পাণ্ডাপাড়ার সাধন মৃধার পার্টিকে আজই বলছি।' কথা শেষ করেই জোরে প্যাডেল চালিয়ে বেরিয়ে গেল।

কয়েক পা ছুটে গিয়ে থমকে দাঁড়াল মন্টু, 'যা যা, বল শালা সাধনকে। আমি যদি রায়কতপাড়ার অশোকদাকে বলি তোর সাধন লেজ গুটিয়ে নেবে।'

www.MurchOna.com

কিন্তু কথাগুলো ছেলেটার কান অবধি পৌঁছল না। অনিমেষ ওদের কাছে এগিয়ে গেল। তপন প্রথমে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'এতক্ষণ কোথায় ছিলি?'

অনিমেষ বলল, 'এখানে কি হয়েছে রে?'

মন্টু বলল, 'আরে তোকে খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসে দেখি এই মালটা সাইকেলে পাক খাচ্ছে আর বেল বাজাচ্ছে। টাক্কি মারার আর জায়গা পায়নি! আবার সাধন মৃধার ভয় দেখাচ্ছে!' মন্টু যেন তখনও ফুঁসছিল।

অনিমেষ বলল, 'মারতে গেলি কেন মিছিমিছি?'

মন্টু বলল, 'বেশ করেছি মেরেছি। প্রেমের জন্য জীবন দেয় সবাই, তা জানিস?'

তারপর টেনে টেনে বলল, 'আই লাভ রুম্পা।'

হঠাৎ মুখ ফসকে অনিমেষ বলে ফেলল, 'রুম্পা তোর কথা জিজ্ঞাসা করছিল।'

সঙ্গে সঙ্গে হাঁ হয়ে গেল মন্টু। ও যেন বিশ্বাস করতেই পারছে না কথাটা। তারপর কোনরকমে বলল, 'তোকে জিজ্ঞাসা করেছে?'

অনিমেষ ঘাড় নাড়ল।

'তোর সঙ্গে আলাপ আছে বলিসনি তো! গুল মারবি না একদম।' মন্টু ওর সামনে এসে দাঁড়াল।

অনিমেষ বলল, 'আগে আলাপ ছিল না, একটু আগে হল। এখানে আসতে নতুন স্যার আমাকে ওদের বাড়িতে নিয়ে গেলেন।'

কথাটা শেষ করতেই তপন দৌড়ে এসে ওকে জড়িয়ে ধরল, 'তোর কি লাক মাইরি, একই দিনে বেদিং বিউটি থেকে লাভিং বিউটি সব দেখলি! তোকে একটু ছুঁতে দে।'

তিস্তার পাড়ে হাঁটতে হাঁটতে ওদের সব ব্যাপারটা বলতে হল। শুধু উর্বশী যে কথাটা ওকে সবশেষে বলেছে সেটা বন্ধুদের ভাঙল না। শোনা হয়ে গেলে মন্টু বলল, 'না রে অনি, অ অক্ষরটা যেই লিখুক এবার আমি ধরবই! রুম্পা যখন আমাকে লাইক করে তখন এটা আমার প্রেস্টিজ ইসু। তুই মুভিং ক্যাসেলকে নিশ্চিত থাকতে বলিস। আসামী ধরা পড়লে আমাকে ভাই ও বাড়িতে নিয়ে যাস।'

তপন বলল, 'আমার কথা কিছু জিজ্ঞাসা করেনি?' অনিমেষ ঘাড় নেড়ে না বলল। হতাশ গলায় তপন নিজের মনে বলল, 'আমাকে শালা মেয়েরা পছন্দ করে না। এই ব্রণগুলো যতদিন না যাবে—!' নিজের গাল থেকে হাত সরিয়ে ও মন্টুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'মাইরি, নিশীথবাবুটা হেভি হারামি! গাছেরও খাচ্ছে তলারও কুড়োচ্ছে!'

গালাগালিটা শুনে প্রচণ্ড রাগ হয়ে গেল অনিমেষের। ও চিৎকার করে উঠল, 'খুব খারাপ হচ্ছে তপন। না জেনেশুনে একটা অনেস্ট লোককে গালাগালি দিবি না!' কিন্তু অনেস্ট শব্দটা বলার সময় ওর কেন জানি না বিরামবাবুর মুখটা মনে পড়ে গেল।

মন্টু হাসল, 'তুই কিছুই জানিস না, অনি। আগে মুভিং ক্যাসেলের সঙ্গে নিশীথবাবুকে সব জায়গায় দেখা যেত। কলকাতায় কতবার নাকি ওরা দুজনে গিয়েছে। তখন মেয়েরা ছোট ছিল। মেনকার সঙ্গে লাইন হয়েছে, তা সবাই অনুমান করতাম কিন্তু সিওর ছিলাম না, তুই আজ ঠিক খবরটা দিলি।'

একই দিনে একটা মানুষের এতরকম ছবি দেখতে পেয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ল অনিমেষ। নতুন স্যার দেশকে ভালবাসেন, মেনকাদিকেও ভালোবাসতে পারেন, মেনকাদির বাবা অসৎ হলেও মেনকাদি তো সৎ হতে পারে। কিন্তু তার আগে মেনকাদির মাকে—এই ব্যাপারটা সব গোলমাল করে দিচ্ছিল।

হঠাৎ তপন মন্টুকে বলল, 'তুই শালা এবার থেকে বাংলায় হেভি নম্বর পাবি।'

মন্টু অবাক হয়ে বলল, 'কেন?'

'কেন আবার! ভায়রাভাইকে কেউ কম নম্বর দেয়?' কথাটা বলে ও চোঁ চোঁ করে দৌড় মারল।

মানে বুঝতে পেরে মন্টু ওকে দৌড়ে ধরতে যেতে যখন বুঝতে পারল ও নাগালের বাইরে চলে গেছে, তখন দাঁড়িয়ে পড়ে অনিমেষকে বলল, 'বন্ধু হোক আর যাই হোক, মেয়েদের ব্যাপারে সবাই খুব জেলাস, না রে!'

অনিমেষের কোন কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। ও চুপচাপ মাটির দিকে তাকিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। যত বড় হচ্ছে তত যেন সব কিছু অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। একটা মানুষের কতরকম চেহারা থাকে!

Uttaradhikar by Somoresh Majumder

[Part.1]

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com